সখা

প্রমদাচরণ সেন কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

তৃতীয় ভাগ।

১৮৮৫।

শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী, এম, এ, কর্ত্তৃক

সম্পাদিত।

"THE CHILD IS FATHER OF THE MAN."

কলিকাতা

২ নং বেনেটোলা লেন, "সখা" কার্য্যালয় হইতে

প্রকাশিত।

৪৫ নং বেনেটোলা লেন, "সাম্য" যন্ত্রে, শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত।
ও ২ নং বেনেটোলা লেন, "সখা" যন্ত্রে, শ্রীললিতমোহন দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

... বাগান বান্ধব পুস্তকালয় ও সাধারণ পাঠাগার ...
সন ১২৯৩ সালে
প্রতিষ্ঠিত
কলিকাতা

সূচী-পত্র।

বিষয়	লেখক বা লেখিকার নাম	পত্রাঙ্ক।
অক্ষয়কুমার দত্ত (সচিত্র।) ...	স্বর্গীয় প্রমদাচরণ সেন ...	১৭
অদ্ভুত কৌশল। ...	ভুবনমোহন রায় ...	১৫২
অন্ধদিগকে দয়া কর (সচিত্র।) ...	অন্নদাচরণ সেন ...	১১৪
আই-আই (সচিত্র।) ...	স্বর্গীয় প্রমদাচরণ সেন ...	২৪
আকাশ। ...	শ্রীনিঃ, শিলং ...	১৮৫
আখ্যান মালা।—— ...		
(১) বাবা হাত ধরে নিয়ে গেলে ভয় কি?	স্বর্গীয় প্রমদাচরণ সেন ...	২৬
(২) নাম্‌তে নাম্‌তে সাম্‌লাতে পারিনি।	স্বর্গীয় প্রমদাচরণ সেন ...	২৬
(৩) কোন্‌টা বেশী মন্দ? ...	স্বর্গীয় প্রমদাচরণ সেন ...	২৭
আগামী বৎসরের পুরস্কারের বিজ্ঞাপন।	...	১৯২
আমাদের দেশের লোকের দয়া। ...	রজনীকান্ত গুপ্ত ...	১২৬
আশ্চর্য্য উদ্ভিদ (সচিত্র।) ...	শশিভূষণ বিশ্বাস ...	৯৩
আশ্চর্য্য শিক্ষা (সচিত্র।) ...	শশিভূষণ বিশ্বাস ...	১২৯
আহা। কি দুঃখ (সচিত্র।) ...	মন্মথ নাথ মুখোপাধ্যায়, বি, এ, ...	১৮৬
ঈশ্বরের দয়া (পদ্য।) ...	জনৈক বঙ্গমহিলা ...	১০২
উট পক্ষী (সচিত্র।) ...	বিপিন বিহারী সেন ...	১৭২
কলির কুম্ভকর্ণ। ...	বিহারীলাল গুহ ...	৯৫
কাক ও কোকিল (পদ্য।) ...	সম্পাদক ...	৯৫
কাটামুণ্ডু কথা কয় (সচিত্র।) ...	অম্বিকাচরণ সেন, বি, এল, ...	৫৯
কালার ঘরে ধলা ছেলে। ...	সম্পাদক ...	১৩০
কুসঙ্গের দোষ। ...	মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, বি, এ, ...	১২৩
কেরাণী-পাখী (সচিত্র।) ...	স্বর্গীয় প্রমদাচরণ সেন ...	[illegible]
গাধা-সিংহ (সচিত্র।) ...	স্বর্গীয় প্রমদাচরণ সেন	৭৭
ছেলে খেলা (পদ্য।) ...	চিরঞ্জীব শর্ম্মা	১৬৩
ছেলে বেলায় নেলসন (সচিত্র।) ...	শশিভূষণ বিশ্বাস	১০৮
ঠাকুরদাদার গল্প (সচিত্র।) ...	মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, বি, এ,	[illegible]
৺ডাক্তার কৃষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায় (সচিত্র।)	সম্পাদক	[illegible]
৺তারকনাথ প্রামাণিক (সচিত্র।) ...	সম্পাদক	[illegible]
তৃতীয় বর্ষ। ...	স্বর্গীয় প্রমদাচরণ সেন	[illegible]
দুই ভাই। ...	মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, বি, এ,	[illegible]
ধাঁধা। ...		[illegible]
নব বর্ষ। ...	জনৈক বঙ্গমহিলা	[illegible]
নিদ্রালু ননী গোপাল (সচিত্র পদ্য।)	চিরঞ্জীব শর্ম্মা	[illegible]
নীতি কথা।	প্রিয়নাথ রায় ...	[illegible]
নূতন গল্প। ...	উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী, ...	১৭৫
পরেশ নাথ মন্দির। ...	স্বর্গীয় প্রমদাচরণ সেন	১১১
পণ্ডিতবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (সচিত্র।)	সম্পাদক	২২
পিতা মাতার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য (পুরস্কার প্রাপ্ত রচনা।) ...	কুমারী সরলা দেবী ...	১৫৪

১৬৭

পিপীলিকা (সচিত্র ।)	অন্নদাচরণ সেন	১৩৫
পূজারছুটির আমোদ (সচিত্র ।)	উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী, বি, এ,	১৫৯
প্রকৃত বন্ধু ।	অন্নদাচরণ সেন	১৮৩
প্রাচীনকালের ছাত্রজীবন ।	রজনীকান্ত গুপ্ত	৩৩
প্রাণকাঁদা চাই ।	মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, বি, এ,	৬১
ফুল ।	বিপিন বিহারী সেন	১৭৮
ভূতের গল্প ।	উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী, বি, এ,	২৭
ভেকের পত্র (সচিত্র পদ্য ।)	বিহারীলাল গুহ	১২৮
মনোহর ছবি ।	ভবনাথ চট্টোপাধ্যায়	৫৭
মহাভারতের উপদেশ (দুইটী গল্প ।)	রজনীকান্ত গুপ্ত	১৪৫
মাইকেল ফ্যারাডে (সচিত্র ।)	ভুবনমোহন রায়	১৬৩
মাছের কথা (সচিত্র ।)	শশিভূষণ বিশ্বাস	১০৩
মা তো তবে মরিয়া যায় (সচিত্র ।)	মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, বি, এ,	১৭৯
মূলবর্ণ ।	উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী, বি, এ,	১১৯
যেমন অবস্থা তেমনি ব্যবস্থা ।	স্বর্গীয় প্রমদাচরণ সেন	৮
রামতনু লাহিড়ী (সচিত্র ।)	সম্পাদক	৪১
লর্ড ডফরীণ (সচিত্র ।)	স্বর্গীয় প্রমদাচরণ সেন	৪
লীলার ভয় ।	কুমারী হেমলতা দেবী	৬৮
লেখা পড়া কিসের জন্য ? (ভুবনের কাহিনী)	মন্মথ নাথ মুখোপাধ্যায়, বি, এ,	৩৮
বসন্ত সঙ্গীত (বালকের রচনা ।)	সামসুদ্দিন	৬৩
বালিকাদিগের বিশেষ বিষয় ।—		
নং ১ সেলাই ।	কুমারী সরলা মহলানবিশ	১০
নং ২ সেলাই (সচিত্র ।)	কুমারী সরলা মহলানবিশ	৪৫
বালিকাদের বিশেষ পৃষ্ঠা (একটী সহজ কথা)	মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, বি, এ,	১৮৯
শিশুর হাসি (পদ্য ।)	চিরঞ্জীব শর্ম্মা	১৭৭
শিশুর হাসি (মায়ের আদর) সচিত্র পদ্য ।	শ্রীনিঃ, শিলং	১২৩
শেয়ালের গল্প (সচিত্র ।)	উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী, বি, এ,	৫৩
শোক-সঙ্গীত (প্রাপ্ত)	জনৈক বঙ্গমহিলা	১১৩
সংকেত ।	উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী, বি, এ,	৫৬
সক্রেটিস ।	কুমারী কামিনী সেন	১৩১
সততা ।	অন্নদাচরণ সেন	১৭৬
সত্যের জয় ।	উমাপদ রায়	৭৮
সত্যের বন্ধু (বালকের রচনা)	পূর্ণচন্দ্র সেন	১৯১
সময়ের সদ্ব্যবহার ।	অন্নদাচরণ সেন	১৪৩
সরলার জীবনের এক শিক্ষার দিন	কুমারী হেমলতা দেবী	১৩২
সাধুদিগকে কিসে চেনা যায় ?	শ্রীচরণ চক্রবর্ত্তী	৮৫
সাধের নৌকা (সচিত্র পদ্য ।)	সম্পাদক	১৪২
সুরেশের শিক্ষা ।	ভুবনমোহন রায়	৫
সোহাগ (পদ্য ।)	জনৈক বঙ্গমহিলা	৩
স্বর্গীয় প্রমদাচরণ সেন (সচিত্র ।)	সম্পাদক	৯৭
স্বাধীনতার প্রতি অনুরাগ (সচিত্র ।)	ললিতমোহন দাস	১৬১
হাসি, কান্না, কোনটা ভাল ? (সচিত্র ।)	স্বর্গীয় প্রমদাচরণ সেন	৬৬

সিকদার বাগান
সন ১২৯৩ সাল।

সখা
তৃতীয় ভাগ । প্রথম সংখ্যা ।

জানুয়ারি, ১৮৮৫ ।

তৃতীয় বর্ষ ।

আমাদের আর একটী বৎসর চলিয়া গেল। আজ নূতন বৎসরের প্রথমেই আমাদের দুই একটা সুখ দুঃখের কথা পাঠক পাঠিকাদিগকে জানাইব।

আমাদের 'সখা' আজ তিন বছরে পা দিতেছে, ইহাতে আমাদের কত আনন্দ! অনেক বালক বালিকা সখা পড়িতেছেন, অনেকে 'সখা' পড়িয়া ভাল হইবার চেষ্টা করিতেছেন, ইহাতে আমাদের কত সুখ! যাঁহার দয়ায় আজ আমাদের এই সুখ, আমরা সেই পরমেশ্বরকে সকলের আগে প্রণাম করি। তাহার পর, যে সকল বালকবালিকা 'সখা'কে তাঁহাদের আপনার জিনিষ বলিয়া মনে করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাঁহাদিগকে আমাদের ভালবাসা জানাইতেছি। জগদীশ্বর করুন যেন 'সখা' চিরকালই বালক বালিকাদিগের সাহায্য করিয়া আপনার "সখা"-নামের মত কাজ করিয়া যাইতে পারে।

আমাদের কোন কোন বালক বন্ধু এবং বালিকাপাঠিকা 'সখা'র কিছু কিছু দোষের কথা আমাদিগকে জানাইয়াছেন—ইহাতে আমরা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। তবে কেহ কেহ এমন আছেন, যাঁহারা কেবল খুঁত ধরিতেই ব্যস্ত, তাঁহাদের পত্রের কথা বা দোষ ধরার বিষয়ে আমরা কিছুই বলিতে চাই না। যাঁহারা যথার্থ দোষ ধরেন তাঁহারা আমাদের উপকারী, কেন না, মানুষ যতই কেন সাবধান হউক না, মাঝে মাঝে তাহার দোষ বা ভুল হইতে পারে—তখন দোষ দেখাইয়া বা ভুল ধরিয়া না দিলে, তাহার ভাল হওয়া কঠিন। এই জন্যই যাঁহারা আমাদের দোষ দেখাইয়া আমাদিগকে উপদেশ দিয়াছেন, তাঁহাদের প্রতি আমাদের একটা ভালবাসা জন্মিয়া গিয়াছে। কিন্তু একটী বালিকা ও একটী বালক, বড়ই নূতন রকমের দুটী দোষ ধরিয়াছেন,—তাহার কথা কিছু না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। বালিকাটী সখার একটী গল্প গড়িয়া বলিয়াছেন "এ গল্প ইংরাজীতে আছে। সখা-সম্পাদক ইংরাজী হইতে গল্প অনুবাদ করিয়া সে কথা স্বীকার করেন না কেন ?" ইহার উত্তরে আমাদের কয়েকটী কথা বলিবার আছে। আমরা কেবল যে ইংরাজী হইতেই গল্প লই, তাহা ঠিক নহে, এবং যখন ইংরাজী হইতে লই, তখন ও যে সকল সময় সেই গল্পের ভাষা-শুদ্ধ বাঙ্গালায় অনুবাদ করি, [illegible] নহে। সেখানে আগাগোড়া অনুবাদ [illegible] সমস্তই বাঙ্গালায় [illegible] বদলাইয়াই লওয়া যায়, সেখানে আমরা যে কথা [illegible]

স্বীকার করি না, এ বড় আশ্চর্য্য কথা! দৃষ্টান্ত দেখুনঃ—বিলাতের পত্র, ১মভাগ, ৯ পৃষ্ঠা; গিল্‌ফায় সাহেবের সমুদ্র যাত্রা, ১মভাগ, ৮৫ পৃষ্ঠা; নরেনের স্বর্গদর্শন, ১মভাগ, ১৪০ পৃষ্ঠা; নিয়ম এবং অনিয়ম, ১মভাগ, ১৭৯ পৃষ্ঠা, নোট; পাহারাওয়ালার ভেল্কী, ২য় ভাগ, ৪৪ পৃষ্ঠা, নোট; চিরদিন কি দুঃখে যায়, ২য় ভাগ, ৮৬ পৃষ্ঠা, নোট; ইত্যাদি। তবে আমরা নিজেরাই যে সকল নূতন প্রবন্ধ না লিখি, সে সমস্তই স্বীকার করিতে গেলে, অনেক সময় বিপদে পড়িতে হয়। অনেক সময় বলিতে হয়—"এই গল্পটা রেলের গাড়ীতে একজনের মুখে শুনিয়াছি," "এই গল্পটা পশ্চিমে একজন সিপাহীর মুখে শুনিয়াছি," "এই গল্পটা আমাদের বুড়ো চাকর কাজেম সেখ বলিয়াছে," "এই গল্পটা সরলা ও পাড়ার গঙ্গা-জেলেনীর কাছে শুনে এসে তাদের একবয়সী একজনের কাছে বলেছে, আমি তার মুখে শুনিয়াছি," "এই গল্প গুলো ফরাসী ভাষা থেকে ইংরাজীতে কোন্ পুস্তকে লইয়াছে, আমাদের বোধ হয় সেই পুস্তকে পাইয়াছি," ইত্যাদি। এরূপ করিয়া কতদিন চলে? আমাদের বুদ্ধিমতী বালিকা পাঠিকা জানিবেন যে গোপন করিয়া আমাদের বিশেষ কিছুই লাভ নাই। আমরা সব গল্প নিজে লিখি না; কতক ইংরাজী হইতে, কতক সংস্কৃত বা বাঙ্গালা হইতে, কতক বা পরিচিত ও অপরিচিত লোকের মুখ হইতে পাইয়া ছাপাইয়া থাকি।

আর, যে বালকটীর কথা বলিয়াছি, তিনি যে দোষ ধরিয়াছেন তাহাতে আমাদের হাসিও পাইয়াছে দুঃখও হইয়াছে। বালকটী (বয়স নিতান্ত অল্প নয়) গতবৎসর সখার গ্রাহক ছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন—"আমি আর আপনার কাগজের গ্রাহক থাকিতে ইচ্ছা করি না। আপনাদের পত্রিকা যেরূপ **ব্রাহ্মভাবপূর্ণ**, তাহাতে **আর্য্যসন্ততিগণের** তাহা পাঠ করা বা গ্রহণ করিয়া উৎসাহ দেওয়া উচিত নহে।" আমরা 'সখা'তে এতদিন যে সকল বিষয় লিখিয়া আসিতেছি, তাহাতে—সত্যবাদী হও, পশুর প্রতি দয়া কর, পিতা মাতাকে মান্য কর, চেষ্টা করিয়া কেশবচন্দ্র সেন, শ্যামাচরণ বিশ্বাস বা কৃষ্ণদাস পালের ন্যায় বড় লোক হও, পরমেশ্বরকে ভক্তি কর, শারীরিক শ্রম করিয়া খুব জোরাল হও, দেশের উপকার কর, গরিবের প্রতি দয়া কর ইত্যাদি অনেক কথা বলিয়াছি। এখন কথা এই, এই গুলিই যদি "ব্রাহ্মভাব" হয়, তবে বোধ করি ইহার উল্টা যেগুলি তাহাই "আর্য্য ভাব?" ছি! ছি! ছি! এমন লোকের সঙ্গেও তর্ক করিতে হয়! 'সখা' হিন্দুসমাজেরও কাগজ নয়, ব্রাহ্মসমাজেরও কাগজ নয়; কেবল বালক বালিকাদিগের যাহাতে উপকার হয়, তাহাই করিতে ইহার জন্ম, 'সখা' চিরকাল তাহাই করিবে।

একটী দুঃখের সংবাদ দিয়া আমরা এই প্রস্তাব শেষ করিব। যে বৎসর চলিয়া গেল এই বৎসরে আমাদের একটী স্নেহের পাঠক মারা গিয়াছেন। বালকের নাম ফণীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। আহা! তাহার সরল হাসি হাসি মুখখানি যেন এখনও আমাদের চোখের সুমুখে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। তাহার চরিত্র অতি সুন্দর ছিল, বাঁচিয়া থাকিলে সে একজন বড়লোক হইতে পারিত। কিন্তু যাহার ধন তিনিই তাহাকে লইয়াছেন, আমাদের আর সাধ্য কি? স্নেহের পাত্র মরিয়া গেলে প্রাণে বড় ব্যথা লাগে, তাই আজ দুঃখের সহিত পরমেশ্বরের কাছে এই প্রার্থনা করিতেছি যেন আগামী বৎসরে আমাদের পাঠক পাঠিকা সকলেই সুস্থ শরীরে বাঁচিয়া থাকেন; আবার যেন আমাদিগকে দুঃখের খবর বলিতে না হয়।

সোহাগ।

১

আয় খুকু! আয় বুকে
আয় হৃদয়ের ধন!
আমারে একেলা রেখে
কোথা ছিলি এতক্ষণ?

২

দিনেতে আঁধার মম
তুমি না থাকিলে কোলে!
আ মরি কি সোণামুখী—
হাসি যে ধরে না গালে!

৩

আমার সোনার খুকু
আমার পূর্ণিমা শশী!
আদরে নাচাই কত,
প্রাণ হতে ভাল বাসি।

৪

মনে হয় তোরে সদা
বুকের উপরে রাখি;
নয়ন পুতলি করি
রাত্ দিন চোখে দেখি।

৫

তুমি তো—দুরন্ত মেয়ে
কোলে থাকিবার নও;—
মাটীতে বসিতে পেলে
এত কিরে সুখী হও!

৬

আমার সোনার ফুল
ধূলায় ফুটেছে মরি!
সোনা গায়ে ধূলা লাগে
আমি কি সহিতে পারি?

৭

আয় আয় জুজু আয়
দেখে যা খুকুর ভান!
হ্যাদে আয় কাণকাটা
কেটে নে'যা দুটো কাণ—

৮

না না না না সোণামুখি!
কেঁদনা কেঁদনা ধন!
চাঁদ মুখে চুমো খাই,
জুড়াক পরাণ মন।

৯

"হাসিলে" সুবর্ণ পড়ে
"কাঁদিলে" মুকুতা ঝরে,—
কে বলে সে উপকথা?
দেখে যা খুকুরে ধরে।

১০

আয় আয় রাঙা পাখি,
দুদ ভাত দিব খেতে,
ডাকিছে আমার খুকু
রাঙ্গা দুটি হাত পেতে।

১১

আয় আয় আয় পুশু
"মিউ মিউ" রব কোরে।
খেলিলে খুকুর সনে
দুদ দেব পেট ভোরে।

১২

আকাশে ফুটিলে চাঁদ,
"চিক্" দিতে দেব ডেকে,
কত ফুল তুলে দেব
মালীর বাগান থেকে।

১৩

চল যাদু ঘরে চল
হিম পড়ে, বেলা নাই।
মা ডাকিছে দুধ খেতে
দুটি বোনে চল যাই।

লর্ড ডফ্‌রীণ।

লর্ড রিপণ চলিয়া গিয়াছেন। এখন যিনি আমাদের গবর্ণর জেনেরাল বা বড়লাট তাঁহার নাম লর্ড ডফ্‌রীণ। ইনি অতিশয় বুদ্ধিমান এবং বিচক্ষণ লোক। আমাদের দেশে আসিয়া ইনি আমাদিগকে আশা দিয়াছেন যে যতদূর সাধ্য আমাদিগের দেশের উপকার করিবেন। আমরা তাঁহার কথায় সুখী হইয়া তাঁহার মুখ চাহিয়া আছি—আশা করি মহামতি লর্ড রিপণের মত তিনিও দেশে ফিরিবার সময় আমাদের সকলের প্রশংসা ও ভক্তি লইয়া যাইতে পারিবেন।

লর্ড ডফরীণ স্কুল কালেজে বেশী লেখাপড়া শেখেন নাই বটে, কিন্তু অনেক দেখিয়া শুনিয়া সমস্ত বিষয়েই আপনার জ্ঞান পাকাইয়াছেন। কখনও আমেরিকাতে, কখনও রুষিয়াতে, কখনও মিসরে, এইরূপ নানাস্থানে রাজ-কার্য্য করিয়া আমাদের বর্ত্তমান বড়লাট বাহাদুরের অনেক শিক্ষা হইয়াছে। ভারতবর্ষে তাঁহার আসা নূতন, কিন্তু যে বুদ্ধিমান সে নূতন যায়গাতেও আপনার পথ খুঁজিয়া লইতে পারে। ডফ্‌রীণ সুস্থ শরীরে ভারতের উপকার করিয়া ভারতবাসীর সুখ্যাতি লাভ করিয়া যাইতে পারেন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

সুরেশের শিক্ষা।

একদিন ভাদ্র মাসে বৈকালে ভয়ানক ঝড় হইতেছিল। আকাশ কালবর্ণ মেঘে চারিদিক পরিপূর্ণ, মধ্যে মধ্যে বিদ্যুত-চমকে আরও ভয়ানক দেখা যাইতেছিল। পথ ঘাটে লোক নাই। প্রাণীর চিহ্ন মাত্র নাই। সুরেশচন্দ্র এই ভয়ানক ঝড়ের মধ্যে দ্রুতবেগে চলিয়াছে, কোথায় যাইতেছে তাহার ঠিক নাই, যে দিকে পা চলিতেছে সেই দিকেই চলিয়াছে। সুরেশ ক্রোধে অধীর, চক্ষু দিয়া আগুণ বাহির হইতেছে, পাগলের ন্যায় ক্রমাগতই চলিয়াছে। ক্রমে সন্ধ্যা হইল, সঙ্গে সঙ্গে ভয়ানক বৃষ্টি আরম্ভ হইল। আর পথ দেখা যায় না, কিন্তু বিদ্যুতের আলোতে সুরেশ বুঝিল গ্রাম ছাড়াইয়া মাঠে আসিয়া পড়িয়াছে। তথাপি বিশ্রাম নাই, সেই ভয়ানক ঝড় বৃষ্টির মধ্যে সেই গাঢ় অন্ধকারে সুরেশ একাকী মাঠের মধ্যে চলিতে লাগিল।

এই খানে সুরেশচন্দ্রের একটু পরিচয় দিব। সুরেশচন্দ্র ধনীর সন্তান, তাঁহার অনেক ধন সম্পত্তি ছিল, এই ধন সম্পত্তির সুরেশই একমাত্র অধিকারী। আমাদের দেশে ধনীর সন্তানগণ প্রায়ই বাল্যকাল হইতে অন্যায় আদরের মধ্যে লালিত পালিত হইয়া কালে অতি ভয়ানক হইয়া দাঁড়ায়। সুরেশের তাহাই হইয়াছিল—সে অসঙ্গত আদরে অতিশয় 'আবদারে' ছেলে হইয়া দাঁড়াইল। যখন যাহা ইচ্ছা করিত, কেহ বাধা দিয়া রাখিতে পারিত না। ক্রমে স্বেচ্ছাচারিতা বড় বাড়িয়া গেল। ক্রমে অসৎসঙ্গ জুটিতে লাগিল; বড় লোকের ছেলের প্রায়ই এরূপ হইয়া থাকে,—সুরেশ কুপথে চলিতে আরম্ভ করিল। সুরেশের মাতা অতিশয় ধার্ম্মিকা ছিলেন, তিনি সন্তানের এরূপ চরিত্র দেখিয়া প্রাণে বড়ই আঘাত পাইলেন। সুরেশ প্রায়ই গৃহে থাকিত না, কাযেই মাতার সঙ্গে বড় একটা সাক্ষাৎ হইত না। যদি কখনও দেখা হইত মাতা তাহাকে নানা প্রকার উপদেশ দিতে চেষ্টা করিতেন, অসৎপথ ছাড়িয়া সৎপথে চলিবার জন্য নানা প্রকারে বুঝাইতেন; কিন্তু সুরেশ কিছুতেই কাণ দিত না।

একদিন সুরেশের মাতা শুনিলেন, যে সুরেশ কতকগুলি অসৎ বালকের সঙ্গে মিলিয়া কোন প্রতিবাসির গৃহে নানা প্রকার অত্যাচার করিতেছিল, এমন সময় কোন একটি লোক আসিয়া সুরেশকে বাধা দেয়; সুরেশ ইহাতে রাগে অন্ধ হইয়া দল বল লইয়া সেই লোকটির গৃহে আগুণ দিয়া পোড়াইয়া দিয়াছে, এবং প্রহার করিয়া সে লোকটিকে আধ্‌মরা করিয়া ফেলিয়াছে। লোকটি অতি দরিদ্র, তাহার একটি ছোট মেয়ে ছিল, সে পথে পথে কাঁদিয়া বেড়াইতেছে। সুরে-

শের মাতা এ সমস্ত শুনিলেন, শুনিয়া তাঁহার যার পর নাই কষ্ট হইতে লাগিল, তিনি চক্ষের জল রাখিতে পারিলেন না, দুঃখে কাঁদিতে লাগিলেন। এমন সময় সুরেশ আসিয়া উপস্থিত হইল। সুরেশের মাতা অনেক সহ্য করিয়াছিলেন, আজ তিনি সুরেশকে অত্যন্ত তিরস্কার করিলেন। সে তিরস্কার সুরেশের সহ্য হইল না, সুরেশ মাতার তিরস্কার শুনিল, কিন্তু এদিকে যে চক্ষের জলে তাঁহার বুক ভাসিয়া গিয়াছে ক্রোধান্ধ সুরেশ তাহা দেখিতে পাইল না; স্নেহময়ী মাতাকে শত্রু মনে করিল। সেই মুহূর্ত্তেই সুরেশ বাটীর বাহির হইল।

রাত্রি অধিক হইল তবু সুরেশ ফিরিল না। সুরেশের মাতা বিশেষ চিন্তিতা হইলেন। চারিদিক লোক পাঠাইলেন। কেহ কেহ ফিরিয়া আসিল, কেহ কেহ তখনও ফিরিল না, কিন্তু সুরেশের কোন সংবাদই পাওয়া গেল না।

এদিকে সুরেশ সেই মাঠ পার হইয়া এক ভয়ানক বনের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইল। তখনও ঝড় বৃষ্টি আসে নাই, আবার অন্ধকারে কিছু দেখাও যাইতেছে না। সুরেশ চলিতে চলিতে এক একবার পড়িয়া যাইতেছে, আবার উঠিয়া চলিতেছে, কোথাও কাঁটা বিন্ধিয়া শরীর রক্তাক্ত হইতেছে। ক্রমে সুরেশ বড়ই ক্লান্ত হইল, অবশেষে অবসন্ন হইয়া বসিয়া পড়িল। হঠাৎ বিদ্যুতের আলোকে সম্মুখে মন্দিরের মত দেখিল। সুরেশ শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে মন্দিরের দ্বারে গিয়া দাঁড়াইল, দেখিল দ্বার খোলা। মন্দিরের ভিতরে গিয়া সুরেশ ডাকিল—"এখানে কে আছ?" কোন উত্তর নাই; আবার ডাকিল,—এবারও কোন উত্তর নাই, কেবল নিজের কথার প্রতিধ্বনি শুনিতে পাইল। সুরেশ বড়ই ভয় পাইল। ভয়ে, পরিশ্রমে, শীতে অবসন্ন হইয়া মন্দির মধ্যে বসিয়া পড়িল। ক্রমে শরীর আরও অবসন্ন হইয়া আসিল। ক্রমে সুরেশ চেতনা হারাইল। তখন সেই অজ্ঞান অবস্থায় সুরেশ দেখিতে লাগিল:—যেন সে এখনও বালক। তাহার মাতা তাহাকে ডাকিয়া কোলে লইলেন, কতগুলি বহুমূল্য বসন ভূষণ আনিয়া একে একে সেইগুলি দিয়া সুরেশকে সাজাইয়া দিলেন। সুরেশকে অতি সুন্দর দেখাইতে লাগিল। তখন মাতা বলিলেন—"দেখ সুরেশ! এইগুলি আমি তোমার জন্য রাখিয়াছিলাম, আজ তোমাকে এইগুলি দিয়া সাজাইয়া দিলাম, এগুলি অতি মূল্যবান জিনিষ, অতি যত্নের সহিত রক্ষা করিও; যাও এখন তোমার ইচ্ছামত গিয়া খেলা কর, কিন্তু সাবধান যাহা তোমাকে দিলাম, তাহা যেন হারাইও না।" সুরেশ মহা আনন্দে ছুটিয়া বাহির হইল। দৌড়িয়া আসিয়া পাড়ার বালকদের সঙ্গে মিশিল। দলে দলে বালক-বালিকা খেলিতেছিল, সুরেশ আসিয়া একদলে মিশিল; সে দলে বনিল না, সুরেশ আর এক দলে গিয়া মিশিল। তাহাদের সঙ্গে খেলা করিতে করিতে সুরেশ বাড়ীর কথা ভুলিয়া গেল। সুরেশের সঙ্গীগণ তাহার বসন ভূষণ দেখিয়া 'হিংসা' করিয়া, কেহ সুন্দর পোষাকটি ছিঁড়িয়া দিল, কেহবা একখানি অলঙ্কার ভাঙ্গিয়া দিল, কেহ বা তাহাকে ভুলাইয়া কতক লইয়া গেল। সুরেশ তখন এমনি খেলায় মত্ত যে সে তাহাতে বড় আপত্তি করিল না। ক্রমে সন্ধ্যা হইল, অন্ধকারে চারিদিক ছাইয়া গেল। সুরেশ তখন দেখিল বাড়ী হইতে অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছে, সঙ্গে যাহারা ছিল তাহার একজনও এখন নাই, সেই অন্ধকারে

সুরেশ একাকী। তখন তাহার মাতার কথা মনে পড়িল; নিজের দিকে তাকাইয়া দেখিল বসন ভূষণ অনেক নাই, যাহা আছে ছেঁড়া বা ভাঙ্গা। তখন সুরেশ ভয়ে দুঃখে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল; সঙ্গে সঙ্গে চেতনা হইল। চক্ষু মেলিয়া সুরেশ চাহিয়া দেখিল কাহার কোলে তাহার মাথা রহিয়াছে, প্রভাত হইয়াছে, সূর্য্যের কিরণ অল্প অল্প দেখা দিতেছে। সুরেশ চমকিয়া উঠিয়া বসিল, দেখিল তাহার সম্মুখে এক জন সন্ন্যাসী। সুরেশ কোন কথা বলিতে পারিল না, অবাক হইয়া বসিয়া রহিল। তখন সেই সন্ন্যাসী বলিলেন "তোমার কোন ভয় নাই, এ আমার বাসস্থান। কিন্তু তুমি এখানে কেমন করিয়া আসিলে, আর এখনই বা কেন এ প্রকার চীৎকার করিয়া উঠিলে?"—তখন সুরেশ পূর্ব্ব দিন বৈকালের ঘটনা হইতে আরম্ভ করিয়া অজ্ঞান অবস্থায় যাহা যাহা দেখিয়াছিল, সমস্তই বলিল, বলিয়া সন্ন্যাসীর দিকে চাহিয়া রহিল। সন্ন্যাসী কতক্ষণ স্থির ভাবে রহিলেন। তার পর গম্ভীর ভাবে বলিতে লাগিলেন—"বুঝিয়াছি, তোমাকে শিক্ষা দিবার জন্যই ভগবান এই স্বপ্ন দেখাইয়াছেন, মনোযোগ দিয়া শুন, ইহার মধ্যে অতি সুন্দর উপদেশ আছে।" সন্ন্যাসী বলিতে লাগিলেন—"দেখ, ঈশ্বর প্রত্যেক মানুষকে দয়া, ধর্ম্ম, প্রেম, পবিত্রতা প্রভৃতি কতকগুলি সৎগুণ ও প্রবৃত্তি দিয়া পৃথিবীতে পাঠান। সেই গুলিই আমাদের প্রকৃত ভূষণ, আমাদের প্রকৃত অলঙ্কার। তুমি যে দেখিয়াছ, তোমার মাতা তোমাকে রমণীয় ভূষণ দিয়া সাজাইয়া দিলেন, তাহার অর্থ এই যে যিনি জগতের মাতা তিনি তোমাকে সৎগুণ-রূপ যে ভূষণ তাহাদ্বারা তোমাকে সাজাইয়া দিলেন। এবং সেই গুলি যত্নে রক্ষা করিতে উপদেশ দিয়া তোমাকে পৃথিবীতে পাঠাইয়া দিলেন। তুমি ক্রমে বড় হইলে; কুসঙ্গে মিশিয়া মাতার কথা ভুলিয়া বাড়ী হইতে অনেক দূরে চলিয়া গেলে—অর্থাৎ ঈশ্বরকে ভুলিয়া কুপথে চলিতে আরম্ভ করিলে। তোমার সৎগুণ দেখিয়া শুনিয়া তোমার সঙ্গীদের হিংসা হইল, কেন না তাহারা অনেক দিন তাহাদের সৎগুণ গুলি হারাইয়াছে। ক্রমে অসৎকার্য্যে মতি লওয়াইয়া তোমার প্রকৃত ভূষণ যাহা তাহা নষ্ট করিয়া দিতে লাগিল। অবশেষে তোমাকে পাপরূপ অন্ধকারের মধ্যে ফেলিয়া তাহারা পলাইল। বাস্তবিক তুমি সমস্তই হারাইয়াছ, ভাবিয়া দেখ ঈশ্বর তোমাকে যাহা দিয়াছিলেন তাহার একটিও এখন তোমার নাই। যাহা হউক যে উপদেশ তুমি পাইলে তাহা কখনও ভুলিও না। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা কর তিনি আবার তোমাকে বসন ভূষণে সাজাইয়া দিবেন। তবে যাও গৃহে ফিরিয়া যাও, মাতার কাছে কাঁদিয়া ক্ষমা প্রার্থনা কর, এবং যাহাদের প্রতি অত্যাচার করিয়াছ তাহাদিগকে সন্তুষ্ট কর।" সুরেশ সমস্ত শুনিল, সমস্ত বুঝিল, সেই দিন সুরেশের জ্ঞান হইল। সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিয়া সুরেশ বাড়ী ফিরিল।

সুরেশ বাড়ী আসিয়াই [illegible] ক্ষমা চাহিল, মাতা তাহাকে [illegible] চুম্বন করিলেন। তারপর [illegible] চার হইয়াছিল সুরেশ [illegible] চাহিল এবং যথাসাধ্য [illegible] করিল। মাতা ও আত্মী[illegible] অত্যন্ত আনন্দ করিতে [illegible] নূতন ব্যবহার, নূতন [illegible] আশ্চর্য্য হইলেন। সুরেশ [illegible]

উপদেশ মনে রাখিয়া, ধর্ম্মপথে থাকিয়া নানা প্রকার সৎকার্য্যে মন দিল।

যেমন অবস্থা তেমনি ব্যবস্থা।

রামগোপাল বাবুকে তাঁহার ছেলে মেয়েরা ভয়ানক ভয় করে। কিন্তু তিনি যে ছেলেদের মারেন তাহা যেন কেহ মনে না করেন। কোন ছেলে কিছু অন্যায় কাজ করিলে রামগোপাল বাবু এমনি মুখ ভার করিতেন, যে তাহাতেই ছেলেদের শাস্তি হইয়া যাইত, এবং ছেলেরাও, পাছে ধাবা মুখ ভার করেন, এই ভয়ে সাবধান হইয়া চলিত।

একবার রামগোপাল বাবু ঠিক করিলেন, ছেলেদের আলিপুরের পশুশালায় লইয়া যাইবেন। বাবার আজ্ঞা পাইয়া ছেলেরা সুন্দর পোষাক পরিয়া প্রস্তুত হইল। বড় ছেলেটীর নাম মনোরঞ্জন, সে স্বভাবতঃই কিছু চঞ্চল, এক দণ্ডও স্থির হইয়া বসিতে পারে না; কখনও লাফাইতেছে, কখনও গাছ বা থাম ধরিয়া ঘুরিতেছে, কখনও বা গাড়ীর চাবুক গাছটা হাতে করিয়া শপাং শপাং শব্দে রাস্তার দু পাশের কাঁটা গাছ বা অন্য অগাছার মাথাগুলি কাটিতে কাটিতে ছুটিতেছে, হয় ত কাঁটা এবং চাবুক ছুয়েতে জড়াইয়া কাপড়ের পাড়টা ছিঁড়িয়া গেল, সে দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই।—মনোরঞ্জন পোষাক পরিয়া আসিয়া দেখিল, তখনও গাড়ী আসে নাই এবং তাহার পিতা তখনও প্রস্তুত হন নাই। তাহার বড় ইচ্ছা হইল যতক্ষণ গাড়ী না আসে, ততক্ষণ "ঝাঁ ক'রে এক পাক" বেড়াইয়া আসে—বলিল "বাবা! আমি এই রাস্তায় একটু ঘুরে বেড়াব?" পিতা বলিলেন—"তা যাও; কিন্তু সাবধান! যদি কোন রকমে পোষাক নোংরা করিয়া বা ছিঁড়িয়া ফেল, তা হ'লে তোমাকে নিয়ে যাব না।" ছেলে মনের আনন্দে সেই পাড়াতেই তার পিশীর বাড়ীর দিকে ছুটিয়া গেল। কিন্তু পাঁচ সাত মিনিট পরে মনোরঞ্জন যখন ফিরিল, তখন রামগোপাল বাবু দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলেন যে তাহার সমস্ত শরীরে কাদা, এক পাটী যুতো কোথায় ফেলিয়া আসিয়াছে, এবং হাতের খানিকটা যায়গায় কাটিয়া রক্ত পড়িতেছে। রামগোপাল বাবু ছেলের এই দুর্দ্দশা দেখিয়া দুঃখিত হইলেন বটে, কিন্তু এমন অসাবধান ছেলের শাস্তি হওয়া উচিত, এই মনে করিয়া মুখ ভার করিয়া বলিলেন—"যা বারণ করেছিলাম, তাই ক'রে ব'সেছ? যাও, তোমার মায়ের কাছে, গা হাত পা ধুয়ে ফেল গিয়ে, তোমাকে নিয়ে যাবনা।" মনোরঞ্জন জানিত, তাহার বাবা মুখ ভার করিলে আর তাঁর সঙ্গে তর্ক করা চলে না; তবুও বলিল "বাবা! আমি ইচ্ছা ক'রে—," রামগোপাল বাবু বলিলেন "আমি তোমার কোনও কথা শুন্‌তে চাই না। যাও আমার কাছ থেকে।" মনোরঞ্জন কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেল। গাড়ী তৈয়ার হইয়াছিল, রামগোপাল বাবু অন্য ছেলে মেয়েদের লইয়া গাড়ীতে উঠিলেন এবং ভগিনীর বাড়ীর নিকট দিয়া না গিয়া অন্য পথে আলিপুরে গেলেন। কিন্তু সে দিন পশুশালা দেখিয়া কাহারই সুখ হইল না—ছোট ছেলে মেয়েদের কেবলি দাদার কাঁদ কাঁদ মুখ খানি মনে পড়িতে লাগিল এবং রামগোপাল বাবুরও বড় কষ্ট হইতে লাগিল। যাহা হউক কোন রকমে পশুশালা দেখিয়া তাঁহারা বাড়ী ফিরিলেন। আসিবার সময় একবার ভগিনীকে দেখিয়া আসিতে ইচ্ছা হওয়াতে রামগোপাল বাবু গাড়ীটা অন্যপথ দিয়া ঘুরাইয়া আনিলেন। যখন ভগিনীর দরজায় নামিলেন, তখন দেখিলেন তাঁহার ভগিনী ছুটিয়া আসিতেছেন। তিনি আসিয়াই বলিলেন "দাদা! মনু কোথায়? আহা! আহা! বেঁচে থাক্। বাছার হাত পা ভাঙ্গে নি তো। তাকে সঙ্গে করে আন নি কেন?" রামগোপাল বাবু বলিলেন "কেন বল দেখি? আর তার হাত পা ভাঙ্গার ভয়ই বা কেন করছ?" ভগিনী বলিলেন "তা কি শোন নাই? সে কি কিছু বলে নাই? আহা! বাছা আমার কাছে না থাক্‌লে আমার খুকীর কি হ'ত? খুকী খেয়ে ওই পুকুরে মুখ-ধুতে গিয়েছিল; তা'যে পুকুর তাতো দেখ্‌তেই পাচ্ছ? এক ফোটা জল আর কেবলি কাদা। ওই যে কাঠ ফেলা, ওর উপর বসে খুকী খুব উবুড় হয়েও কোন মতেই জল নাঙ্গাল পায়না, শেষে একবার যাই খুব চেষ্টা করতে গেছে, আর অমনি মুখ থুবড়ে সেই কাদা জলের মধ্যে পড়ে হাবু ডুবু খেতে লাগ'ল। মনু সেই সময় কোথা থেকে সেইখানে এসেছিল, দেখ্‌তে পেয়েই লাফিয়ে পড়্‌ল এবং খুকীকে কোলে করে টান্‌তে টান্‌তে কাঠের কাছে নিয়ে এল, এমন সময় আমি এসে দেখ্‌লাম সে খুকীকে কাঠের উপর তুলে দিয়ে সে নিজে উঠ্‌ছে, কিন্তু তাহাকে উঠ্‌তে খুব কষ্ট পেতে হ'ল। জোর দিয়ে উপরে উঠ্‌তে গিয়ে তার হাতটা কেটে গেল, আর এক পাটী যুতো কাদাতে লেগে রইল। উপরে উঠ্‌লে আমি তার মুখে চুমো খেয়ে বল্‌লাম 'লক্ষ্মীবাবা আমার, এসো তোমার গা হাত পা মুছিয়ে দি।'—তা সে আমার কথা না শুনেই দৌড়ে চলে গেল।"

রামগোপাল বাবু ছেলের কথা শুনিয়া আনন্দে ভাসিয়া গেলেন। গায়ে কাদা লাগিলেই যে শাস্তি দিতে হইবে, তাহা নহে; তাঁহার ছেলে যতই কাপড় ময়লা করুক এবং যতই যুতো হারাইয়া ফেলুক, তাহাকে নিন্দা না করিয়া বরং কোলে করিয়া নাচান উচিত, রামগোপাল বাবু তাহা বুঝিলেন, এবং সমস্ত না শুনিয়া তাহাকে শাস্তি দিয়াছেন বলিয়া বড়ই লজ্জিত হইলেন। ছেলেদেরও দাদার কীর্ত্তি শুনিয়া মহা আহ্লাদ, তাহারা এতক্ষণ বাবার ভয়েতে কিছু বলে নাই; এখন বলিল "হ্যাঁ! বাবা, তুমি কেন দাদাকে কাঁদালে, তোমার বড় অন্যায়।"

রামগোপাল বাবু তাড়া তাড়ি বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন, তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। মনোরঞ্জন মনের কষ্টে না খাইয়াই বিছানায় গিয়া পড়িয়াছে, এবং কাঁদিয়া কাঁদিয়া ঘুমাইয়া গিয়াছে। রামগোপাল বাবু ঘুমান ছেলের নিকটে গিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিলেন এবং বার বার তাহার মুখ চুম্বন করিতে লাগিলেন। মনোরঞ্জনের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তখন রামগোপাল বাবু বলিলেন—"আমার যাদুধন! তোমার বাবাকে মাপ কর। আমি না জেনে তোমায় শাস্তি দিয়েছি। তুমি দুশ যোড়া যুতো ছেঁড়, তাতেও আমার আর কষ্ট নাই। পরের ভাল করতে গিয়ে গায়ে আঁচড় লাগ্‌লে, সেতো সোনার দাগ্!" মনোরঞ্জন কিছু থতমত খাইয়া বলিল "আমি সত্যই বলেছি বাবা! আমি ইচ্ছা

করে পোষাকে কাদা লাগাই নাই, আর যুতো হারিয়ে ফেলি নাই। তা তুমি তখন শুন্‌লে না, আমি কি কর্‌ব? আমার আরও সাবধান হওয়া উচিত ছিল, ইহা আমি বুঝেছি, কিন্তু আমি ইচ্ছা করে অসাবধান হই নাই; তুমি আমায় ক্ষমা কর।"

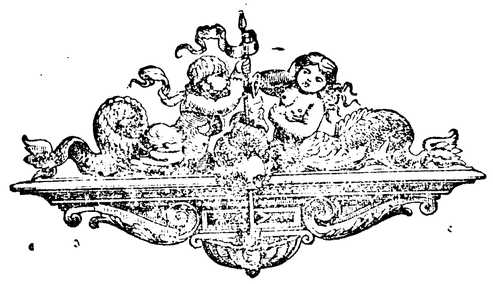

বালিকাদিগের বিশেষ বিষয়।

সেলাই।

(নং ১)

বালিকাগণ! তোমরা এতদিন ধরিয়া 'সখা' পড়িতেছ কিন্তু ইহা পড়িয়া চন্দ্রপুলি ছাড়া আর কিছুই প্রস্তুত করিতে শেখ নাই। এজন্য এবার থেকে যাহাতে তোমরা 'সখা' পড়িয়া কিছু প্রস্তুত করিতে শেখ তাহার চেষ্টা করা যাবে। এবারকার 'সখা' বাহির হইতে হইতে শীত আসিয়া পড়িল, এজন্য এবার তোমাদের শীতকালের ব্যবহার্য্য কিছু প্রস্তুত করিবার কথা বলা হইবে। তোমরা অনেকেই হয়ত শীতকালে বাবার, জ্যাঠার, কাকার, মামার, দাদার বা ছোট ভাই বোনের জন্য গলাবন্ধ বুনিয়া থাক কিন্তু প্রত্যেক বারেই হয়ত একই রকমের বোন। সেই জন্য এবার নূতন রকম করে বুনিবার বিষয় কিছু লেখা যাইতেছে।

প্রথমে কি কি রং দিয়া বুনিলে ভাল হয় বলি, পরে কি করিয়া বুনিতে হয় তাহা বলিব। যদি খুব বড়দের জন্যে বুনিতে হয় তাহা হইলে শুধু সাদা, পাঁশুটে রং, কটা রং বা সাদাতে কালতে; আর মাঝারি গোছের লোকের জন্য বুনিতে হইলে শুধু সাদা, সাদাতে নীলেতে, সাদাতে বেগুনীতে, পাঁশুটে রংয়েতে নীলেতে কিম্বা সেই যে একটুখানি সাদা আর একটুখানি নীল বা বেগুনী পশম পাওয়া যায় তাহাতে; আর যদি খুব ছোটদের জন্য বুনিতে হয় তবে সাদাতে ফিকে গোলাপীতে কিম্বা সাদাতে লালেতে বুনিলে ভাল হয়। এবার যে রকম করিয়া বুনিবার কথা লেখা যাবে সে রকম করিয়া বুনিতে হইলে চেরা পশম দিয়া বুনিতে হয়। একেবারে ভাল পশম দিয়া না বুনিয়া প্রথমে তোমাদের কাছে যদি একটু আধটু খারাপ পশম থাকে তাহা দিয়া বুনিয়া দেখিবে কিরূপ দেখায়, পরে ভাল পশম দিয়া বুনিতে আরম্ভ করিবে।

যত বড় বুনিবার দরকার তত বড় করিয়া বুনিতে হইলে সাধারণতঃ যত ঘর নিতে হয় তার দ্বিগুণ বড় যাহাতে হয় সেই আন্দাজে ঘর নিতে হইবে। ঘরের সংখ্যা এত হওয়া চাই যে যেন সেই সংখ্যাকে ১৩ দিয়া ভাগ করিলে ২ অবশিষ্ট থাকে।

ঘর নেওয়া হইলে প্রথমে ৮ লাইন সোজা বুনিতে হইবে, তাহার পর

১ম লাইন—২টা ঘর সোজা, * ২টা ঘর এক সঙ্গে সোজা, ২টা ঘর এক সঙ্গে সোজা; এই যে দুইবার ২টা ঘর এক সঙ্গে সোজা বুনা হইল ইহাতে ২টা ঘর কমিয়া যাওয়াতে এবার ঘর বাড়াইবার জন্য পশম সম্মুখে আনিয়া ১টা ঘর সোজা এইরূপে আরও তিনবার পশম সম্মুখে আনিয়া ৩টা ঘর সোজা, ২টা ঘর এক সঙ্গে সোজা, ২টা ঘর এক সঙ্গে সোজা, ১টা ঘর সোজা পুনরায় * চিহ্নিত স্থান হইতে আরম্ভ কর।

২য় লাইন—প্রথমে ৪টা ঘর উল্টা ও একেবারে শেষে ৪টা ঘর উল্টা মধ্যে ক্রমাগত ৭টা ঘর সোজা ও ৬টা ঘর উল্টা।

৩য় লাইন—সোজা।—

৪র্থ লাইন—উল্টা।—

পুনরায় প্রথম লাইন হইতে আরম্ভ কর; এই রূপ বুনিতে বুনিতে যখন যতটা লম্বা দরকার ততটা লম্বা হইবে তখন ৮ লাইন সোজা বুনিয়া মুখ বন্ধ করিতে হইবে। মুখ বন্ধ করা হইলে ইহার সোজা দিক্‌টা বাহিরে রাখিয়া লম্বা দিকে ঠিক দুপুরু করিয়া ভাঁজ করিতে হইবে তাহা হইলে যত চওড়া ছিল ঠিক তাহার অর্দ্ধেক চওড়া হইবে। ভাঁজ করা হইলে ইহার দুই ধার বরাবর এক সঙ্গে কারপেটের ছুঁচ ও যে রংয়ের পশম দিয়া বুনা হইয়াছে সেই রংয়ের চেরা পশম দিয়া খুড়িয়া যাইতে হইবে এবং অন্য গলাবন্ধের দুইদিকে যেরূপে ঝালর দিতে হয় সেইরূপে ঝালর দিতে হইবে তাহা হইলেই দেখিবে যে সুন্দর একটি দুহারা গলাবন্ধ হইয়াছে। পাঠিকাগণ! এখন হয়ত বুঝিতে পারিয়াছ কেন তোমাদের যত ঘর নেওয়ার দরকার ছিল তাহার দ্বিগুণ ঘর লইতে বলিয়াছিলাম।

কেরাণী পাখী।

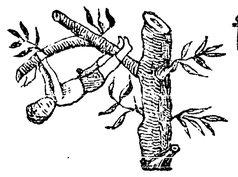

ক্ষিটীর নাম শুনিয়া পাছে কেহ রাগিয়া বসেন, এই জন্য আমরা প্রথমেই বলিয়া রাখিতেছি যে, এ নাম আমরা নূতন দিতেছি না। পাখীর মাথার পালকের ঝুঁটিগুলিতে ঠিক কাণে-কলম-গোঁজা কেরাণীর মত দেখা যায়, এই মনে করিয়াই কোন একজন লোক ইহার এই নাম রাখিয়াছিল। সেই অবধি আর বেচারা পাখীর এ দুর্নাম ঘুচিল না।

পক্ষিটীর ইংরাজী নাম 'Secretary Bird' এই নামের অর্থ "বড় লোকের বড় কেরাণী।" পাখীর ইংরাজী নামে তবু একটু গৌরব আছে, বাঙ্গালা করিতে গিয়া তাহাও রহিল না, কি করি?

কেরাণী-পাখী আফ্রিকাতে এবং অন্যান্য গরম দেশে বাস করে। সেই সেই দেশের সকল লোকেই, বিশেষতঃ চাষারা এই পাখীকে অতি যত্নে রক্ষা করে। তোমরা জান, গরম দেশে সাপ, ব্যাঙ্গ, পোকা প্রভৃতি লোককে কত জ্বালাতন করে। পোকাতে ধানের ক্ষেতে পড়িয়া, ঘরের খাবার জিনিষে বসিয়া, গরু, মহিষ, ঘোড়ার গায়ে লাগিয়া, বড়ই অনিষ্ট করে। কেরাণী-পাখী

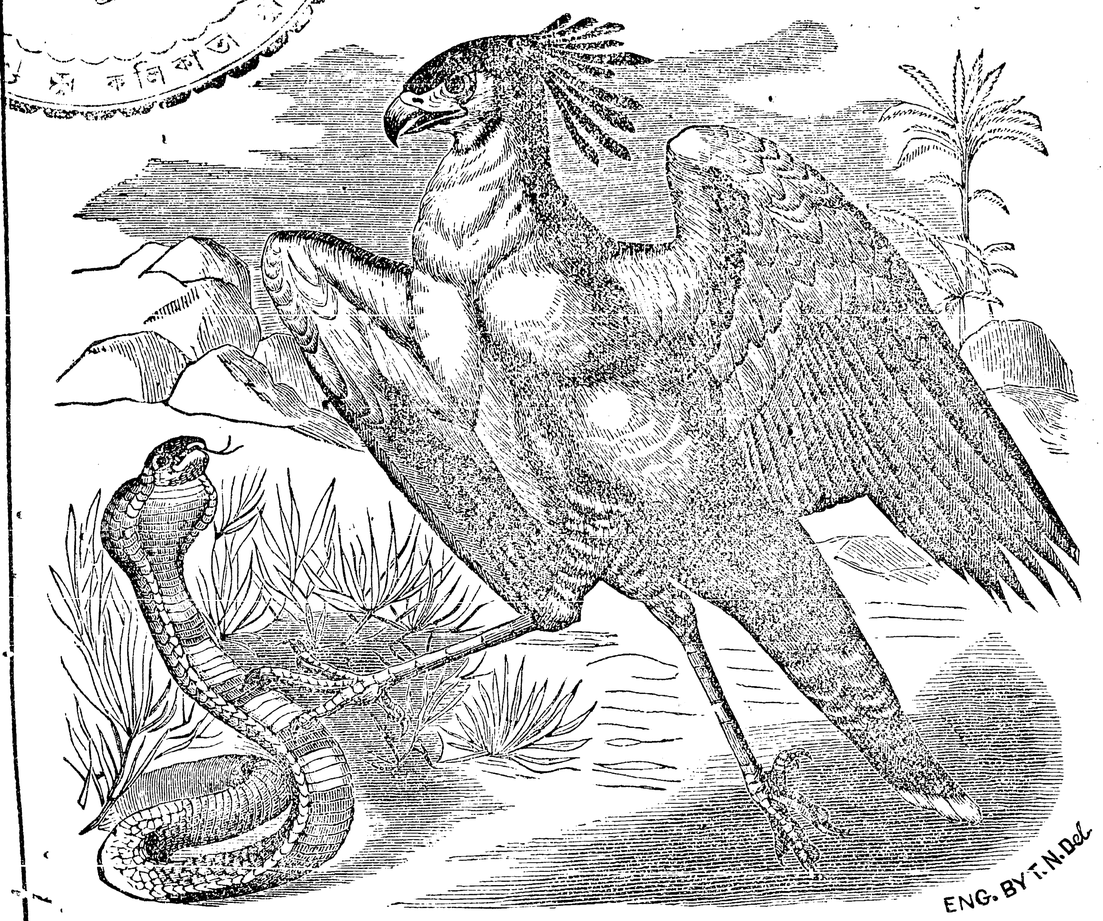

মানুষের অপকারী এই সকল জীব ধরিয়া খায়। পাখিটীর প্রধান খাদ্য সাপ; তাহার অভাবে, পোকা, টীকটীকি, ছোট কচ্ছপ, ইত্যাদিতেও আমাদের কেরাণী মহাশয়ের আপত্তি নাই। ছোট খাট সাপ হইলে তাহাকে একছোঁতে ধরিয়া লইয়া গিয়া কেরাণী-পাখী গাছের ডালে আছড়াইয়া মারে, কিন্তু বড় সাপ হইলে তাহার সঙ্গে বিস্তর যুদ্ধ করিতে হয়। ছবিতে দেখ, একটা সাপের সঙ্গে আমাদের পাখীটীর কি ভয়ানক যুদ্ধ বাঁধিয়াছে! সাপ গর্জ্জিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু কেরাণী-পাখী ডানা আগলাইয়া তাহার পলাইবার পথ বন্ধ করিয়া দাঁড়াইয়াছে, এবং নখের আঘাতে ও ডানার ঘায়ে সাপের বাছাকে নাকাল করিয়া তুলিতেছে, এ যাত্রা আর সাপের রক্ষা নাই!

কেরাণীকে দেখিতে যত তেজাল বোধ হয়, বাস্তবিক ইহার স্বভাব তত রাগী বা তেজাল নহে। কেরাণী-পাখী মানুষের শত্রু নষ্ট করিবার সময়েই আপনার তেজ দেখায়, কিন্তু অন্যান্য সময় আপনার প্রকাণ্ড বাসায় পক্ষিনীর সহিত মনের সুখে শান্তভাবে কাল কাটায়।

ঠাকুর দাদার গল্প।

মেঘ কি?

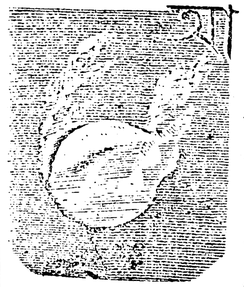

আজ সকালে নবীন বাবু ছেলেদের লইয়া একটু বেড়াইতে বাহির হইয়াছেন; কিশোরী, অমূল্য, মন্মথ, চন্দ্রনাথ, দেবেন, নগেন, চারু, নলিন ও মাখন সকলেই সঙ্গে আছে। বড় শীত, সকলেরই গায়ে গরম কাপড়। কিন্তু খানিক চলিতে চলিতে শীত চলিয়া গেল, বেশ্ গরম হইয়া উঠিল। পরিশ্রম করিলে কি শীত থাকে? যে সব ছেলেরা শীত বলিয়া প্রাতঃকালে বেড়াইতে যায় না তাহারা কুড়ে, জানে না প্রাতে বেড়াইলে শরীর কত ভাল হয়। আর সকালে বাহিরের বায়ু যেমন পরিস্কার ও পবিত্র বাড়ীর ভিতর ঘরের বায়ু তেমনি অপরিস্কার ও রোগজনক। তা ছাড়া প্রাতঃকালে স্বভাবের অতি চমৎকার শোভা হয়, তাহা দেখিলে মন বড় পবিত্র হয় ও অনেক ভাল ভাল বিষয় শিক্ষা করা যায়। তাই বালকগণ ঠাকুর দাদার সঙ্গে বা আলাদা আলাদা প্রত্যহই প্রাতঃকালে ভ্রমণে বাহির হয়। আজ সকলে একত্রে বাহির হইয়াছে, কিছু শিখিতে হবে এই অভিপ্রায়।

নানা প্রকার কথাবার্ত্তা হইতে হইতে ক্রমে গঙ্গার তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখনও সূর্য্য উঠে নাই। গঙ্গার জল হইতে ধূমের মত বাষ্প উঠিতেছে, শিশিরে ঘাস, পাতা, সব ভিজিয়া গিয়াছে, কাকেরা একটা গাছ হইতে অন্য গাছে উড়িয়া যাইতেছে আর উচ্চৈঃস্বরে "কা" "কা" "কা" করিয়া চীৎকার করিতেছে। ঘাটে বসিবার যো নাই, ভিজা সুতরাং সকলে ফিরিলেন। আসিবার সময় কিশোরী বলিল "দাদা মশাই! ঐ যে ধোঁয়ার মত কি জল থেকে উঠ্ছে ঐ কি বাষ্প?"—নবীন বাবু বলিলেন "হাঁ।" কিশোঃ—"তবে যে আপনি বলেন বাষ্প দেখা যায় না? এই ত বেশ্ দেখা যাচ্ছে? এই কথাটা আর মেঘের কথাটা ভাল করে বুঝিতে পারি নাই, আজ বুঝাইয়া দিবেন?" নবীন বাবু বলিলেন "চল বলিতে বলিতে যাই। কেমন নলিন? একথা কি তোমার পক্ষে বড় শক্ত হবে?" (নলিন—"না") তবে মন দিয়া শুন। তোমরা ভুলিয়া গিয়াছ, প্রথম ভাগ "সখা"তে ১৪ পৃষ্ঠায় একথা একটু লেখা আছে, তা বরং খুলে দেখিও। এখন তোমরা একটু বড় হইয়াছ তার চেয়ে আরও একটু ভাল করিয়া বুঝিতে পারিবে।

তাপ পেলেই যে সব জিনিষ পাৎলা হয় তা এক দিন বলিয়াছি। পাৎলা জিনিষ তাপ পেলে বাষ্প হয় তাও তোমরা জান। বাষ্প সবই অদৃশ্য নয়, অনেক রকমের বাষ্প আছে তাদের লাল, নীল কত প্রকার বর্ণ থাকে। কিন্তু জল উত্তপ্ত হইয়া যে বাষ্প হয় তাহার নাম জলীয় বাষ্প, উহার কোন প্রকার রঙ্ নাই।"

মন্মথঃ—"তবে এই যে আমি হাই তুলি আর ধোঁয়ার মত বাষ্প বাহির হয়, ওর ত রঙ্ আছে?"

নবীন বাবু—"ছিঃ! ব্যস্ত হও কেন? চিরকালই কি ছেলে মানুষ থাক্বে? বল্ছি শুন না। মুখ দিয়া যে ধোঁয়া বাহির হয় বা জল হইতে যাহা উঠে তাহা কেবল শীতকালেই দেখা যায়, গ্রীষ্ম কালে মোটেই দেখা যায় না। (সকলেঃ

"ঠিক কথা। কেন দাদা বাবু?") তাহার কারণ আছে। গ্রীষ্ম কালে কি বাষ্প উঠে না? তা নয়। বরং গ্রীষ্ম কালে সূর্য্যের তেজ বেশী ব'লে বেশী বাষ্প উঠে, কিন্তু দেখা যায় না কেন না সে সময়ে বায়ু গরম থাকে বলিয়া উহা বাষ্প অবস্থাতেই থাকিয়া যায় কাজেই অদৃশ্য থাকে। আর শীত কালে চারিদিকের বায়ু খুব ঠাণ্ডা, এজন্য যেই বাষ্প মশাই জল থেকে উঠেন, অমনি ঠাণ্ডা বাতাস লেগে জমাট্ বাঁধিয়া অতি সূক্ষ্ম জল কণা হইয়া যান। সেই সব জলের কণারা ঐ ধোঁয়ার মত দেখা যায়।"

কিশোরী—"দেখ অমূল্য? সে দিন তুমি যে জিজ্ঞাসা করিতেছিলে সেই বরফ খানার গা দিয়ে ধোঁ উড়ছিল কেন, তার কারণ আমি এখন বুঝিতে পারিলাম। আচ্ছা, দাদা বাবু, বরফের গা দিয়ে গ্রীষ্মকালেও ধোঁ উঠে এই জন্যে নয় যে—আগে বরফের গায়ে লেগে চারিদিকের বাতাসটা খুব ঠাণ্ডা হয়, তার পর যখন ঐ বরফ থেকে বাষ্প উঠে, তখনি অমনি ঐ ঠাণ্ডা বাতাসে লাগিয়া জমিয়া এই রকম সূক্ষ্ম জলকণা হইয়া যায়, তাই দেখা যায়। না?"

নবীন বাবু সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন্ "ঠিক বলিয়াছ। তোমরা সকলেই এখন বেস্ বুঝিয়াছ বোধ হয় যে ঐ যেটা ধোঁয়ার মত দেখা যায় ওটা বাষ্প নয়, অতি সূক্ষ্ম জলকণা। (সকলে:—"বেশ, উত্তম।") আচ্ছা! আর একটী কথা আছে। দিন রাত, সদা সর্ব্বক্ষণই জল থেকে বাষ্প উঠ্ছে। সমুদ্র, হ্রদ, নদী, পুকুর, খানা, ডোবা, ভিজে মাটী, ভিজে কাপড়, গাছ ও প্রাণীদের শরীর, সব স্থান থেকেই জলীয় বাষ্প সর্ব্বদা বায়ুতে যাচ্ছে। বেশ্! এটা উপরে উঠে কেন?—না বাতাসের চেয়ে হাল্কা ব'লে। উপরের বাতাস কিন্তু নীচের বাতাসের চেয়ে হাল্কা, কেন না যত উপরে যাওয়া যাবে ততই বাতাস কম, তা তোমরা জান, পূর্ব্বেই বলিয়াছি (১১০ পৃষ্ঠা ১ম ভাগ "সখা" দেখ।) তবেই বুঝতে পার যে এই বাষ্পরাশি উঠিতে উঠিতে এমন এক স্থানেতে পৌছিবে যেখানে বাতাস এর চাইতে আর ভারী নয়। যেখানকার বাতাসের ভার, ইহার নিজের ভারের সমান। আরও পরিষ্কার করিয়া বলি। যত উপরে উঠা যায় ততই বায়ুর ভার কম; কাজেই নীচের বায়ুর চেয়ে হালকা বাষ্পগুলো উঠ্তে উঠ্তে এমন যায়গায় পৌছাবেই পৌছাবে যেখানে বায়ুর অপেক্ষা আর সে হাল্কা নয়। সেখানে কি হবে? (সকলে "ভেসে থাক্বে।") ঠিক্। সেইখানে গিয়া ঐ বাষ্প ভাস্বে।" নলিন বলিয়া উঠিল "তাই বুঝি মেঘ?" মন্মথ বলিল "সে কি রকম হবে? মেঘ ত দেখা যায়, বাষ্প কি দেখা যায়? আ বোকা! এই বুঝি শুন্ছ?" নলিন—"হাঁ হাঁ হাঁ! ঠিক বটে। আচ্ছা দাদা বল, তার পর? মেঘ কি করে হয়?"

নবীন বাবু—"এদিকে পূর্ব্বে (সখা ১ম ভাগ, ১১১ পৃষ্ঠা দেখ) শুনিয়াছ, যত উপরে উঠা যায় ততই শীত অধিক। (সকলে, "হাঁ মনে আছে।") এখন ঐ বাষ্প উপরে উঠিবার সময় ক্রমেই ঠাণ্ডা যায়গায় পৌছাতে লাগিল, আর অমনি সেই জন্য—? (সকলে:—"জমিয়া সূক্ষ্ম জলকণা হইয়া গেল। কেমন?") হাঁ ঠিক। যত উপরে উঠে বাষ্প ততই শীতল স্থানে গিয়া শীতল বায়ুতে লাগিয়া জমিয়া যায়। এইটী শীতের শেষে বেশ্ সুন্দর দেখা যায়। মাঘ ফাল্গুণ মাসে সমস্ত দিন যে বাষ্প উঠে, তাহারা উপরে উঠিতে থাকে। কিন্তু সে সময় বাতাস খুব ঠাণ্ডা কিনা?—তাই বেশী দূর উঠিবার পূর্ব্বেই জমিয়া যায় আর সকাল বেলাপর্য্যন্ত অন্ধকার করিয়া 'কুয়াশা'' হইয়া থাকে। (সকলে:—"বটে? তা জানতাম না। কি চমৎকার! কুয়াশা কি ক'রে হয় শিখে গেলাম। হাঃ হাঃ হাঃ।") আচ্ছা! আমারও বড় আহ্লাদ হচ্ছে। তোমরা নূতন নূতন বিষয় শিখিলে আমিও বড় খুসী হই। এখন আরও শুন। এই কুয়াশাটা যখন নীচে হয় তখনই দেখা যায়, আর যখন উপরে হয়, তখন আর কুয়াশার মত দেখা যায় না তখন উহাকে "মেঘ" বলে। যেমন বড় বড় কলের চিম্নী দিয়ে যে ধোঁয়া বাহির হয় তাহা খুব উপরে উঠিয়া ভাসিয়া থাকিলে ঠিক মেঘের মত দেখায় তেমনি এই কুয়াশাই উপরে ভাসিলে মেঘ হয়! বাস্তবিক দার্জ্জিলিং, সিমলা, প্রভৃতি উচু পাহাড়ের দেশে ঘরের জানালা দরজা খোলা থাকিলে এক এক খান মেঘ ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া কাপড়, মশারি সব ভিজাইয়া দেয়। সেখান থেকে বেশই বোঝা যায় যে, মেঘ কুয়াশা বৈ আর কিছুই নয়।"

কিশোরী—"ভাল, একটা কথা। কুয়াশা ত বেশী ক্ষণ থাকে না, একটু বেলা হ'লেই যায়, কিন্তু মেঘ যে সমস্ত দিন থাকে. আর অত উপরে যে জলের কণা থাকে, তা প'ড়ে যায় না কেন? বাষ্পই যেন বাতাসের চেয়ে হালকা, জলকণা ত আর বাতাসের চেয়ে ভারী বৈ হালকা নয়? এটা কি রকম?"

নবীন বাবু বলিলেন "ঐ কথা নিয়ে বড় বড় পণ্ডিতদের মধ্যে মহা গোলযোগ বাধিয়া গিয়াছে। আগে পণ্ডিতেরা মনে করিতেন যে বাষ্প যখন জমিয়া সূক্ষ্ম জলকণা হয়, তখন তার সঙ্গে অতি সূক্ষ্ম বায়ুর কণাও মিলিত থাকিত। আরও ভাল করিয়া বলি। মনে কর জল জমিয়া যখন বরফ হয়, তখন জমিবার সময়ে জলের ছোট ছোট কণার সঙ্গে বিন্দু বিন্দু বাতাসও থাকিয়া যায়। তা একটা বরফের চাঁই মন দিয়া দেখিলেই জানিতে পারিবে। তাতে সুতার মত সরু সরু বাতাস থাকিবার পথ আছে দেখিতে পাইবে। এই জন্য বরফ জলের চেয়ে হালকা হয় ও ভাসে, ঠিক তেমনি বাষ্পের এক একটী কণার সঙ্গে বাতাস মিশান ছিল কিনা? ঐ বাষ্প জমিবার সময় ঐ বাতাসটুকুও তার সঙ্গে জমিয়া যায়; ঠিক সাবানের ফেণার মত, তবে খুব ছোট। কাজেই জল ভারী হলেও বাতাস মিশান থাকে বলিয়া উপরের বায়ুতে ভাসে। এই ছিল আগেকার পণ্ডিতদের মত। আজ কাল 'হক্সলী' 'টিণ্ডেল্' প্রভৃতি মহা মহা পণ্ডিতদের মতে সেটা ঠিক নয়। ইহাঁরা বলেন যে জলের কণাগুলি এত ছোট, এত সূক্ষ্ম যে তাহাদের বাতাসে ভাসিয়া থাকিবার কোন বাধা হয় না। মনে কর লোহা ত জলের চেয়ে ৭৮৪ গুণে ভারী, কিন্তু কামারদের দোকান থেকে খুব গুঁড়া লোহা আনিয়া যদি জলে ফেলিয়া দাও দেখিবে ডুবিয়া যাবে না, দিব্যি ভাস্বে। তার মানে কি?—না, ভারী হলেও খুব সূক্ষ্ম কণা ব'লে ভাসিল। এও তেমনি, জল বায়ুর চেয়ে ভারী হ'লেও, কণাগুলি এত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম যে স্বচ্ছন্দে বাতাসের উপর ভাসিয়া থাকে। আরও একটা কারণ আমার বোধ হয় এই যে, বাতাস নাকি অনবরতই চসে বেড়ায় একটুও স্থির থাকে না, সে জন্যেও জলের কণাগুলি নামিতে পায় না। মনে কর একটা বড় জালায় এক জালা ঘোলা জল পূরিয়া যদি এক দিন রাখা যায় তবে সে সব ময়লা থিতিয়া জল পরিস্কার হয়, অর্থাৎ ঐ সব ধূলি-কণা জলের চেয়ে ভারী ব'লে নীচে পড়িয়া যায় কিন্তু যদি ঐ জালাটা নিয়তই নাড়া যায়,

তবে ধূলা কখন থিতিতে পায় না, জল ঘোলাই থাকে। এখানেও তেমনি হয়। বুঝেছ? মেঘ যে জলকণা হ'লেও ভাসে কেন, তার আরও একটা কারণ আমার বোধ হয় এই যে, মেঘেরা যেমন দেখায় তেমন কিন্তু নিশ্চল নয়। ভাল ক'রে দেখিলেই টের পাবে যে একখানা মেঘের ক্রমিক চেহারা বদ্‌লায়। কম্‌ছে, বাড়ছে, ঘুর্‌ছে, ফির্‌ছে, পাৎলা হচ্ছে, ঘন হচ্ছে—ইত্যাদি। তার মানে কি?—না, একখানা মেঘ হইয়া আর উপরে থাকৃতে না পেরে নামিয়া আসিয়া ভারী হয়ে পৃথিবীতে পড়িতে চায়। কিন্তু যেই নীচের দিকে আসে, অমনি নীচের উষ্ণতর বায়ুর গায়ে লাগিয়া আবার বাষ্প হইয়া অদৃশ্য হইয়া উপরে উঠে। এইরূপে মেঘ উপরেই খেলা করিয়া বেড়ায়, নামিতে পায় না। বড় মানুষের ছেলের মত উপরেই খেলা, উপরেই বাস। নীচু লোকেদের কাছে আসে না। অহঙ্কারে উন্মত্ত হয়ে গা ফুলিয়ে উড়িতে থাকে।"

চারু—"আঃ! আজ কেমন সুন্দর কথা শিখিতে পারিলাম। এ বিষয়টী আরও অনেক বার ভাবিতে হইবে এবং "সখায়" যখন লেখা হবে তখন অনেক বার পড়িব। তাহলে বেশ মনে থাকৃবে। এস ভাই! আজ সকলে ভক্তির সহিত দাদা বাবুকে প্রণাম করিয়া বাড়ী যাই। বেলা হইলে পড়া তৈয়ার করা হবে না।" তখন সকলে গৃহে গেলেন।

ধাঁধা।

নূতন।

১।—ছেলেবেলা একদিন বসে আক কষ্‌ছি হঠাৎ বাবা আর মা দুদিক থেকে এসে আমার হাত থেকে একটা জিনিষ কেড়ে নিয়ে দুজনে ভাগ করে নিলেন। নিয়েই বাবা লিখিতে লাগিলেন, আর মা রান্নাঘরে গিয়ে বাটনা বাটিতে বসিলেন; সব গোল মিটে গেল। কি করে?

২।—তিন বর্ণে অঙ্গ মম সাজান কেমন,
দিনের প্রথম ভাগে দিই দরশন।
মাথা হ'তে কটি মোর ঝক্‌ঝক্ জ্বলে,
সে জ্যোতি হেরিয়া মুগ্ধ মানব সকল।
প্রবাদ—আমার দেহ করিয়া ভোজন,
বাঁচিতেছে চিরকাল বঙ্গবাসীগণ।

৩।—আমি অতি নীচ জাতি, ছুঁলে নাইতে হয়। একদিন পূর্ণিমার রাত্রে চাঁদের কাছ থেকে একটী ফোঁটা চেয়ে যাই মাথায় পরেছি, আর আমায় মান দেখে কে? তখন আর আমি না হলে ব্রাহ্মণদের রান্নাই হয়না। বলত আমি কে?

৪।—দশ হস্ত পদ মম সুগোল শরীর,
জলে কিম্বা স্থলে বাস নাহিক সুস্থির।
পিতা মম মহাবীর কুরুক্ষেত্র রণে,
ত্যজিলেন দেহ সুধু আমার কারণে।
পাণ্ডবের ভয়ে আমি এখনও অস্থির,
বধে পাছে ঘর হ'তে করিয়ে বাহির।
নিজ সন্তানের হস্তে মম হইবে মরণ,
বলত সুবুদ্ধি শিশু আমি কোন জন?

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে মুদ্রিত এবং ২ নং বেণিয়াটোলা লেন, "সখা" কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

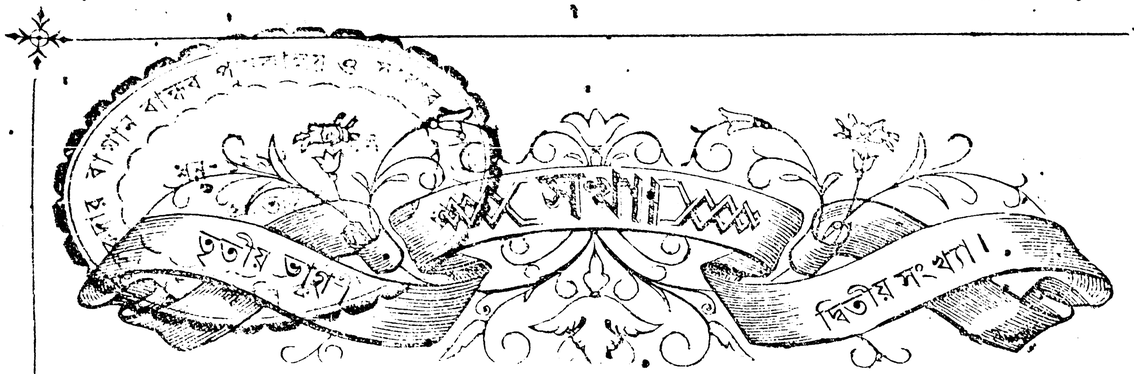

ফেব্রুয়ারি, ১৮৮৫।

অক্ষয়কুমার দত্ত।*

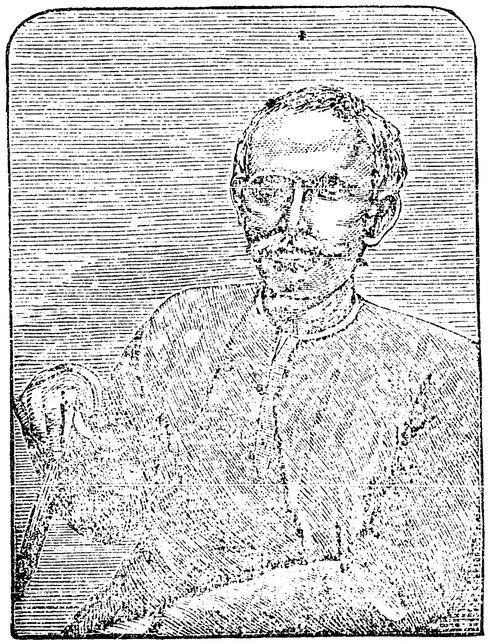

কোন ছেলে বা মেয়ে কে আছে যে, চারুপাঠ পড়ে নাই বা পড়িবে না? বড়দের মধ্যেই বা এমন কজন আছেন যাঁরা ধর্ম্মনীতি, পদার্থবিদ্যা, বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার, এবং, ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায় নামক চমৎকার পুস্তকগুলি পড়েন নাই। এ সকল পুস্তক যাঁহার লেখা, তিনি আমাদের দেশের একজন বড়লোক, তাঁহার নাম বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত। যদি জানিতে চাও, মানুষ নিজের চেষ্টায়, নিজের যত্নে, নানা অসুবিধার মধ্যেও কতদূর বড় হইতে পারে, তবে বাবু অক্ষয়কুমার দত্তের কথা শোন, শুনিয়া অবাক্ হইয়া যাইবে।

১২২৭ সালের শ্রাবণ মাসে নবদ্বীপের কাছে একখানি ছোট গ্রামে অক্ষয়কুমার দত্তের জন্ম হয়। যখন তাঁহার সাত বছর বয়স, তখন হইতে তিন বৎসর অর্থাৎ দশ বছর বয়স পর্য্যন্ত গুরু মহাশয়ের কাছে সামান্য লেখাপড়া শিখিয়া অক্ষয় বাবু কিছুকাল পরে কলিকাতার দক্ষিণে খিদিরপুর নামক স্থানে আসেন। এই সময়ে সর্ব্বত্রই পারসী লেখাপড়া চলিত ছিল;—আদালতে পারসী ভাষাতেই কর্ম্ম-কাজ চলিত। অক্ষয় বাবুর আত্মীয়েরা কাজেই অক্ষয় বাবুকে পারসী শিখাইবার জন্য ব্যস্ত হইলেন; কিন্তু এই সময়ে একখানি ইংরাজী পুস্তকের বাঙ্গালা অনুবাদ পড়িয়া তাঁহার বড়ই আনন্দ হয়। তিনি দেখিলেন ইংরাজী ভাষাতে এমন সকল বিষয় আছে, যাহা বুড়োদের চলিত বিশ্বাসের সঙ্গে মেলে না বটে, কিন্তু তাহা সমস্তই ঠিক। সেই অবধি অক্ষয়কুমারের ইংরাজীর দিকে মন গেল—সেই

* নব-বার্ষিকী হইতে জীবনী-বিষয়ে সাহায্য পাইয়াছি।

অল্প বয়সে পিতা ও আত্মীয়দিগের অনুরোধ কাটাইয়া অক্ষয়কুমার ইংরাজী শিখিবার জন্য এক পাদ্রীর স্কুলে 'ভর্ত্তি' হইলেন। "পাদ্রীদের স্কুলে পড়িতেছে এ ছেলেটা খ্রীষ্টান হইবে," এই মনে করিয়া অক্ষয়কুমারের আত্মীয়েরা তাঁহাকে স্কুল ছাড়িয়া আসিতে বলিলেন, কিন্তু অক্ষয় বাবু তাহাতে রাজি হইলেন না। অবশেষে যখন তাঁহার প্রায় ১৭ বৎসর বয়স, তখন কর্ত্তারা পরামর্শ করিয়া অক্ষয়কুমারকে কলিকাতায় আনিয়া গৌরমোহন আঢ্যের স্কুলে 'ভর্ত্তি' করিয়া দিলেন। এতদিন নানা কারণে অক্ষয় বাবুর প্রায় কিছুই লেখাপড়া হয় নাই; এইবারে সুবিধা পাইয়া মন খুলিয়া লেখাপড়া করিতে লাগিলেন, কিন্তু অক্ষয় বাবু এ সুখ দুই তিন বৎসরের অধিক ভোগ করিতে পান নাই। আড়াই বৎসর পরে অক্ষয় বাবুর পিতার মৃত্যু হওয়াতে, তাঁহার কাঁধেই সংসারের ভার পড়িল; তখন তাঁহার স্কুলে পড়ার সুবিধা আর কিসে হইবে?

স্কুলে পড়া হইল না বটে, কিন্তু তাঁহার পড়া শুনা ঘুচিল না। একদিকে চাকরীর চেষ্টা, আর একদিকে লেখাপড়া শিক্ষা,—ভয়ানক পরিশ্রম; কিন্তু অক্ষয়কুমারের গ্রাহ্য ছিল না। আবার, পড়িবার বইগুলি কেমন সহজ এবং সুখময়—অঙ্কশাস্ত্র, জ্যোতিষ প্রভৃতি বিজ্ঞান, সংস্কৃত নানারূপ পুস্তক, ইত্যাদি!! তোমার আমার মত ছেলে হইলে হয়ত বলিয়া উঠিত—"আমার কপাল মন্দ! বাবা মরিয়া গেলেন; কেমন করিয়াই বা স্কুলে পড়ি? আবার এদিকে সমস্ত দিন 'চাকরী বাকরী'র চেষ্টা করিয়া ঘরে এসে পড়া শুনো করা—তা বাপু! পেরে উঠিনা।"

এইখানেই বুড়লোকে ছোটলোকে তফাৎ, এইখানেই অক্ষয় বাবুর মত লোকে আর তোমাতে আমাতে তফাৎ!

অনেক দিন গেল। অক্ষয় বাবু বিখ্যাত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক হইলেন। তাঁহার সাংসারিক কষ্ট একরূপ ঘুচিল বটে, কিন্তু তাঁহার প্রাণের আশা মিটিল না। অক্ষয় বাবু তাঁহার আশা মিটাইবার জন্য দিনরাত খাটিতে লাগিলেন—কোন কোন দিন সমস্ত রাত জাগিয়াও লিখিতে আরম্ভ করিলেন। এই পরিশ্রমের ফলে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার শ্রী ফিরিল, বাঙ্গালী ছেলেদের পড়িবার জন্য দুচারখানা পুস্তক প্রকাশিত হইল, ব্রাহ্ম সমাজের কর্ত্তাদের ধর্ম্ম-বিষয়ে অনেক সাহায্য হইল; কিন্তু যিনি এই সকলের কর্ত্তা তাঁহাকে ভয়ানক শিরঃপীড়ায় অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলিল। তখন সমস্ত কাজকর্ম্ম ছাড়িয়া অক্ষয় বাবু কলিকাতা ছাড়িয়া গেলেন। অক্ষয় বাবু আজকাল বালীগ্রামে থাকেন। তাঁহার বাড়ী যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারাই বলিবেন, অক্ষয় বাবু বাড়ীঘর সুন্দর করার সম্বন্ধে যে সকল উপদেশের কথা তাঁহার চারুপাঠে লিখিয়া গিয়াছেন, তিনি নিজের বাড়ীতে সেই উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে খাটাইয়া দিয়াছেন। এই জন্যই তাঁহার একজন বন্ধু তাঁহার "শোভনোদ্যান"কে 'চারুপাঠ ৪র্থ ভাগ' এই নাম দিয়াছেন।

অক্ষয় বাবু এখন অত্যন্ত পীড়িত। তাঁহার লিখিবার সাধ্য নাই, পড়াশুনা করিবার বিশেষ সুবিধা নাই। অথচ এই দারুণ পীড়ার মধ্যেও তাঁহার "ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়" নামক প্রকাণ্ড পুস্তক বাহির হইয়াছে। কেমন করিয়া এ আশ্চর্য্য ব্যাপার ঘটিল, যাঁহারা জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা "উপাসক-সম্প্রদায়" দ্বিতীয় ভাগের শেষটুকু পড়িবেন; কেমন করিয়া এর, ওর, তার খোসামোদ করিয়া, নিরেট মূর্খের দ্বারা একটু একটু করিয়া টুকরা টুকরা কাগজে লেখাইয়া সেইগুলি জড় করিয়া এই বৃহৎ পুস্তক হইল, "উপাসক-সম্প্রদায়ের" পাঠকের কাছে সে কথা অজানা নাই। ধন্য উৎসাহ! ধন্য ক্ষমতা!

অক্ষয় বাবুর বয়স এখন ৬৪ বৎসর। আমরা তাঁহার পীড়িত অবস্থার একটী ছবি দিলাম। এই ছবি তাঁহার ৫৫ বৎসর বয়সে তোলা। অক্ষয় বাবু তাঁহার উপাসক-সম্প্রদায় দ্বিতীয় ভাগে আমাদিগকে আশা দিয়াছেন, যে সুবিধা হইলে তিনি উপাসক-সম্প্রদায়ের তৃতীয় ভাগও যত শীঘ্র হয় প্রকাশ করিবেন। আমরা তাঁহার এই শরীরে এইরূপ সাহসের কথা শুনিয়া অবাক্ হইয়াছি। তাঁহার মনের ইচ্ছা যাহা, তাহা সফল হউক; আমরা যে এত ছোট, আমাদের কুড়েমি এই চিররোগী বৃদ্ধের উৎসাহ দেখিয়া ভাঙ্গিয়া যাক্—এসো আমরা সকলে তাঁহার পায়ের তলায় বসিয়া তাঁহার মত হইতে চেষ্টা করি।

ঠাকুরদাদার গল্প।

মেঘে কি হয়?

বালকগণ সেদিনকার কথা শুনিয়া এত উপকার বোধ করিয়াছিল যে আজ আরও অনেককে সঙ্গে করিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বে নবীন বাবুর সঙ্গে বাহিরে ভ্রমণ করিতে আসিয়াছে। ছোট ছোট ছেলেরা নূতন নূতন বিষয়ের জ্ঞান লাভ করিবার জন্য এরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিলে কার না আনন্দ হয়? নবীন বাবু পরম আনন্দে সকলকে সঙ্গে করিয়া বাহিরে চলিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন কি বিষয়ে গল্প হইবে; সেদিন সকলে ঠিক করিয়া আসিয়াছিল যে মেঘ হইতে আরও কি হয় জানিতে হইবে। সেই কথাই হওয়া স্থির হইল। তখন নবীন বাবু বলিতে লাগিলেন:—

"সেদিন তোমরা জানিতে পারিয়াছ যে মেঘ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জল কণার কুয়াশা বৈ আর কিছুই নয়। এই সব জলকণা আবার ক্রমাগতই বদ্‌লাইয়া কখন বাষ্প হইতেছে আবার শীতল হইয়া জলে পরিণত হইতেছে। ক্রমে যখন কোন কারণে এই মেঘ হাওয়ায় ভাসিতে ভাসিতে এমন স্থানে আসে, যেখানে শীত বেশী, তখন ইহার অধিকাংশ জলকণা আরও শীতল হইয়া ভারী হয় আর বড় হয়। তখনই বৃষ্টি হইয়া মাটীতে পড়ে। এটুকু তোমরা সকলেই বোধ হয় জান। (নলিন:—"না দাদা! আমি ভাল জানি না, বল।") কেন? এত খুব সহজ কথা? জল গরম হইলে বাষ্প হয় আবার ঐ বাষ্প শীতল হইলে জমিয়া জল হয়। এও তাই। গরম বাতাসের মধ্যে যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ বাষ্প হইয়াই থাকে আর যখন বাতাসে ভাসিতে ভাসিতে চালিত হইয়া কোন শীতল দেশে বা স্থানে পৌঁছায় তখন ঐ বাষ্প সকল খুব ঠাণ্ডা হইয়া জমিয়া জল হয়। এই জল আগে ছোট ছোট কণা হইয়া কুয়াশার মত হয়। তার পর আরও শীতল হইতে থাকিলে ক্রমে বৃষ্টির আকার ধারণ করে। কিন্তু তখনও গুঁড়ি গুঁড়ি জলকণা থাকে। পরে যত নীচে নামিতে থাকে তত পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হইয়া বড় হয়। কোন

পর্ব্বতের উপরে উঠিয়া এইরূপ কুয়াশা হইতে বৃষ্টির উৎপত্তি লক্ষ্য করিয়া দেখিলেই এই বিষয় বেশ বুঝা যায়। একেবারে মেঘ হইতেই বৃষ্টির মত বড় বড় ফোঁটা পড়ে না। নীচে নামিতে নামিতে অনেক গুলি কণা মিলিয়া গিয়া তবে বড় বড় ফোঁটা হয়। বুঝিলে?" (সকলেঃ—হাঁ, বেশ বুঝেছি।)

"তার পরে আরও ২।৪ টী কথা বলিয়া বৃষ্টির কথা শেষ করিব। শীতল হইলেই ত বৃষ্টি হয় বুঝিলে। শীতল কত উপায়ে হইতে পারে? এ সহজ কথা। মনে কর যদি এক স্থানে বায়ু রাশি রাশি বাষ্প লইয়া চলিয়াছে, ক্রমাগত দেশের পর দেশ পার হইয়া চলিয়াছে; অবশেষে এমন একটা পর্ব্বতের গায়ে আসিয়া ঠেকিল যে আর যাইতে পারে না। তখন কি হবে? পর্ব্বতের গা ঢালু কি না (বুরুজ বা পুকুরের পাড়ের মত ক্রমে ক্রমে উচ্চ), এজন্য ঐ বায়ু তখনই গা বহিয়া চূড়ার দিকে উপরে উঠিতে আরম্ভ করে। আর তোমরা জান যে যত উপর তত শীতল! কাজেই ঐ বায়ু ও বাষ্প সব শীতল হইতে আরম্ভ করে। শীতল যে হওয়া, আর অমনি বাষ্প মশাই গলে একেবারে জল! কেমন? (সকলে হাঁ!) আর কি? হুঁ হুঁ করিয়া এক পশলা বৃষ্টি হইয়া যায়। এই রকম করিয়া আমাদের দেশের মলবার উপকূলে ভয়ানক বৃষ্টি হয়। আরব সাগর হইতে গ্রীষ্ম কালে বায়ু বহে, তাহাকে দক্ষিণা (বা দক্ষিণ পশ্চিমের) বায়ু বলে। এই বায়ু বিস্তর বাষ্প লইয়া ভারতবর্ষের দিকে আসিতে থাকে, কিন্তু পথিমধ্যে পশ্চিমঘাট গিরির গায়ে ঠেকিয়া আসিতে পারে না, উপরে উঠিয়া পড়ে কাজেই উহার প্রায় সমস্ত বাষ্পই বৃষ্টি হইয়া পর্ব্বতের গা ভাসাইয়া দেয়। আর তার পর ঐ বায়ু যখন পর্ব্বত পার হইয়া দাক্ষিণাত্যে আসে তখন আর তাহাতে বৃষ্টি হয় না। এইরূপ ভারতমহাসাগরের সমস্ত মেঘই উত্তর দিকে আসিতে থাকে শেষে গিয়া—? (সকলে, "হিমালয় পর্ব্বতে ঠেকিয়া যায়।") ঠিক! আর সেই সব বৃষ্টি হইয়া পড়ে, ঐ বৃষ্টির জলে আর্য্যবর্ত্তের এত নদ নদীর উৎপত্তি হয়। কিন্তু আবার ওদিকে ঐ বায়ু যখন হিমালয় পার হইয়া তিব্বত দেশে উপস্থিত হয় তখন আর তাহাতে বৃষ্টি হয় না, এই জন্য ঐ দেশের অবস্থা এত হীন; ওখানে প্রায় সবই মরুভূমির মত।"

কিশোরীঃ—"তবেত হিমালয় পর্ব্বত থাকাতে আমাদের দেশের খুব উপকার হইয়াছে। না হইলে ত এত নদী, এত বৃষ্টি কিছুই হইত না, আর আমাদের দেশ মরুভূমির মত হইয়া যাইত। ধান চাল কিছুই জন্মিত না?"

নবীন বাবুঃ—"ঠিকই বুঝিয়াছ। এই জন্যই আমাদের দেশ এত উর্ব্বরা। আমাদের দেশের পক্ষে হিমালয় আরও কত যে উপকারী তাহা এর পর আরও জানিতে পারিবে। এখন বৃষ্টির কথা আবার বলি। যদি এইটী একমাত্র কারণ হইত তাহা হইলে যেদেশে পর্ব্বত নাই সেখানে বৃষ্টি হইত না।"

মাখনঃ—"হাঁ দাদা বাবু! আমি ঐ কথাটাই জিজ্ঞাসা করিব মনে করিতেছিলাম। আমাদের দেশেতে পর্ব্বত নাই তবে এখানে এত বৃষ্টি হয় কেন?"

নবীনবাবুঃ—"মন দিয়া শুন। যেটী বলিলাম সেটী একটী কারণ, বৃষ্টি হইবার আরও কারণ আছে, মনে কর দুদিক হইতে দুটী বায়ুর স্রোত আসিয়া মধ্যে এক স্থানে ঠেকা ঠেকী হইল। তখনই অমনি যেমন কলের গাড়ীর "কলিসন"

হলে হয়, দুটাতে খুব ধাক্কা লাগিল। কিন্তু বাতাস ত আর গাড়ীর মত ভারী নয় যে মাটীতে ভেঙ্গে পড়ে যাবে। উহা হাল্কা, কাজেই দুটা বাতাস উপর দিকে উঠিতে থাকে। কাজেই উপরে উপরে উঠিয়া শীতল হয় আর ঝুপ্ ঝাপ্ করিয়া বৃষ্টিও হইয়া পড়ে। আরও নানা প্রকার কারণে বৃষ্টি হয়। অর্থাৎ যে কোন কারণে মেঘ আরও শীতল হয় অমনি এক পশলা বৃষ্টি হইবেই হইবে।"

অমূল্যঃ—"আচ্ছা কোন্ কোন্ স্থানে সকলের চেয়ে বেশী বৃষ্টি হয়?"

নবীন বাবুঃ—"প্রায়ই যে যে স্থান সমুদ্রের ধারে, বা যেখানে বায়ুর পথের মধ্যে পর্ব্বত আছে, সেই সেই স্থানেই অধিক পরিমাণে বৃষ্টি হয়। আর সাধারণতঃ গ্রীষ্ম প্রধান দেশেই (tropical countries) অধিক পরিমাণে বৃষ্টি হয়। আমাদের দেশের একটা স্থান আছে, বাঙ্গালার উত্তর আসামের পূর্ব্বদিকে খসিয়া পাহাড়ে চেরাপুঞ্জী নামক স্থানে যত অধিক বৃষ্টি হয় পৃথিবীর অন্য কোন স্থানেই এত বৃষ্টি হয় না।"

মন্মথঃ—"আর এমন দেশ আছে, সেখানে একটুও বৃষ্টি হয় না?"

নবীন বাবুঃ—"আছে বৈকি? আফ্রিকা মহাদেশের মধ্য ভাগে এবং মিশর দেশের অধিকাংশ স্থলেই বৃষ্টি হয় না। আরব ও পারস্য দেশের অনেক অংশেও বৃষ্টি হইতে দেখা যায় না। আসিয়ার বিস্তীর্ণ গোবী মরুভূমি ও হিমালয়ের উত্তর পূর্ব্ব ভাগস্থ প্রদেশ, এবং তদ্ভিন্ন আমেরিকার কোন কোন অংশে বৃষ্টি হয় না। এই সমস্ত স্থানই জলহীন ভীষণ মরুভূমি হইয়া আছে।"

চারুঃ—"দাদা মশাই! মেঘও আমাদের খুব উপকার করে বলতে হবে?"

নবীন বাবুঃ—"সে কথা আর একবার? মেঘ হইতে জল পড়িয়া পৃথিবী শীতল হয়। গ্রীষ্মকালে এক এক দিন কেমন ভয়ানক গুমট হয় দেখিয়াছ ত? প্রাণ যায়। ত্রাহি ত্রাহি করিতে হয়, তখন এক পশলা বৃষ্টি হইলে তবে জীব জন্তুর প্রাণ বাঁচে। কেমন? আরও বৃষ্টি দ্বারাই ভূমি উর্ব্বরা হয়। ধান্য, গোধূম, যব, ছোলা প্রভৃতি শত শত প্রকার শস্য ও ফল মূল, বৃক্ষ লতা যাহা কিছু মানুষ ও অন্য জীব জন্তুর প্রাণ ধারণের জন্য পৃথিবীতে জন্মিতেছে তাহার কিছুই হইত না। সকলেই অনাহারে মারা যাইত। জলই আমাদের জীবনের একটী সর্ব্ব প্রধান দরকারী জিনিষ। তৃষ্ণার সময়ে জল না পেলে কেমন হয়? সে বৎসর তোমাদের খিড়কীর পুকুরের জল শুকাইয়া গিয়াছিল। মনে আছে ত কেমন হা হা রব পড়ে গিয়াছিল? আর এই বৎসর বর্দ্ধমান, বীরভূম প্রভৃতি জেলায় ভাল জল হয় নাই, তাই একেবারে সব মাঠ জ্বলিয়া গিয়া দুর্ভিক্ষ হইয়াছে জানত? আহা! কত যে লোক না খেতে পেয়ে মরে গেল তা আর কি বলিব? আর কত লোকের যে কি ভয়ানক ক্লেশ হল তাত সবই তোমাদের সেদিন কাগজ পড়িয়া শুনাইয়াছি। জল না হইলে পৃথিবী একদিন চলে না। জলকে সেই জন্য আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা "জীবন" নাম দিয়াছেন। আর সেই জন্যই মেঘের মধ্যে ইন্দ্র আছেন। তিনিই আমাদের জল দেন ইহা মনে করিয়া তাঁহারা ইন্দ্রকে দেবরাজ অর্থাৎ দেবতাদের মধ্যে প্রধানরূপে গণ্য করিয়া পূজা করিতেন। তোমরাও আজ যে সকল কথা শুনিলে তাহাতে বেশ বুঝিয়াছ যে, করুণাময় পরমেশ্বর আমাদের মঙ্গলের জন্য মেঘ হইতে বৃষ্টি প্রদান করেন। তবে এস এই গঙ্গা-

তীরে বসিয়া সেই দয়াময় দেবতাদের শ্রেষ্ঠ ঈশ্বরকে ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়া বাড়ী যাই।"

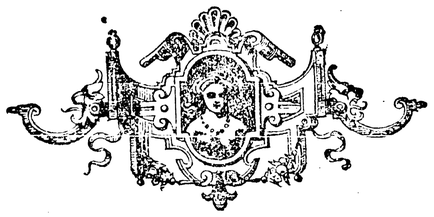

পরেশনাথ মন্দির।

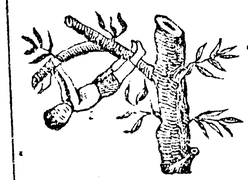

পরেশনাথ পাহাড় জৈন নামক লোকদিগের একটা বড় তীর্থ স্থান। এইখানে অগ্রহায়ণ হইতে ফাল্গুন মাস পর্য্যন্ত অনেক জৈন যাত্রীর ভিড় হয়। জৈনেরা পরেশনাথকে পরম দেবতা মনে করে, এবং জীবহত্যা অর্থাৎ কোন প্রাণীকে মারা বা ক্লেশ দেওয়াকে অত্যন্ত অন্যায় ভাবিয়া থাকে। পরেশনাথ পাহাড় গিরিধি হইতে নয় ক্রোশ দক্ষিণে। ইহার মধ্যে এক স্থানে 'বরাকর' নামক একটী নদী আছে। রাস্তার দুদিকে ছোট ছোট পাহাড় দেখিতে দেখিতে আমরা বিনা ক্লেশে বরাকর পর্য্যন্ত আসিলাম। সেখানে আহারাদি করা গেল। এইখানে "রাজবালা ধর্ম্মশালা" নামে জৈনদের একটী মন্দির আছে। আমরা এই ধর্ম্মশালা দেখিয়া নদী পার হইলাম, এ সময়ে বরাকর নদীতে এক হাটু বা কিছু অধিক মাত্র জল থাকে; সুতরাং আমরা সহজেই নদী পার হইয়া গেলাম।

রাস্তায় ভয়ানক রদ্দুরে ছাতা মাথায় দিয়াও কিছু ক্লেশ পাইতে হইল; যাহা হউক বিকাল-বেলা পাহাড়ের নীচে পৌঁছিলাম।

পাহাড়ের নীচের স্থানের নাম মধুবন। শুনিয়াছি ধ্রুব মধুবনে তপস্যা করিয়াছিলেন। এই সেই মধুবন কিনা, তাহা জানিতে পারিলাম না। আমাদিগের কোন বন্ধু আমাদের জন্য মধুবনের এক জৈন মন্দিরের বা কুঠির অধ্যক্ষকে আগেই এক পত্র লিখিয়া রাখিয়াছিলেন, সুতরাং আমাদিগকে গিয়া বিশেষ কষ্ট পাইতে হইল না। মধুবনে অনেকগুলি জৈন মন্দির। কুঠির অধ্যক্ষ মহাশয় আমাদিগকে সকল গুলিই যত্নের সহিত দেখাইলেন। আমরা তাঁহাদের ধর্ম্মের নিয়ম মান্য করিয়া দরজায় যুতা, ছাতা, লাঠি প্রভৃতি রাখিয়া গেলাম। এই মন্দিরগুলি নির্ম্মাণ করিতে যে কত শত টাকা খরচ হইয়াছে, তাহার সীমা কি? অনেক মন্দিরই আগাগোড়া পাথরের তৈয়ারী। সকলগুলির মধ্যেই মেজে মার্ব্বেল পাথরে মোড়া এবং মূর্ত্তিগুলি নানারূপ সুন্দর অলঙ্কারে সাজান ও চমৎকার আসনে জরির কাজ করা শামিয়ানার নীচে বসান। পরেশনাথ প্রধান দেবতা; ইহা ছাড়া আরও তেইশ জন অবতার আছেন, এই কথা কুঠির অধ্যক্ষের মুখে শুনিলাম। প্রত্যেক মন্দিরের দরজায় একজন বা দুজন করিয়া দ্বারবানদেবতা আছেন। তাঁহাদের আকার নাই, পাথরের এক একটা লম্বা খণ্ড, তাতেই সিন্দূর-মাখান।

পরেশনাথ পাহাড় প্রায় তিন হাজার হাত উচ্চ। রোগা লোকের সাধ্য কি, হাটিয়া উঠে। আমরা ডুলিতে গিয়াছিলাম। সকল যায়গায় রাস্তা নাই। উপরে সাহেবদের জন্য একটা ঘর আছে, সেই পর্য্যন্ত ভাল রাস্তা, তাহার ওদিকে আর রাস্তা নাই; কেবল পাথরের উপর দিয়া একটু একটু পরিষ্কার করা। পাহাড় বলিলে কি তোমাদের কেবল পাথরের ঢিবি মনে হয়? তাহা

নহে, পাহাড়ের উপরে যে কত রকম গাছ জন্মিয়াছে, তাহার সীমা কি? আমি এই সকল গাছের মধ্যে বাঁশগাছ, কলাগাছ এবং হলুদগাছ, ইহাই চিনিতে পারিলাম। ইহা ছাড়া ছোট ছোট অগছা হইতে শাল সুন্দরীর মত বড় বড় গাছ যে কত আছে, তাহা গণিয়া উঠা যায় না।

একবার একটী ইংরাজ স্ত্রীলোক বলিয়াছিলেন "এদেশের পাখীগুলি কেবল দেখিতেই সুন্দর, কিন্তু গান করিতে পারে না, খালি ক্যাচ্-ম্যাচ্ করে।" যদি তিনি এই পাহাড়ে আসিতেন, তাহা হইলে তাঁহার এ বিশ্বাস চলিয়া যাইত। আমার পথ চলিতে চলিতে বোধ হইল যেন স্বর্গে যাইতেছি। একদিকে ঝর্ ঝর্ করিয়া ঝরণার জল পড়িতেছে, একদিকে শোঁ শোঁ করিয়া গাছের মধ্যে বাঁশি বাজাইতে বাজাইতে শীতল বাতাস বহিয়া চলিয়াছে, একদিকে পাখীগুলি টুউ, টুইট্, টুউ টুইট্ শব্দে কি সুমধুর গানই ধরিয়াছে, এদিকে রাস্তার দুপাশে দুর্গাঝাঁপ বা ফার্ণ জাতীয় গাছ সকল যেন সুন্দর সবুজ মক্-মলের মত আপনাদের সুশ্রীরূপ পথের লোককে দেখাইতেছে—এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া আমার ইচ্ছা হইল একবার সেইখানে লাফাইয়া পড়ি এবং এই সুন্দর সৃষ্টি যাঁর সেই পরম পিতা পরমেশ্বরের নামে চিরদিনের মত ডুবিয়া যাই।

কিন্তু কি আশ্চর্য্য! যে শোভা দেখিয়া আমার মন গলিয়া গেল, সেই শোভা দেখিয়াও কোন লোকের মনে খারাপ ভাব থাকে! পথের মাঝখানে যাত্রীদের বিশ্রামের জন্য একটা ছোট ঘর আছে। তাহার কাছে গোঁ গোঁ শোঁ শোঁ শব্দে জল পড়িতেছে, পাখীগুলি যেন তাহারাই শব্দে তাল রাখিয়া গান করিতেছে, আর চারিদিকে গাছের শীতল ছায়া যেন পরিশ্রান্ত যাত্রীকে কোলে টানিয়া লইতেছে। এই শোভা, এই বাহারের মধ্যে যাহার ভগবানকে মনে পড়ে না, সে কি দুর্ভাগা! আমি দেখিয়া লজ্জায় মরিয়া গেলাম, আমাদেরই কতকগুলি ছেলে (হাঁতের লেখায় বুঝিলাম বয়স বেশী নয়) এই বিশ্রামঘরের দেয়ালে বিশ্রী ছবি এবং বাঙ্গালাতে বিশ্রী কথা সকল লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছে। হতভাগা ছেলেদের ইহাতেও সাধ মেটে নাই, আবার তাহার সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের নাম ও বাড়ীর ঠিকানা পর্য্যন্ত লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন! দিগ্‌গজ পণ্ডিতদের কাহারও বাড়ী ছুতোর পাড়া কাহারও বাড়ী কালেজ ষ্ট্রীট, কাহারও উহারই নিকটে। আমি বাঙ্গালী—বাঙ্গালীর ছেলে বিদেশে আসিয়া এমন কাণ্ড করিয়া গিয়াছে দেখিয়া আমার লজ্জা ও ঘৃণা দুই হইতে লাগিল। তখন নিজের লজ্জা নিজেই ঢাকিবার জন্য সেই সকল খারাপ ছবি ও লেখা মুছিয়া ফেলিতে লাগিলাম। সকলই মুছিয়া ফেলিলাম কেবল খুব উপরে একটা লেখা হাতে পাইলাম না। দুরাত্মাদের খারাপ স্বভাবের একটা চিহ্ন সেই পবিত্র স্থানে থাকিয়া গেল।

একটা পাহাড় ডিঙ্গাইয়া বড় পাহাড়টাতে উঠিতে হয়। বড় পাহাড়ের রাস্তা যে কি ভয়ানক, তাহা বলিতে পারিনা। কোন কোন স্থানে পাহাড়ের এক ধার দিয়া রাস্তা গিয়াছে, সেখান হইতে মাটী পর্য্যন্ত এক-ঢালু, তাকাইলে মাথা ঘোরে; কোন স্থানে দুপাশে বড় বড় ঘাস ও ভাঁটুইবন, তাহার মধ্য দিয়া সাপের ভয় অগ্রাহ্য করিয়া চলিতে হয়; আবার কোথাও বা উপরে উঠিতে ডুলির তলায় ক্রমাগত পাথর ঠেকিতে থাকে, ঘা খাইয়া শরীরে বেদনা হইয়া প্রাণ যায়। এই ভাবে, কতক আহ্লাদে কতক ভয়ে আমরা উপরে উঠিলাম। আঃ—সেখানকার কি শোভা!

এক এক ঝল্‌কা বাতাস গায়ে লাগে আর বোধ হয় যেন শরীর পাতলা হইয়া গেল। উপরে চাহিয়া দেখিলাম, আকাশ নীল—গাঢ় নীল। নীচে ওরূপ নীলাকাশ প্রায়ই দেখা যায় না। চারিদিকে তাকাইয়া দেখিলাম কুয়াসার ন্যায় বাতাসে মেঘ গুলি ভাসিয়া বেড়াইতেছে, আমরা মেঘের সীমা ছাড়িয়া উপরে উঠিয়া ফেলিয়াছি! বাতাসে বেশ একটু শীত লাগে, কিন্তু তাহাতে বড়ই আরাম হইতে লাগিল। চারিদিকে তাকাইয়া দেখিলাম ছোট পাহাড়টাকে একটা বনের মত, বড় বড় গাছগুলিকে ঘাসের মত এবং অন্যান্য স্থানগুলিকে রং করা ছবির মত দেখাইতেছে।

উপরে অনেকগুলি মন্দির আছে, কিন্তু সে গুলি মধুবনের মন্দিরের ন্যায় বড় বা সুন্দর নহে। সর্ব্বাপেক্ষা বড় যে মন্দিরটা, আমরা তাহারই নিকটে স্নানাহার করিলাম। সঙ্গে তেল ছিল না, কি করি, খানিকটা ঘি মাখিয়া ঝরণার জলে স্নান করিলাম। সে যে কি আরাম, তাহা আর কি বলিব। পূর্ব্বকালের মুনিঋষিদের কথা মনে হইতে লাগিল। সাধে কি তাঁহারা পাহাড় পর্ব্বতে গিয়া তপস্যা করিতেন! একজন ইংরাজ বলিয়াছেন "প্রকৃতি অর্থাৎ স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য হইতে প্রকৃতির ঈশ্বর যিনি তাঁহাকে সহজেই পাওয়া যায়।" আমার একজন বন্ধু বলিয়াছিলেন, "আঃ—এই রকম যায়গায় দুচারজন মনের মত লোক লইয়া থাকিতে পারিলে বড়ই সুখ হয়।" আমি বলি—"যেখানে গেলে চারিদিকের শোভা দেখিয়া ঈশ্বরকে যেন সাক্ষাৎ দেখা যায়, সেখানে আর কোন মনের মত লোকের আবশ্যক কি? সহরের সভ্যতার 'সরগরমে' ঝল্‌সিয়া মরার অপেক্ষা এমন সুন্দর স্থানে, ভগবানের সৃষ্টির বাহারে আপনাকে ঘেরিয়া, তাঁহার নাম করিয়া অসভ্যের মত একলা দিনশেষ করাও ভাল।"

ইহার পর আরও কোন কোন স্থান দেখিয়া আমরা নামিয়া আসিলাম।

—ভ্রমণকারীর পত্র।

আই-আই।

তদূর জানা গিয়াছে, তাহাতে বোধ হয় আমাদের দেশে এই প্রাণী পাওয়া যায় না। আফ্রিকার দক্ষিণ পূর্ব্ব দিকে মাডাগাস্কার নামে যে দ্বীপ আছে, সেই দ্বীপের পশ্চিম দিকের গাঢ় জঙ্গলে আই-আই বাস করিয়া থাকে। যেমন 'বউ কথা ক,' 'চোখ্ গেল' প্রভৃতির নাম তাহাদের প্রত্যেকের ডাক হইতে হইয়াছে, সেইরূপ 'আই' 'আই' করিয়া ডাকে বলিয়া এই প্রাণীর 'আই-আই' এই নাম হইয়াছে।

আমরা সহজ চক্ষে ছবির দিকে তাকাইয়া দেখিতে পাইতেছি যে এই প্রাণী কতকটা কাঠবিড়ালীর মত এবং কতকটা বাঁদরের মত। কিন্তু পণ্ডিতেরা আই-আইকে কোন্ জাতীয় প্রাণী বলিবেন, তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে

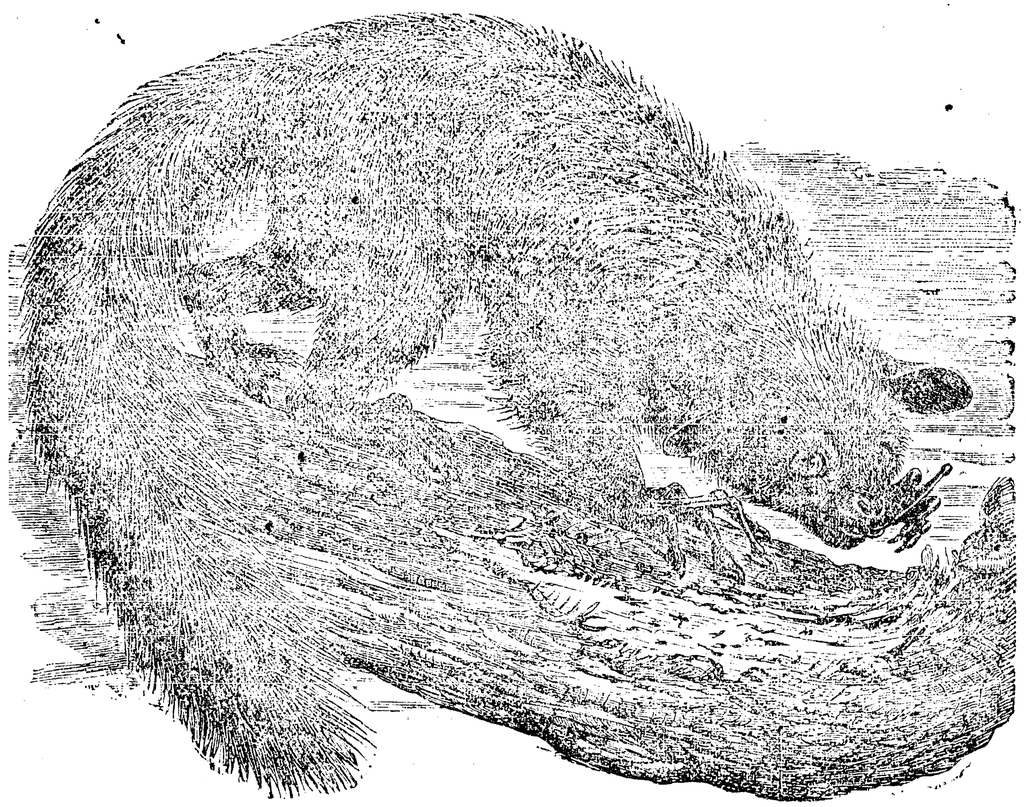

পারেন নাই। যাহা হউক, এই প্রাণী পৃথিবীতে যেরূপ অল্প, এক মাডাগাস্কার দ্বীপের এক কোণে কোথায় পড়িয়া আছে, তাহা সেই দেশীয় লোকেরাই খুঁজিয়া পায় না, বিদেশীয়দের তো কথাই নাই, এরূপ অবস্থায় আমরা যে এই প্রাণীর সম্বন্ধে অতি অল্পও জানিতে পারিয়াছি, ইহা আমাদের সুখের বিষয় বলিতে হইবে।

আই-আই দিনের বেলায় ভালরূপ দেখিতে পায় না, ইহার চক্ষু অনেকটা পেঁচার মত। এই জন্য সমস্ত দিন ভয়ে ভয়ে গর্ত্তের মধ্যে পড়িয়া থাকিয়া এবং যতক্ষণ সম্ভব ঘুমে কাটাইয়া সন্ধ্যাকালে আহারের চেষ্টায় বাহির হয়। ফুলের কুড়ি, ফল এবং নানারূপ পোকা ও তাহাদের ডিম আই-আইএর খাদ্য। গাছের কোটরে, শুষ্ক পাতার মধ্যে, বা গাছের ছালের নীচেতে অনেক পোকা বাস করে; আই-আই আপনার শক্ত হাতের দ্বারা যতগুলি পারে ধরিয়া লয়। এইরূপে সমস্ত রাত্রি আহার খুঁজিয়া এবং আমোদ আহ্লাদ করিয়া ভোরবেলা আই-আই আবার আপনার গর্ত্তে ঢুকিয়া যায়।

আই-আই দেখিতে কটা এবং কটাশে সাদা; পা গুলো কাল। মাথা হইতে লেজের গোড়া পর্য্যন্ত প্রায় এক হাত লম্বা, লেজটা প্রায়ই শরীরের সমান অর্থাৎ আর এক হাত।

সন্নাত নামক একজন ফরাশী পণ্ডিত সকলের আগে আই-আই দেখিতে পান; তাঁহারই চেষ্টাতে আমরা এই প্রাণীর কথা জানিতে পারিয়াছি। তিনি যে দুটী আই-আই ধরিয়া লইয়া যান,

তাহাই সকলের আগে সভ্য দেশে যায়। প্রাণী দুটী অধিক দিন বাঁচিয়া থাকে নাই। আজ কাল তাহাদের শরীর (ভিতরে খড় পোরা) জীবন্তের ন্যায় পারিশ নগরের যাদুঘরে দেখিতে পাওয়া যায়।

আখ্যান-মালা।

(১)

বাবা হাত ধরে নিয়ে গেলে ভয় কি ?

কোন বাবু কোন পাড়া গেঁয়ে স্কুলে শিক্ষক ছিলেন। তাঁহার ছয় বছরের একটী ছোট মেয়ে, সে রোজই স্কুলের ছুটীর সময় হইলে, বাবাকে আনিতে যাইত। এক দিন সে যাইবার সময় দেখিল, একটী অন্ধ ছেলেকে তাহার মা হাত ধরিয়া লইয়া যাইতেছেন, ছেলেটীও, মা যেখানে যেমন যাইতে বলিতেছেন, সেই রকমে পা ফেলিয়া অনায়াসে যাইতেছে। বালিকা ইহা দেখিয়া বাবাকে আনিতে স্কুলে গেল। যখন বাবার সহিত বাটীতে ফিরিয়া আসে, তখন মেয়েটীর ইচ্ছা হইল একবার অন্ধ সাজিয়া দেখে, কেমন হয়; তাই বলিল—"বাবা, আমি চোখ্ বুজে থাকি, আর তুমি আমার হাত ধ'রে নিয়ে চল—কেমন ?—আর কোথায় উচু নীচু আছে, আমায় বলে দিও ? তা'হলে আমি ঠিক যাব এখন।"—এই বলিয়া বালিকা চক্ষু বুজিয়া বাবার হাত ধরিয়া চলিল। অতি সহজেই দুজনে বাড়ীতে গিয়া পৌছিলেন। তখন বালিকা চক্ষু খুলিয়া মাকে সুমুখে দেখিয়া, হাসিয়া বলিল—"আমি পথে একবারও চোখ খুলি নাই।"—মা জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার কি পড়ে যাবার ভয় হয় নি ?" বালিকা উত্তর করিল "বাবার হাত ধরে চল্‌লে পড়ে যাবার ভয় কি ?"

ঠিক কথা। পরমেশ্বরের উপরে যাদের মন, তারা কি কখনও বিপদে পড়ে ? আমরা সকলেই ছোট, নিজের বুদ্ধিতে চলিতে গেলেই গোলে পড়ি, কিন্তু পিতা হাতে ধরে নিয়ে গেলে ভয় কি ?

---

(২)

নাম্‌তে নাম্‌তে সাম্‌লাতে পারিনি।

এক পাহাড়ে দেশে একজন ভদ্রলোক তাঁহার ছেলেকে লইয়া পাহাড়ের উপর হইতে নীচে নামিয়া আসিতেছিলেন। পিতা যখন প্রায় অর্দ্ধেক পথ নামিয়া আসিয়াছেন, তখন দেখিলেন ছেলে তখনও উপরে দাঁড়াইয়া কেমন করিয়া সূর্য্য অস্ত যাইতেছে, তাহাই দেখিতেছে। তিনি ডাকিয়া বলিলেন—"কেদার, সন্ধ্যা হয়ে এল—এখনও উপরে ? শীগ্‌গির নেবে এসো।"—বালক বাবার কথা শুনিয়া নীচের দিকে ছুটিল, কিন্তু

পিতার নিকটে পৌছিয়া সে আর থামে না, ক্রমাগত নীচে ছুটিতে লাগিল। পিতা দেখিয়া বলিলেন—"কর কি ? থাম! থাম!" বালক ছুটিতে ছুটিতে বলিল—"আঃ, আর পারি না যে!"—এই বলিয়া একেবারে নীচে আসিয়া একটা গাছ ধরিয়া দাঁড়াইল। পিতা নীচে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"আমার সঙ্গে সঙ্গে এলে না যে।" বালক বলিল "নাম্‌তে নাম্‌তে সাম্‌লাতে পার্‌লাম না, তা কি ক'র্‌ব!"—

ওঠা বড় শক্ত, নামা বড় সহজ;—ভাল হওয়া বড় শক্ত, মন্দ হওয়া বড় সহজ; আবার কেদার যেমন নামিতে নামিতে আর পথে 'সাম্‌লাইতে' পারিল না, অনেক বালক তেমনি মন্দ হইতে হইতে আর সাম্‌লাইতে পারে না, অতএব সাবধান! যে দিকে যাইতেছ, সাম্‌লাইয়া চলিও।

---

(৩)

কোন্‌টা বেশী মন্দ ?

বিনোদ যে স্কুলে পড়ে, সেখানকার মাষ্টার মহাশয় প্রায়ই ভাল ভাল উপদেশ দেন। এক দিন এইরূপ একটী উপদেশ শুনিয়া বিনোদ ভাবিতে ভাবিতে বাড়ী আসিল। সে দিন বিনোদ একটা মিথ্যা কথা বলিয়াছিল, এবং তাহার ক্লাশের আর একটী ছেলে এক খানা ছুরি চুরি করিয়াছিল;—দুজনেরই শাস্তি হইল, কিন্তু বিনোদের কম এবং সেই চোর ছেলেটীর বেশী। শাস্তি দিবার পর শিক্ষক মহাশয় সকলকে মিথ্যা কথা ও চুরি করার বিষয় লইয়া উপদেশ দিলেন—তাহাতে বিনোদ বুঝিল মিথ্যা কথা অপেক্ষা চুরি করা মন্দ। বিনোদ নিজের দোষগুলি খুব বেশী করিয়া দেখে, এই জন্য তাহাকে সকলই ভাল বাসে; আজও হঠাৎ মিথ্যা কথা বলিয়া তাহার মনে ভয়ানক কষ্ট হইয়াছে। সে উপদেশ শুনিয়া শিক্ষককে কিছু না বলিয়া বাড়ীতে আসিল, এবং মাকে বলিল—"হ্যা মা! মিথ্যা কথা আর চুরি, এই দুয়ের মধ্যে কোন্‌টা বেশী মন্দ ?"—মা বলিলেন "দুটোই এত খারাপ, যে কোন্‌টা বেশী, তা বলা যায় না।"—বালক বলিল—"আমার কাছে মিথ্যা কথাটাই বেশী মন্দ লাগে; কেননা, কোন জিনিষ চুরি করিলে, তাহা ফিরাইয়া দেওয়া যায়, কি তার দাম দেওয়া যায়, কিন্তু মিথ্যা কথা একবার বলিলে আরতো ফিরে না।"—বালক বালিকা! তোমরা কি বল ? মিথ্যা কথাটাই যত পাপের গোড়া, না ?

ভূতের গল্প।

আমি ভূতের গল্প বড় ভাল বাসি। তোমরা পাঁচ জনে মিলিয়া ভূতের গল্প কর, সেখানে পাঁচ ঘণ্টা বসিয়া থাকিতে পারি। ইহাতে যে কি মজা; একটা শুনিলে আর একটা শুনিতে ইচ্ছা করে, দুটা শুনিলে একটা কথা কহিতে ইচ্ছা করে। গল্প শেষ হইয়া গেলে একাকী ঘরের

বাহিরে যাইতে ইচ্ছা হয় না। তোমাদের মধ্যে আমার মতন কেহ আছ কি না জানি না, বোধ হয় আছ। তাই আমি আজ তোমাদের কাছে একটা গল্প বলিব। গল্পটা একখানি ইংরাজি কাগজে পড়িয়াছি। তোমাদের সুবিধার জন্য ইংরাজি নামগুলি বদল করিয়া দিতে ইচ্ছা ছিল, কিন্তু গল্পটি পড়িলেই বুঝিতে পারিবে যে শুধু নাম বদ্‌লাইলে কাজ চলিবে না। সুতরাং ঠিক যেরূপ পড়িয়াছি প্রায় সেই রূপ অনুবাদ করিয়া দেওয়াই ভাল বোধ হইতেছে।

"স্কট্‌লণ্ডের ম্যাপ্‌টার দিকে একবার চাহিয়া দেখিলে বাঁ ধারে ছোট ছোট দুটি দ্বীপ দেখিতে পাইবে। তাহার উপরেরটির নাম নর্থ উইষ্ট্, নীচেরটির নাম সাউথ্ উইষ্ট্। এর মাঝামাঝি ছোট ছোট আর কতকগুলি দ্বীপ দেখা যায়। এ সে কালের কথা, তখন ষ্টীম্ এঞ্জিনও ছিল না টেলিগ্রাফ্‌ও ছিল না; আমার ঠাকুরদাদা তখন এর একটি দ্বীপে স্কুলে মাষ্টারি করিতেন।

"সেখানে লোক বড় বেশী ছিল না। তাদের কাজের মধ্যে কেবল মাত্র মেষ চরান, আর কষ্টে সৃষ্টে কোন মতে দিন চলার মত কিছু শস্য উৎপাদন করা। সেখানকার মাটি বড় খারাপ; তারি একটু একটু সকলে ভাগ করিয়া নেয় আর জমিদারকে খাজনা দেয়। * * * এরা বেশ সাহসী লোক ছিল। আর ঐ রকম কষ্টে থাকিয়া এবং সামান্য খাইয়াও বেশ এক প্রকার সুখ সচ্ছন্দে কাল কাটাইত। * * * *

"এই দ্বীপে এল্যান্ ক্যামিরণ্ নামে একজন লোক ছিলেন, তাঁর বাড়ী গাঁ থেকে প্রায় এক মাইল দূরে। এল্যানের সঙ্গে মাষ্টার মহাশয়ের বড় ভাব, তাঁর কাছে তিনি কত রকমের মজার গল্প বলিতেন। হঠাৎ এক দিন ক্যামিরণ্ বড় পীড়িত হইলেন, আর কিছুদিন পরে তাঁহার মৃত্যু হইল। তাঁর কেউ আপনার লোক ছিল না, সুতরাং তাঁর বিষয় সমস্ত বিক্রী হইয়া গেল। তাঁর বাড়ীটা কেহই কিনিতে চাহিল না বলিয়া তাহা অমনি খালি পড়িয়া রহিল।

"এর কয়েক মাস পরে এক দিন জ্যোৎস্না রাত্রিতে ডনাল্ড্ ম্যাকলীন বলিয়া একটি রাখাল ঐ বাড়ীর পাশ দিয়া যাইতেছিল। হঠাৎ জানালার দিকে তার দৃষ্টি পড়িল, আর সে ঘরের ভিতরে এল্যান্ ক্যামিরণের ছায়া দেখিতে পাইল। দেখিয়াই ত তার চক্ষু স্থির! সেখানেই সে হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল; তার চুলগুলি খ্যাংরা কাঠির মত সোজা হইয়া উঠিল, ভয়ে প্রাণ উড়িয়া গেল, গলা শুকাইয়া গেল। * * *

"শীঘ্রই তাহার চৈতন্য হইল। ঐ রকম ভয়ানক পদার্থের সঙ্গে কাহারই বা জানা শুনা করিবার ইচ্ছা থাকে? সে ত মার দৌড়! একেবারে মাষ্টার মহাশয়ের বাড়ীতে! তাঁর কাছে সব কথা সে বলিল। মাষ্টার মহাশয় এ সব মানেন না; তিনি তাহাকে প্রথম ঠাট্টা করিলেন, তার পর বলিলেন তার মাথায় কিঞ্চিৎ গোল ঘটিয়াছে; আরও অনেক কথা বলিলেন—বলিয়া যথাসাধ্য বুঝাইয়া দিতে চেষ্টা করিলেন যে ঐরূপ কিছুতে বিশ্বাস থাকা নিতান্ত বোকার কার্য্য।

"ডনাল্ড্ কিন্তু ইহাতে বুঝিল না, সে অপেক্ষাকৃত সহজ বুদ্ধি বিশিষ্ট অন্যান্য লোকের কাছে তাহার গল্পটা বলিল। শীঘ্রই ঐ দ্বীপের সকলেই এই গল্প জানিতে পারিল। ঐ সব বিষয় মীমাংসা করিতে বৃদ্ধারাই মজবুদ; তাঁহারা ভবিষ্যতের সম্বন্ধে ইহাতে কত কুলক্ষণই দেখিতে পাইলেন।

"ঐ দ্বীপের মধ্যে কেবলমাত্র মাষ্টার মহাশয়ের কাছেই খবরের কাগজ আসিত। মাসের মধ্যে একবার করিয়া কাগজ আসিত আর সেদিন সকলে মাষ্টার মহাশয়ের বাড়ীতে গিয়া নূতন খবর শুনিয়া আসিত। সেদিন তাদের পক্ষে একটা খুব আনন্দের দিন। রান্নাঘরে বড় আগুন করিয়া দশ বার জন তাহার চারিদিকে সন্ধ্যার সময় বসিয়া কাগজের বিজ্ঞাপন হইতে আরম্ভ করিয়া অমুক কর্ত্তৃক অমুক যন্ত্রে মুদ্রিত হইল ইত্যাদি পর্য্যন্ত সমস্ত বিষয়ের তদারক ও তর্কবিতর্ক করিত। শেষের কথাগুলি সকলেরই একপ্রকার মুখস্থ হইয়াছিল, এবং পড়া শেষ হইলে ঐ কথাটা প্রায়ই সকলে একসঙ্গে একবার বলিত।

"এই সকল সভায় রাখাল, কৃষক, গির্জার ছোট পাদরী প্রভৃতি অনেকেই আসিতেন। গ্রামের মুচি ররীও আসিত। ররী ভয়ানক নাছোড় বন্দা লোক; একটা কথা উঠিলে তাহাকে একবার আচ্ছা করিয়া না ঘাঁটিয়া সহজে ছাড়িবে না।

"ডনাল্ড্ ম্যাকলীনের ঐ ঘটনার কয়েক সপ্তাহ পরে একদিন সকলে এইরূপ সভা করিয়া বসিয়াছে, মাষ্টার মহাশয় চেঁচিয়া তর্জমা করিতেছেন, এমন সময় একজন আসিয়া বলিল যে এল্যান ক্যামিরণের ছায়া আবার দেখা গিয়াছে। এবারে একজন স্ত্রীলোকে দেখিয়াছে। ঐ রাখাল যেস্থানে যেভাবে উহাকে দেখিয়াছিল এও ঠিক সেই রকম দেখিয়াছে।

"এর পর আর পড়া চলে কি করিয়া! মাষ্টার মহাশয় চটিয়া গেলেন এবং ঠাট্টা করিতে লাগিলেন। ররী তৎক্ষণাৎ তাঁহার প্রতিবাদ করিল। ররী কোন কথাই ঠিক মানে না; এবারেও মাষ্টার মহাশয়ের কথাগুলি মানিতে পারিল না। প্রচণ্ড তর্ক উপস্থিত। ভূতের কথা লইয়া সাধারণভাবে এবং ক্যামিরণের ভূতের বিষয় বিশেষভাবে বিচার চলিতে লাগিল; আর সকলে বেশ মজা পাইতে লাগিলেন। কিন্তু ররীর মেজাজ গরম হইয়া উঠিল; সে বলিল;—

'দেখ মাষ্টারের পো, যতই কেন বল না, আমি এক যোড়া নতুন বুট হার্‌বো, তোমার সাধ্যি নেই আজ দুপুর রেতে ওখান থেকে গিয়ে দেখে এস।'

"সকলে করতালি দিয়া উঠিল। মাষ্টার মহাশয় হাসিয়া উড়াইয়া দিতে চাহিলেন, কিন্তু ররী ছাড়িবে কেন? সে সকলের উপর বিচারের ভার দিল। তাহারা এই মত দিল যে মাষ্টার মহাশয় যখন গল্পগুলি মানিতেছেন না, সে স্থলে তাঁর উচিত যে নিদেন পক্ষে তিনি যে এ মানেন না তা প্রমাণ করিয়া দেন।

"মাষ্টার মহাশয় দেখিলেন অস্বীকার করিলে যশের হানি হয়। তিনি বলিলেন 'যাব বই কি? কিন্তু আমি গিয়ে ফিরে এলেও এর চাইতে আর তোমাদের জ্ঞান বাড়বে না।'

"ররী—'আচ্ছা দেখা যাউক।'

"মাষ্টার মহাশয়—'ভাল, ওখানে গিয়ে আমি কি কর্‌ব?'

"'ররী—'ওখানে গিয়ে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে তিনবার বল্‌বে—এল্যান্ ক্যামিরণ আছ গো! কোন জবাব না পাও ফিরে এস, আমি আর ভূত মানবো না।'

"মাষ্টার মহাশয় হাসিয়া বলিলেন 'এটা ঠিক্ জেনো, যে এল্যান্ সেখানে থাক্‌লে আমার কথার উত্তর দিবেই। আমাদের বড় ভাব ছিল।'

"একজন বলিল 'তাকে যদি দেখ্‌তে পাও তাহলে মুচির কাছে যে ও টাকা পেত, সে

কথাটা ভুল না।' এ কথায় সকলে হাসিয়া ফেলিল, ররী একটু অপ্রস্তুত হইল।

"এইরূপে হাসিতামাসা চলিতে লাগিল; ক্রমে মাষ্টার মহাশয়ের যাওয়ার সময় হইয়া আসিল।

"শেষে মুচি ঘড়ীর দিকে চাহিয়া বলিল 'বারটা বাজ্‌তে কুড়ি মিনিট বাকী। তুমি এখন গেলে ভাল হয়; তাহলেই ঠিক ভূতের সময়টাতে পৌছিতে পার্‌বে।'

"বেশ করিয়া কাপড় চোপড় জড়াইয়া, মাষ্টার মহাশয় যষ্টি হস্তে সেই বাড়ীর দিকে চলিলেন। মাষ্টারের যাইবার সময়ে সকলেই দু একটী খোঁচা দিয়া দিল, এবং স্থির করিল, ফলটা কি হয় দেখিয়া যাইবে।

"রাত্রি অন্ধকার। এতক্ষণ বেশ জ্যোৎস্না ছিল, কিন্তু এক্ষণে কাল কাল মেঘ আসিয়া চাঁদকে ঢাকিয়া ফেলিতেছে। মাষ্টার চলিয়া গেলে সকলে বিচার আরম্ভ করিল যে সমস্ত রাস্তাটা সাহস করিয়া যাওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব কি না। ছোট পাদরী বলিল যে তিনি হয় ত অর্দ্ধেক পথ গিয়াই ফিরিয়া আসিয়া যাহা ইচ্ছা বলিবেন, তখন আর কাহারও কিছু বলিবার থাকিবে না। ইহা শুনিয়া মুচির মনে ভয় হইল, জুতা যোড়াটা নেহাত ফাঁকি দিয়া নিবে এটা তাহার ভাল লাগিল না। তখন একজন প্রস্তাব করিল যে ররী যাইয়া দেখিয়া আসুক।

"প্রথমে ররী ইহাতে আপত্তি করিল। কিন্তু উহার বক্তৃতার পরে রাজি হইল। সকলে তাহাকে সাবধান করিয়া দিল যেন মাষ্টার তাহাকে দেখিতে না পায়, তার পর সে বাহির হইল। খুব চলিতে পারিত এই গুণে শীঘ্রই সে মাষ্টারকে দেখিতে পাইল। ররী একটু দূরে দূরে থাকিতে লাগিল—রাস্তাটা একটা জলা জায়গার মধ্য দিয়া; একটী গাছ পালা নাই যে মাষ্টার ফিরিয়া চাহিলে তাহার আড়ালে থাকিয়া বাঁচিবে।

"পরে মাষ্টার মহাশয় যখন ঐ বাড়ীতে পৌছিলেন তখন ররী একটু বুদ্ধি খাটাইয়া খানিকটা ঘুরিয়া বাড়ীর সম্মুখে আসিল। সেখানে একটা নীচু বেড়া ছিল, তাহার আড়ালে শুইয়া পড়িল।

"সে অবস্থায় দূতের কার্য্য করিতে যাইয়া তাহার অন্তরটা গুর গুর করিতে লাগিল। মাষ্টার মহাশয় ছিলেন বলিয়া, নহিলে সে এতক্ষণ চেঁচাইয়া ফেলিত। কষ্টে সৃষ্টে কোন মতে প্রাণটা হাতে করিয়া দেখিতেছে কি হয়। মনে করিয়াছে মাষ্টার মহাশয় যেরূপ ব্যবহার করেন তাহা দেখা হইয়া গেলেই সে বাহির হইবে।

"গ্রামের গির্জার ঘড়ীতে ১২টা বাজিল। সে বেড়ার ছিদ্র দিয়া চাহিয়া দেখিল যে মাষ্টার মহাশয় নির্ভয়ে দরজার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন।

"মাষ্টার মহাশয় গলা পরিষ্কার করিলেন এবং একটু শুষ্ক স্বরে বলিলেন ঃ—

'এল্যান্ ক্যামিরণ আছগো!'—কোন উত্তর নাই।

"দু এক পা পশ্চাৎ সরিয়া একটু আস্তে আবার বলিলেন 'এল্যান্ ক্যামিরণ আছগো!'—কোন উত্তর নাই।

"তার পর বাড়ীতে আসিবার রাস্তাটীর মাথা পর্য্যন্ত হটিয়া গিয়া থতমত স্বরে অর্দ্ধ চীৎকার অর্দ্ধ আহ্বানের মত করিয়া তৃতীয় বার বলিলেন 'এল—ক্যামিরণ—আছ—।' তার পর আর উত্তরের অপেক্ষা নাই।—সটান চম্পট।

"কি সর্ব্বনাশ! কোথায় মাষ্টারের সঙ্গে

বাড়ী যাইবে, মাষ্টার যে এ কি করিয়া ফেলিলেন। মুচি বেচারির আর আতঙ্কের সীমা নাই। তবে বুঝি ভূত এল। আর থাকিতে পারিল না। এই সময়ে তার মনে যে ভয় হইয়াছিল, তারই উপযুক্ত ভয়ানক গোঁ গোঁ শব্দ করিতে করিতে সে মাষ্টার মহাশয়ের পেছনে ছুটিতে লাগিল।

"সেই ভয়ানক চীৎকার শব্দ মাষ্টার মহাশয়ের কাণে গেল। মুচি দৌড়িতেছে আর ডাকিতেছে 'দাঁড়াওগো! মাষ্টার মশাই! দাঁড়াও!' মাষ্টার মহাশয় শুনিতে পাইলেন। পশ্চাতে এক প্রকার পদ শব্দও শুনিতে পাইলেন। আর কি? ঐ এল্যান্ ক্যামিরণ! ভয়ে আরও দশগুণ দৌড়িতে লাগিলেন। ররী বেচারা দেখিল বড় বিপদ! ফেলিয়াই বুঝি গেল। কি করে তারও প্রাণপণ চেষ্টা। মাষ্টার মহাশয় দেখিলেন পাছেরটা আসিয়া ধরিয়াই ফেলিল। তাঁহার গায়ের বল চলিয়া যাইতে লাগিল।

"অবশেষে মাষ্টার মহাশয় যখন দেখিলেন যে আর রক্ষা নাই, তখন তিনি সাহসে ভর করিলেন, এবং খুব শক্ত ক'রে লাঠি ধরিয়া সেই কল্পিত ভূতের দিকে ফিরিলেন এবং আর মুহূর্ত্ত কাল বিলম্ব না করিয়া যত জোর ছিল একবার সেই কল্পিত ভূতের মস্তকে 'সপাট'—সাংঘাতিক এক ঘা। তার পর সেটাও যেন কোথায় অন্ধকারে অদৃশ্য হইল।

"ভূতটা যাওয়াতে এখন একটু সাহস আসিল, কিন্তু তথাপি যতক্ষণ গ্রামের আলোক না দেখা গেল ততক্ষণ থামিলেন না। গ্রামে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে সাবধানে ঘাম মুছিয়া ঠাণ্ডা হইয়া লইলেন। মনটা যখন নির্ভয় হইল তখন ঘরে গেলেন—যেন বিশেষ একটা কিছু হয় নাই। অনেক কথা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, তিনি সকল গুলিরই উত্তরে বলিলেনঃ—

'ঐ আমি যা বলেছিলাম; ভূতটুত কিছুই তো দেখতে পেলাম না!'

"এর পর মুচির জন্য সকলে অপেক্ষা করিতে লাগিল। মাষ্টারকে তাহারা বলিল যে সে স্থানান্তরে গিয়াছে, শীঘ্রই ফিরিয়া আসিবে।

"আধ ঘণ্টা হইয়া গেল তবু মুচি আসে না। সকলে মুখ চাওয়া চাওয়ি করিতে লাগিল। চিন্তা বাড়িতে লাগিল, ক্রমে একটা বাজিল! তার পর আর থাকিতে পারিল না, মুচির অনুপস্থিতির কারণ তাহারা মাষ্টার মহাশয়কে বলিয়া ফেলিল। মাষ্টার মহাশয় শুনিয়াই চীৎকার করিয়া উঠিলেন। লাফাইয়া উঠিয়া লণ্ঠন হাতে করিয়া দৌড়িয়া বাহির হইলেন এবং সকলকে পশ্চাৎ আসিতে বলিয়া দৌড়িয়া চলিলেন।

"সকলেরই বিশ্বাস হইল মাষ্টার মহাশয়ের বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পাইয়াছে। হৈচৈ কাণ্ড! সকলেই জিজ্ঞাসা করে ব্যাপারটা কি? তাড়াতাড়ি ঘরের বাহিরে আসিয়া তাহারা মাষ্টারকে দাঁড়াইতে বলিতে লাগিল। তাঁহাদের শব্দ শুনিয়া কুকুর গুলি খেউ খেউ করিয়া উঠিল। কুকুরের গোলমালে গাঁয়ের লোক জাগিল! সকলেই জিজ্ঞাসা করে ব্যাপারখানা কি?

"এই সময়ে মাষ্টার মহাশয় জলার মধ্য দিয়া দৌড়িতেছেন। মাথা ঘুরিয়া গিয়াছে—কেবল পুলিশ—মাজিষ্ট্রেট—জুরী—ইত্যাদি ভয়ানক বিষয় মনে হইতেছে। তাঁহার লণ্ঠনের আলো দেখিয়া অন্যেরা তাঁহার পশ্চাৎ আসিতেছে।

"সকলে তাঁহার কাছে আসিয়া তাঁহাকে ধরিল এবং ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। মাষ্টার মহাশয়ের উত্তর দিবার পূর্ব্বেই সেই

মাঠের মধ্য হইতে গালি এবং কোঁকানি মিশ্রিত এক প্রকার শব্দ শুনা যাইতে লাগিল। কতদূর গিয়া দেখা গেল একটা লোক জলার ধারে বসিয়া আছে। লণ্ঠনের সাহায্যে নির্দ্ধারিত হইল যে এ আর কেহ নহে, আমাদের সেই মুচি। সেইখানে বেচারা দুই হাতে মাথা চাপিয়া বসিয়া আছে আর তাহাদের মাষ্টারের উদ্দেশে গালাগালি দিতেছে। তাহার নিকট হইতে সকলে সমস্ত ঘটনা শুনিল।

* * * * * * * * * * * *

"শেষে অনুসন্ধানে জানা গেল যে ঐ বাড়ীর জানলার ঠিক সম্মুখে একটা ছোট গাছ ছিল। তাহারই ছায়া চন্দ্রের আলোকে দেয়ালে পড়িত। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে সেই ছায়ার আকৃতি দেখিতে ঠিক ক্যামিরণের মুখের মত। সে দিন চন্দ্র ছিল না বলিয়াই মাষ্টার মহাশয় সেই ছায়া দেখিতে পান নাই।"

ধাঁধা।

গতবারের উত্তর।

১।—পেন্-সিল। ২।—প্রভাত। ৩।—হাড়ী (হাঁড়া)। ৪।—কাঁকড়া, (অশ্বত্থমা)।

নূতন।

১।—আমার আধখানা সাহেব, আধখানা বাঙ্গালী, কিন্তু দুইই অপদার্থ। বলত আমি কোন্ ফল?

২।—ভয়ানক লোক আমি, তিনটী অক্ষর
স্মরিলে আমারে সবে ভয়েতে কাতর।
প্রথমে ছাড়িলে যুদ্ধে যায় ত্বরা করি
ত্যজিয়া দ্বিতীয়ে মানবের মন হরি।
তৃতীয়টী নিলে গালি দিব হে তোমারে
কেমন জিনিষ সবে দেখিবে আমারে।

৩।—আহা! মনের আনন্দে বাজনা বাদ্য লইয়া মহা ধূমধামে যাচ্ছি, আর ভাই একটা গোরু আমার বাঁদিকে যেই এসেছে আর কি না তোমাদের দাসীও আমাকে হাতে ক'রে লইয়া গেল?

৪।—সাগরেতে জন্ম মম জলজন্তু পাশে
মন্ত্রবলে কিন্তু ভাই বেড়াই আকাশে।
একি মজা, যবে আমি করিব রোদন
সে রোদনে প্রাণ পাবে সকল ভুবন?

৫।—আদরের ধন আমি মানব সংসারে
সকলেই মোর মত হতে সাধ করে।
কিন্তু আমি জ্ঞানহীন পশুর সমান
তথাপি আমারে সবে করে এত মান।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে মুদ্রিত এবং ২ নং বেনিয়াটোলা লেন, "সখা" কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

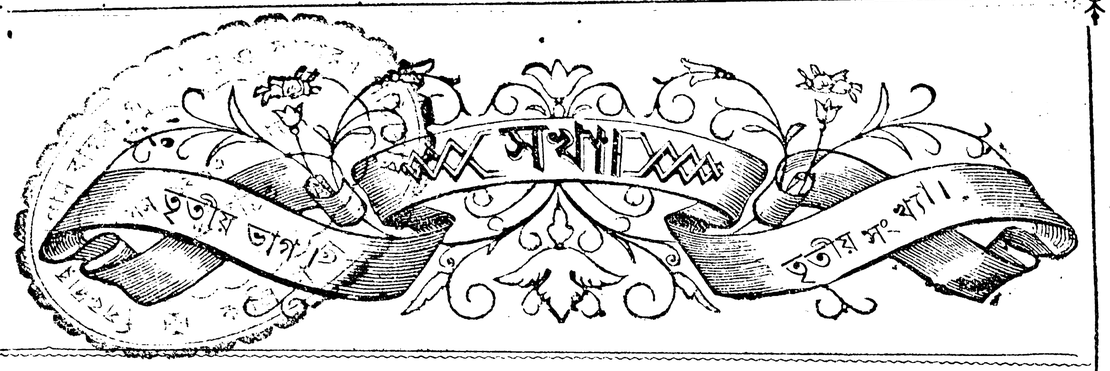

মার্চ্চ, ১৮৮৫।

প্রাচীনকালের ছাত্রজীবন।

এখন আমাদের দেশের বালকেরা দশটার সময় বহি লইয়া স্কুলে যায়, এবং চারিটা বাজিলে বাড়ীতে ফিরিয়া আইসে। স্কুলে যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ শিক্ষকের উপদেশ শুনে, শিক্ষক যে পাঠ দেন, মন দিয়া তাহা অভ্যাস করে। পরে বাড়ী আসিয়া পিতা মাতা বা অন্য কোন অভিভাবকের অধীনে থাকিয়া আপনার কাজ কর্ম্ম করে। প্রাচীন কালে আমাদের দেশে লেখা পড়া শিক্ষার এমন নিয়ম ছিলনা। তখন ছেলেদের বয়স পাঁচ বৎসর হইতে না হইতেই, তাহাদিগকে বিদ্যা শিক্ষার জন্য গুরু-গৃহে যাইতে হইত। ছাত্র এই সময়ে মনোযোগের সহিত গুরুর নিকট বিদ্যা শিক্ষা করিত, এবং মনোযোগ ও ভক্তির সহিত গুরুর সেবা শুশ্রূষায় নিবিষ্ট থাকিত। বিদ্যা শিক্ষা ও গুরুর সেবা শুশ্রূষা করাই তখন তাহার প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম হইয়া দাঁড়াইত। বিদ্বান্ ও শাস্ত্রজ্ঞ না হইলে এবং গুরুর আদেশ না পাইলে কেহ বাড়ী আসিয়া বাস করিতে পারিত না। ছাত্র যত দিন গুরু-গৃহে বাস করিয়া বিদ্যাভ্যাস করিতেন, তত দিন তাঁহাকে অনেক গুলি কঠোর নিয়ম প্রতিপালন করিতে হইত। ছাত্রকে ব্রহ্মচারী বলা যাইত এবং তাঁহার ছাত্রত্ব অবস্থার নাম ব্রহ্মচর্য্য ছিল। ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মচর্য্যের কঠোর নিয়মগুলি যত্নপূর্ব্বক প্রতিপালন করিতেন। তিনি প্রত্যূষে সূর্য্য উদয় হইবার আগে শয্যা হইতে উঠিতেন, প্রাতঃস্নান করিয়া গুরুর পূজার জন্য ফুল ও যজ্ঞের জন্য কাষ্ঠ আনিয়া দিতেন। ইহা ভিন্ন জল আনিতেন, যজ্ঞের স্থান পরিষ্কার করিতেন, এবং প্রত্যহ ভিক্ষা করিয়া যাহা পাইতেন, তাহা গুরুকে দিতেন। গুরু তাঁহাকে যাহা খাইতে দিতেন তাহা ভিন্ন তিনি আর কিছুই খাইতে পাইতেন না। এরূপ কঠোর নিয়ম প্রতিপালন করিয়া, ব্রহ্মচারী ভক্তিভাবে, মনোযোগ সহকারে গুরুর নিকট বেদ শিক্ষা করিতেন। আমাদের এখনকার ছাত্রেরা, অনেকে লেখা পড়া শিখিতে যাইয়া বড় বিলাসী হইয়া পড়েন, বাবু আনা চালে চলেন, পমেটম্ প্রভৃতি মাথায় দিয়া, সিঁতি কাটিয়া, রঙ্গীন জামার উপর গোলাপ ফুল প্রভৃতি গুঁজিয়া, স্কুলে আসিতেও লজ্জিত হন না। শিক্ষার সময় এইরূপ বিলাসিতা, এইরূপ বাবু-আনা চাল হওয়াতে শিক্ষার্থীদিগের নিষ্ঠা দূর হয়। কষ্ট-সহিষ্ণুতা অভ্যাস হয় না, এবং আত্ম-সংযম ও বিলাস-বিদ্বেষ প্রভৃতি নষ্ট

হইয়া যায়। কষ্ট সহ্য করিবার ক্ষমতা না জন্মিলে বিদ্যা শিক্ষা করিতে পারা যায় না। বিদ্যাভ্যাস করিতে হইলে অনেক বিঘ্ন বিপত্তি কাটাইয়া উঠিতে হয়। অনেক পরিশ্রম ও অনেক কষ্ট স্বীকার করিয়া, কঠিন কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হয়; সুতরাং বিদ্বান্ হইয়া বিজ্ঞতা ও বহু-দর্শিতা উপার্জ্জন করিতে হইলে কষ্ট সহ্য করিবার ক্ষমতা চাই। বাবু-আনা চালে চলিলে—ভোগ বিলাসে মত্ত থাকিলে লেখা পড়া হয় না, সুতরাং সংসারে বড় লোক হইতে পারা যায় না। পৃথিবীতে যাঁহারা বড় লোক বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই কষ্ট সহিষ্ণু ছিলেন, সকলেই ঘোরতর পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার করিয়া, নানা-বিধ বিজ্ঞতা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। প্রাচীন কালে ছাত্রেরা এজন্য ব্রহ্মচর্য্যের কঠোর নিয়ম পালন করিয়া কষ্ট সহিষ্ণু হইতেন। বিদ্যাভ্যাসের সময় কষ্ট-সহিষ্ণুতা ব্যতীত আরও অনেক গুলি গুণ থাকা আবশ্যক; তাহার মধ্যে নিষ্ঠা, মনোযোগ ও চিত্ত-সংযম প্রধান। ব্রহ্মচারীর এসকল গুণও অভ্যাস হইত। ব্রহ্মচারী প্রভাতে স্নান করিয়া পবিত্র হইতেন, দেব সেবার জন্য ফুল আহরণ করিতেন, দিবা রাত্রি গুরুর পরিচর্য্যার জন্য প্রস্তুত থাকিতেন, ইহাতে অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্যে তাঁহার নিষ্ঠা জন্মিত। সর্ব্বদা গুরুর উপদেশ গ্রহণ ও গুরুর আদেশ পালন করাতে তাঁহার মনোযোগ অভ্যাস হইয়া আসিত। ব্রহ্মচারী ভোগ বিলাস হইতে সর্ব্বদা দূরে থাকিতেন। তিনি কোনও প্রকার গন্ধ দ্রব্য ব্যবহার করিতেন না, বহুমূল্য পরিচ্ছদ পরিধান করিতেন না, উৎকৃষ্ট শয্যায় শুইতেন না, অলঙ্কার পরিয়া দেহের শোভা বাড়াইতেন না, এবং ভাল জিনিস খাইবার জন্যও উৎসুক থাকিতেন না। তাঁহার ভোগবিলাসের বাসনা, তাঁহার ভাল খাইবার, ভাল পরিবার ইচ্ছা, কিছুই থাকিত না। তিনি সামান্য কাপড় পরিতেন, সামান্য কুশাসনে শুইতেন এবং প্রত্যুষে উঠিয়া, গুরুর উপদেশ অনুসারে কার্য্য করিতেন। সমস্ত দিন পরিশ্রমের পর ভিক্ষা করিয়া, যাহা পাইতেন, তাহা দ্বারাই তাঁহার জীবন রক্ষা হইত। এইরূপ কঠোর ব্রত পালন করাতে ব্রহ্মচারীর মনের স্থিরতা জন্মিত। এইরূপে প্রাচীনকালের ছাত্রগণের কষ্ট-সহিষ্ণুতা, চিত্ত-সংযম, মনোযোগ প্রভৃতির বিকাশ হইত। এই কষ্ট-সহিষ্ণুতা, চিত্ত-সংযম ও মনোযোগ প্রভৃতির গুণে, ছাত্র ইহার পর সৎকার্য্যশালী গৃহস্থ হইয়া উঠিতেন।

ঠাকুরদাদার গল্প।

তুষারপাত। (Snow.)

বীন বাবুর ছাত্র সংখ্যা যতই বাড়িতে লাগিল, ততই তাঁর আনন্দ হইতে লাগিল। পাড়ার সমস্ত বালকগণই ক্রমে তাঁহার নিকট নানা বিষয়ের ভাল ভাল গল্পে নূতন নূতন জ্ঞান-

লাভ করিবার লোভে আসিয়া জমা হইতে লাগিল। তিনিও খুব আহ্লাদের সহিত সকলকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন। প্রায়ই সকলকে সঙ্গে লইয়া এদিক ওদিক সর্ব্বত্র বেড়াইয়া বেড়ান আর নূতন বিষয় সকল শিক্ষা দেন। এইরূপ এক দিন একদল বালক সেনা সঙ্গে লইয়া মাঠে ভ্রমণ করিতেছিলেন। গণেন্দ্র নামক একটি বালক জিজ্ঞাসা করিল, "মহাশয়! আমরা পুস্তকে যে "স্নো"র (Snow) কথা পড়িয়াছি তাহার কথা কিছু বিশেষ করিয়া বলিবেন কি? তাহা হইলে ভাল বুঝিতে পারি। Snow 'স্নো' কি, তাহা বুঝি নাই।"

নবীন বাবু সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "আজ বেড়াইতে আসিবার পূর্ব্বে এই বিষয়েই গল্প করিব মনে করিয়া আসিয়াছিলাম, তুমি জিজ্ঞাসা করিলে বেশ্ই হইয়াছে। এ বড় চমৎকার কথা, কিন্তু "স্নো" অর্থাৎ তুষার আমাদের দেশে পড়ে না, তাই হয়ত তোমরা সহজে বুঝিতে পারিবে না; মন দিয়া শুনিতে হইবে। আমাদের দেশে প্রায় সকলেই শিলাবৃষ্টি দেখিয়াছে; শিল পড়ার সময় মাথায় ছাতা দিয়া বড় বড় শিল কুড়াইয়া খাওয়া তোমাদের ও একটা খুব বড় আমোদ। না? (সকলে:- "হা।") কিন্তু শিল যে কিরূপে হয় তাহার এ পর্য্যন্ত কিছুই স্থিরতা হয় নাই; নানা পণ্ডিত নানা মত প্রকাশ করিতেছেন কিন্তু কেহই স্থির মীমাংসায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই। তবে তুষারের উৎপত্তি খুব সহজেই বুঝা যায়। যে সকল দেশে শীত বড় অধিক, যে সকল দেশের বায়ুর উত্তাপ ৩২° ডিগ্রীর অপেক্ষা অধিক নয়, সেই সব দেশে বায়ুর উপরে ভাসমান বাষ্প ঘন হইয়া জলকণা ও তৎপরে বেশী শীত বলিয়া একেবারে বরফ হইয়া যায়। যেমন ক্ষুদ্র কণা তেমনি ক্ষুদ্র বরফ-কণাও হয়। সেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বরফ-কণাকে তুষার (Snow) বলে। তুষার জমাট কুয়াশা বৈ আর কিছুই নহে। আমাদের দেশে গ্রীষ্ম অধিক, এজন্য এরূপ ঘটনা কখনই হয় না। কিন্তু উত্তর অঞ্চলে হিমালয় পর্ব্বতের উপর যে সকল স্থানের তাপপরিমাণ ৩২° ডিগ্রী অপেক্ষা অধিক নয়, সে সকল স্থানে তুষারপাত হইতে দেখা যায়। আর ইংলণ্ড, সুইজর্লাণ্ড প্রভৃতি দেশে খুব তুষারপাত হইয়া থাকে। তাহা তোমরা 'সখা'য় "জীবনরক্ষক কুকুরে"র গল্পে পড়িয়াছ। ঐ সকল দেশে শীতকালে বড় ভয়ানক তুষারপাত হয়। এমন কি—পথ, ঘাট, মাঠ সব সাদা সাদা তুলার কুচির মত তুষার রাশিতে আচ্ছন্ন হইয়া থাকে, সূর্য্যকে অনেক সময় দেখাই যায় না; কেবলই স্তূপাকার তুষাররাশি পড়িতেছে, বাতাসে আবার এক স্থান হইতে স্থানান্তরে উড়িয়া যাইতেছে, কত কি রকমে মহা আনন্দে খেলা করিয়া বেড়াইতেছে! সুইজর্লাণ্ড দেশে যে কি ভয়ানক ব্যাপার তা ত পড়িয়াছ? রাশি রাশি বরফকণার মধ্যে কত মানুষ ডুবিয়া পুতিয়া থাকে, প্রাণ হারায়, তাহার ঠিকানা নাই। অনেক স্থলে রাত্রির মধ্যে অনেক ছোট ছোট কুটীরের দ্বার পর্য্যন্ত তুষার স্তূপের মধ্যে বুজিয়া থাকে, কত কষ্টে—তবে সে সব সরাইয়া দ্বার খুলিতে হয়!

অল্প অল্প তুষারপাতের সময়ে সাহেবদের ছেলেরা মহা আনন্দে তাহাতে খেলা করিতে যায়। তাহারা নূনের গাদার মত, কি সাদা সাদা খুব হাল্কা বালির গাদার মত তুষারের কাঁড়ির উপর লম্ফ ঝম্ফ করিয়া মহা আমোদে উন্মত্ত হয়, সে সময় তাহাদের খাওয়া দাওয়ার কথা মনে থাকে না। কত যায়গায় ছেলেরা

আবার মুটো করিয়া তুষার জমাট বাঁধায়, আর তাই একত্র করে খুব মস্তো একটা মানুষের মত তৈয়ার করে। দূর হতে সেই মানুষটার গায় "স্নো"র ডেলা মারিতে থাকে আর কত যে আমোদ করে তাহার সীমা নাই। 'স্নো' খুব হাল্‌কী, একটু বাতাস হ'লেই অমনি উড়িতে আরম্ভ করে। আর যখন নাচিতে নাচিতে উড়িতে উড়িতে ধীরে ধীরে বায়ুর মধ্য দিয়া পড়িতে থাকে তখন বড় সুন্দর দেখায়। এ বৎসর তোমাদের হিমালয়ে যে যে যাইতে চাও আমি লইয়া যাইব।" অমনি কিশোরী, অমূল্য, মন্মথ, নগেন প্রভৃতি সকলে মহা গোল করিয়া বলিল "আমি যাব দাদা বাবু। আমাকে নে যাবে না দাদা? আমি কি যাবনা?" ইত্যাদি।

সকলকে থামাইয়া নবীন বাবু বলিতে লাগিলেন :—"তুষারকণার আকার খুব বড় নয়, আমাদের দেশে বর্ষাকালে বাদলের দিন যে গুঁড়নী বৃষ্টি হয়, কুয়াশার চেয়ে একটু বড় বড় বিন্দুগুলি ঝির ঝির ক'রে পড়িতে থাকে, তুষার তত বড়; তবে জল অপেক্ষা বরফের আয়তন নাকি একটু বড় তাই বেশ্ স্পষ্ট দেখা যায়, নাড়া চাড়া যায়। কিন্তু একটা কথা :—যখন খুব শীত হয়, যত শীতে জল জমিয়া যায় তার চেয়ে যদি খুব ঠাণ্ডা হয়, তবে তুষার বেশী পড়ে না, কিম্বা যদি বা পড়ে তবে সে খুব গুঁড়ি গুঁড়ি। কেন না বাতাস যত গরম থাকে তাতে জলীয় বাষ্প তত অধিক থাকে, আর যত ঠাণ্ডা হয় তাতে বাষ্পের অংশ তত কম থাকে। কাজেই ঐ রকম খুব শীতের সময়, ইংরাজীতে যাহাকে frost বলে, সে সময়ে বড় তুষারপাত হয় না। তাহার পূর্ব্বে খুব তুষার পড়ে, আর পরে যখন বাতাস আর একটু গরম হয় তখন পড়ে; মাঝখানে কম পড়ে, বা পড়েই না। ঐ রকম জমাট শীতের সময়ে (frost) তুষারে দেশের বড় উপকার করে। বরফ তাপ পরিচালক নহে, এজন্য যে সব চারা গাছ, শস্য প্রভৃতি ঐ তুষারে আচ্ছন্ন হইয়া থাকে, তাহাদের উত্তাপ বাহির হইয়া যাইতে না পারায় তত ভয়ানক শীতেও তাহারা মারা যায় না।"

কিশোঃ—"সে কি? বরফে ঢাকা থেকে তারা গরম থাকে?"

নবীন বাবু :—"হাঁ। এমনি আশ্চর্য্য নিয়ম ঈশ্বরের। শীতে একেবারে গাছগুলি মারা যেত; কিন্তু তিনি বরফ দিয়া আবৃত করিয়াই তাহাদের উত্তাপ রক্ষা করিয়া সে গুলিকে সজীব রাখিয়া থাকেন! স্পষ্টই দেখা যায় যে সকল স্থান হইতে বায়ুতে তুষারের ঢাকনি উড়াইয়া লইয়া যায়, সে সব স্থান শীতে একেবারে শুষ্ক হইয়া উচ্ছন্ন যায়।"

অমূল্য :—"কি চমৎকার! এ সকল জানিলে কত আশ্চর্য্য হইতে হয়; পরমেশ্বরের কেমন মহিমা টের পাওয়া যায়!"

নবীন বাবু :—"এখনও বাকী আছে। তোমরা মনে করিতেছ—তুষার ত তুষার। রাশি রাশি বরফের কুচি। তা নয়। তাহার প্রত্যেক কণার যে কি সৌন্দর্য্য, কি আশ্চর্য্য গঠন-প্রণালী তাহা দেখিলে অবাক্ হইতে হয়। কাপ্তেন স্কোর্‌স্‌বী Captain Scoresby উত্তর মহাসাগরীয় স্থানে লক্ষ্য করিয়া স্থির করিয়াছেন যে প্রায় এক হাজারের চেয়েও বশী রকম গঠনের তুষার কণা দেখা যায়। তাহাদের আকার যে কি সুন্দর তাহা বর্ণনা করা অসম্ভব। তবে এই এক হাজারের মধ্যে যে কয়েকটীর ছবি দেওয়া গেল তাহা দেখিলেই বুঝিতে পারিবে যে তুষার কণা যথার্থই কি চমৎকার শোভার জিনিস। এত রকম আলাদা

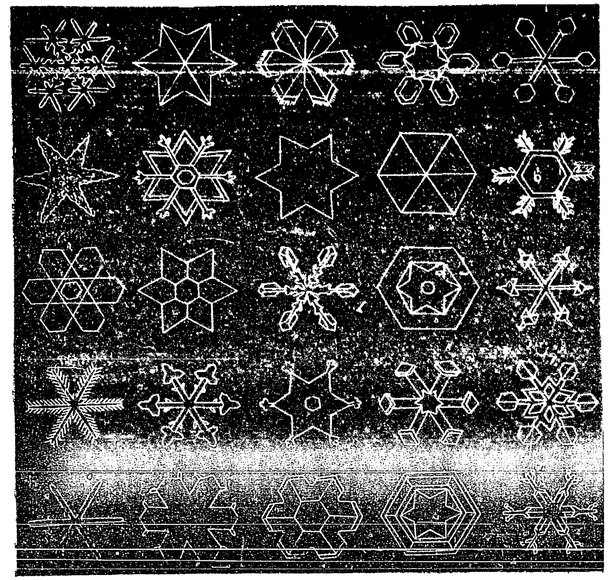

বটে, কিন্তু সকলেই দেখিতে পাবে যে তাদের মধ্যে সবই একটা সুন্দর নিয়মের অধীন। সকল গুলিরই একটা সাধারণ আকার আছে, তাহা কি?—না সকলেই ছয়টী কাঁটাওয়ালা নক্ষত্রের মত দেখিতে। তবে ওরই মধ্যে সব চেহারা আলাদা। ছটা কাঁটা কিন্তু সবারই আছে, মন দিয়া দেখিলেই জানিতে পারিবে।"

গণেন্দ্র :—"আচ্ছা এ রকম হয় কেন?"

নবীনবাবু :—"এই প্রকার আকার ধারণের নাম "দানা বাঁধা" ইংরাজীতে বলে crystallisation, এই দানা গুলির নাম crystals। আমরা বলি জল জড় পদার্থ। কিন্তু ঐ জড় পদার্থের মধ্যে লুকাইয়া যে এক জন মহা শিল্পী কাজ করিতেছেন তাহা ত দেখি না! কোন কোন বস্তুর এমন গুণ আছে যে জলে মিশ্রিত থাকিবার সময়ে অদৃশ্য থাকে, কিন্তু যখন ঐ জল আস্তে আস্তে উড়াইয়া বাষ্প করিয়া দেওয়া যায়, তখন সেই সামগ্রী (যাহা এতক্ষণ জলে গুলিয়া ছিল) আস্তে আস্তে দেখা দিতে থাকে; কিন্তু যে-সে আকারে দেখা দেয় না, এক বিশেষ নির্দ্দিষ্ট আকারে দানা বাঁধিয়া দেখা যায়। যেমন তোমরাই বাড়ী গিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পার—লবণ বা সোরা জলে গুলিয়া, তাপ দিতে দিতে যেমন জল শুকাইয়া আসে অমনি ঐ সকল লবণ বা সোরার কণাগুলি ধীরে ধীরে দানা বাঁধিয়া দেখা দেয়। পরিষ্কার চিনির রস কুঁদার মধ্যে ঢালিয়া রাখিলেই পরে রস মরিয়া মিছরী হয়, তার দানা ত সকলেই দেখিয়াছ, ভাল গুড়ও কখন কখন দানা বাঁধে। এও ঠিক তেমনি; জল জমিবার সময়ে ছোট ছোট কণাগুলি ঐরূপ দানা বাঁধিয়া দেখা দেয়। কি তুষার, কি শিল, এমন কি বরফে পর্য্যন্তও এই রকম ছয়টা কাঁটাওয়ালা নক্ষত্রের মত দানার গঠন দেখিতে পাওয়া যায়। কি সুন্দর! কি চমৎকার! ধন্য সেই শিল্পকার, যিনি এইরূপে জগতময় আপনার কারিকুরি ছড়াইয়া রাখিয়া-

ছেন! আমরাও ধন্য যে তাঁহার মহিমার কিছু কিছু বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিতে পারি!"

লেখা পড়া কিসের জন্য?

ভুবনের কাহিনী।

রামজীবন বাবু একজন বুনিয়াদি বড় লোক। তাঁহার খুব বিষয় বিভব, টাকার গাছ একেবারে। চারিদিকে ব্যবসায় বাণিজ্য, জমিদারী, কলিকাতায় ১০।১২টা বড় বড় বাড়ী ভাড়া চল্‌ছে, খুব বড় মানুষ লোক। তাঁহার একমাত্র ছেলে ছিল, তা সেও মরিয়া গেল। কাজেই তাঁহার ভাইপো ভুবনই সমস্ত বিষয় পাবে ঠিক ঠাক হইয়া আছে। তাহার সমবয়সী বন্ধুরা তাহাকে কত ভাগ্যবান বলিয়া হিংসা করে। ক্রমে ভুবন বড় হইল। মহা ধূম ধামে ভুবন বাবুর বিবাহ হইল। কন্যাটী পরমাসুন্দরী, যেন স্বর্গের পরী। আহা! তাহার দুঃখের কথা এখন মনে হলে চক্ষে জল আসে, বুক ফাটিয়া যায়! তোমরাও শুনিলে মহা দুঃখিত হইবে। ভুবন আর বিদ্যালয়ে যায় না। বাবু হইয়া ভাল পোষাক পরিয়া, ভাল সুগন্ধ এসেন্স মাখিয়া, গায় ফুঁ দিয়া নানা স্থানে ছড়ি হাতে করিয়া বেড়ায়। মুখ রাঙ্গা করিয়া পান খায় আর দিব্য ফুলের মত কোঁচার আগাটী বাঁ হাতে ধরিয়া বেড়ায়। তাহার সে বেশ ভূষা দেখিলে সকল ছেলে মেয়ের রাগ হইত। নাই বা হবে কেন? একেইত ধূম বাবুগিরি ভাল ছেলে মেয়েরা দেখিতে পারে না, তাহাতে আবার ছেলেটা মূর্খের চূড়ামণি। সকলেই ভুবনকে ঠাট্টা করিত, দেখিয়া মুখ বাঁকাইয়া হাসিত আর ময়ূররাজ বলিয়া ডাকিত। গ্রামের কেহই তাহাকে দেখিতে পারিত না। রামজীবন বাবু তাঁহার আদরের ধন ভুবনমোহনকে চিরকাল "খোকা" বলিয়া ডাকিতেন। কেহ তাহার নিন্দা করিলে সহ্য করিতে পারিতেন না। বলিতেন "পাড়ার লোকের কি? আমার বাপকে আমি সাজাই, আমার খুসী। আমার এত ইন্দ্রের মত ঐশ্বর্য্য; কাজ কি ভুবনের লেখা পড়ায়? ও যদি বিষয় উড়াইয়াও দেয়, তবু উড়াইতে উড়াইতে ৪ চারি পুরুষ কাটিয়া যাইবে। কাজ কি লেখা পড়া শিখে? যাদের চালে খড় নাই, ঘরে ভাত নাই, সাত পুরুষে টাকার মুখ দেখেনি তারাই লেখা পড়া শিখে চাকরী করুক গে! সব বেটার হিংসা হয় কি না, তাই এসে আমার "খোকা"র নিন্দা করেন।" এই রকম নানা প্রকারে ছেলেটীকে আদর দিয়ে তাহার মাথা খাইয়া ফেলিলেন। ভুবন আড়াল হইতে সে সব কথা শুনিয়া আরও আদর পাইত আর পৃথিবীকে সরা মনে করিত। এইরূপে উত্তম মধ্যম রূপ উচ্ছন্ন গেল। ভুবনের মা বিধবা, তাহার ঐ একটী তাঁহার অভিভাবক, কাজেই কর্ত্তার উপর আপনার কথা আর চালাইতে পারেন না। ছেলেকে কত বুঝান, কত বলেন, কত বিনয় করিয়া শিক্ষা

দেন। ছেলে ততই একেবারে ধিঙ্গী হইয়া তাঁহার কথা তৃণ জ্ঞানও করে না। পৃথিবীতে কাহাকেও গ্রাহ্য করে না, তোমরা বুঝিতেই পারিতেছ তার দশা কি হইয়াছে। হয় ত তোমাদেরই গ্রামে এ রকমের "খোকা" দু একটী আছেন।

কিছুদিন ত এই রকমে যায়, তখন স্কুল হইতে নামটী কাটাইয়া "খোকা বাবু" বাড়ীতে বসিলেন। তাঁহার একটা আলাদা বৈঠকখানা হইল। সাজান গোজান আস্‌বাব্‌, ইয়ার বন্ধু অনেক আসিয়া যুটিল। রোজ বিকালে মহা ধূমধাম ব্যাপার ছোট বৈঠকখানায় চলিতে লাগিল। ক্রমে মদ্যপান অবধি গড়াইল। বাবুদের বংশ চিরকাল মদ্যের বড়ই বিরোধী। কোন পুরুষে কেহ কখনই মদ খায় নাই। কাজেই বাবু এই কথাটী শুনিয়া বড় দুঃখিত হইলেন, বিরক্ত হইলেন। প্রথমে চাকর বাকরকে দিয়া বলিয়া পাঠাইলেন। তাহাতে "খোকা" বলিল "না আমি ত মদ খাই না।" তার পরেও আবার ঐ রূপ কাণ্ড চলিতে লাগিল। তখন বাবু নিজে এক দিন ভুবনকে ডাকিয়া অনেক বুঝাইলেন। কিন্তু কিছুই হইল না। সে তাঁহার কাছে বেশ্‌ মিছা কথা বলিয়া কাটাইয়া দিল। বাবুর বয়স অনেক হইয়াছিল, মনের দুঃখে, মনের ক্ষোভে বসিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। এত দিনের পরে বুঝিলেন যে লেখা পড়া শেখা কেবল টাকা উপায়ের জন্য নয়। লেখা পড়া না শিখিলে যে মানুষই হওয়া যায় না, চরিত্র ভাল হয় না, গুরুজনকে মান্য করিতে শেখে না তা এত দিন পরে জানিতে পারিলেন।

তাঁহার গমস্তা বিহারী সরকার,—তাহার একটি ছেলে আছে, নাম কেশব, বয়স ১৭ বছর, ইহারই মধ্যে সে এল্‌. এ, পাশ করিয়া কলিকাতার বিদ্যাসাগরের কালেজে বি, এ, ক্লাশে পড়ে। একদিন বাবুর এজ্‌লাশে তাঁহার গমস্তা, দাওয়ান, খাতাঞ্জী সকলে বসিয়া বিষয় কর্ম্ম করিতেছেন, এমন সময়ে কেশব সেখানে উপস্থিত হইয়া সকলের চরণ পূজা করিয়া পিতার পায়ের ধুলি লইয়া এক পাশে গিয়া দাঁড়াইল। বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন "কে ছেলেটী?" বিহারী সরকার ছেলের পরিচয় দিয়া কহিলেন "ধর্ম্মাবতার! ওটী আপনারই অনুগত ভৃত্যের সন্তান, আপনারই আশ্রিত দাস।" তাহার পর অবধি কেশবের উপর বাবুর এমন ভাল বাসা জন্মিল যে তিনি তাহাকে সে দিন আপনার বসিবার ঘরে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তাহার সঙ্গে অনেক কথা বার্ত্তা হইল। তারপর একদিন সকলের সাক্ষাতে বলিলেন, "যাহারা লেখা পড়া জানে না, বিদ্যা শিখিয়া যাহাদের মন নরম না হয়, তাহারা মানুষই নয়। আমি এতদিন একটা গর্দ্দভকে আহার দিয়া পুষিতেছি! ধিক্‌ আমার বুদ্ধিতে! আমার এই অতুল ঐশ্বর্য্য থাকিতেও আমি বিহারী সরকারের চেয়ে হতভাগ্য! আহা! আমার যদি কেশবের মত ছেলে হইত, আর আমি যদি পথের ভিখারী হইতাম, তাহ'লেও আমি এর চেয়ে সুখী হ'তে পারতাম!" আর কথা বলিতে পারিলেন না, তাঁহার গলা বন্ধ হইয়া গেল, চক্ষে দুফোঁটা জল এল, মুছিয়া ফেলিলেন। সভাস্থ সকলে নানা প্রকারে বুঝাইতে লাগিল, কিন্তু কিছুতেই তাঁহার মনের ক্লেশ নিবারণ হইল না। তিনি নির্জ্জন ঘরে গিয়া খুব কাঁদিলেন। বৃদ্ধ বয়সে এত শোকে পাছে তাঁহার প্রাণ যায়, এই ভয়ে বিহারী সরকার কেশবের কালেজে যাওয়া বন্ধ রাখিয়া বাবুর নিকট পাঠাইয়া দিলেন; কেশবকে পাইয়া

তাহার মুখে ভাল ভাল অনেক কথা শুনিয়া বাবুর মন অনেকটা সুস্থ হইল। তিনি স্নানাদি করিলেন। কিন্তু মনের ক্ষোভ আরও যেন বাড়িতে লাগিল। কেশবকে ছাড়িয়াও দিতে চাহেন না, আবার এদিকে যতই কেশবের জ্ঞান, বুদ্ধি, সৎচরিত্রের পরিচয় পাইতে লাগিলেন, ততই হায় হায় করিতে লাগিলেন। "আহা! ভুবনকে আমি যে ৫০ হাজার টাকা খরচ করিয়া পড়াইতে পারিতাম, সমস্ত বিষয় বিক্রয় করিয়াও তাহার লেখা পড়ার ব্যবস্থা করিতে পারিতাম। কেন করিলাম না! আহা! কেন নিজে এ সর্ব্বনাশ করিলাম! আমার বংশের মুখে চোঁড়া কালি দিল। আর তার মুখ দেখিব না, সে দূর হউক!"

ভুবন এদিকে খুব আসর গরম করিতেছিল, মদ—মদ—মদ!! মহা ব্যাপার। তার আনুসঙ্গিক অন্য সকল কাজও চলিতেছিল। ছি! ছি!! গ্রামের সকলেই ঘৃণা করিতে লাগিল। বাবুকে পর্য্যন্ত নিন্দা করিতে লাগিল। কেহ আর তাঁহার কাছে আসে না, গল্প করিতে আর কেহ তাঁহার বৈঠকখানায় বসে না। যদিও কেহ যায় ত কেবল তাঁহার নিন্দা করিয়া উঠিয়া আসে। তাঁহারই অন্যায় আদরে ও অবহেলায় ছেলেটী নষ্ট হইল এই বলিয়া তাঁহাকে সকলে ভৎর্সনা করে। এবারে আর তিনি সে সব কথার চটা চটা জবাব দেন না। মাথা হেঁট করিয়া শুনেন, আর দুটী চক্ষু দিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া জল পড়ে! আহা! পাঠকপাঠিকাগণ! তোমাদেরও খুব দুঃখ হচ্ছে, না? দেখিও যেন কোনও কারণে তোমাদের আত্মীয় বন্ধুদিগকে বৃথা এরূপ কাঁদাইও না।

কেবল কি বাবুর দুঃখ? বাড়ী শুদ্ধ সকলেই হাহাকার করিয়া কাঁদিতেছেন। হতভাগিনী পতিহীণা জননীর ত কথাই নাই! আহা! তাঁহার স্বামীর মৃত্যু হওয়ার সময়ে তিনি বলিয়া যান যে "ভয় কি তোমার? আমার সহোদর ভাই রহিলেন ইন্দ্রের মত, আর এই কার্ত্তিকের মত পুত্র রহিল। তোমার দুঃখ ইহাঁদের দ্বারা অনেক দূর হইবে।" এখন সেই পুত্রের এই দশা। মার কি আর সহ্য হয়? তিনি কাঁদিয়া কাঁদিয়া চক্ষু দুটী অন্ধ করিলেন, পাগলিনীর মত বেড়ান। গরিবের বাছা বৌটী ছেলে-মানুষ ছিল, এতদিন বড় কিছু বুঝিত না, এখন আর তার দুঃখের সীমা নাই। কিন্তু, আহা! অমন মেয়ে দেখা যায় না। মুখে কথাটী পর্য্যন্ত নাই, সহ্যগুণ যে কত? দিবারাত্রি কেবলই শাশুড়ীর সেবাতে নিযুক্ত থাকেন, আর কেহ কাছে না থাকিলেই চুপি চুপি চক্ষের জলে বস্ত্রের আঁচল ভিজিয়া যায়। এ সব দুঃখের কথা লিখিতে আমাদের বুক ফেটে যাচ্ছে, চক্ষের জল রাখা যায় না। আর কোমল-হৃদয় পাঠক পাঠিকাদিগকে কাঁদাইতাম না, কিন্তু ইহাদ্বারা অনেকের শিক্ষা হইবে মনে করি, তাই লিখিতেছি!

কিছুদিন ত এইরূপে গেল। মানুষের দেহে অত্যাচার কত দিন সহ্য হয়? ভুবনের খুব রোগ হইল। বুকে ব্যথা, জ্বর, কাশী, যকৃৎ, একেবারে ছেলে রোগে আচ্ছন্ন হইয়া শেষে ভিতর বাড়ীতে এসে উপস্থিত। নানাবিধ চিকিৎসা হইতে লাগিল। বহু কষ্টে এ যাত্রা রক্ষা পাইলেন। বুকের ব্যথা ও কাশী সারিল না। কিন্তু কে বুঝিবে? জ্ঞান-শূন্য হইয়া যে যায়, তার আর কি পদার্থ থাকে? আবার মদ্যপান চলিতে লাগিল। তখন আর সহ্য করিতে না পারিয়া এক দিন রাত্রে বাবু নিজে তার ঘরে গিয়া খুব ভৎর্সনা করিয়া এলেন। তিনিও চলিয়া আসিয়াছেন, আর হঠাৎ ভয়ানক একটা বন্দুকের

শব্দ হইল। সকলে গিয়া দেখে ভুবনের ঘরে দ্বার বন্ধ। ডাকাডাকি করিয়া উত্তর পাইল না, শেষে দরজা ভাঙ্গিয়া গিয়া দেখে ভুবন গুলি খাইয়া মরিয়াছে, আপনা আপনি মুখের মধ্যে বন্দুক ছুড়িয়া মরিয়াছে! তার পর যে বাড়ীতে কি কান্নার রোল, তা আমরা বর্ণনা করিতে পারিব না, তোমরা বুঝিয়া লও। সে ব্যাপার বুঝিলেই ভাল জানা যায়।

সকলেরই দুঃখে হৃদয় ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, কিন্তু কেশবের সৎকথায় ও সান্ত্বনাতে বাবুর মন অনেকটা ভাল ছিল। কিন্তু কদিন থাকে? যখনই শুনিলেন যে ভুবনের মা পাগল হইয়া কোথায় গিয়াছেন, ও তাহার স্ত্রী হাতে পায়ে কাপড় বাঁধিয়া খিড়কীর পুকুরে ডুবিয়া মরিয়াছেন, তখন আর তাঁহার সহ্য হইল না। বৌটীকে তিনি "মা" বলিয়া ডাকিতেন ও বড়ই ভাল বাসিতেন। এ বড় অসহ্য যন্ত্রণা হইল। মাটিতে পড়িয়া "মা মা" বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে গড়াইতে লাগিলেন। আহা! কাপড় জামা ধূলায় লণ্ডভণ্ড হইয়া গেল, মাথার চুল ছিঁড়িয়া ফেলিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ কাঁদিয়া শেষে অচেতন হইয়া পড়িলেন। সকলে মুখে চক্ষে জল দিয়া সুস্থ করিল।

বাবু এই অবধি কেশব ভিন্ন আর কাহারও সহিত কথা কহিতেন না। আর বেশী দিন বাঁচেন নাই। কেশব তাঁহাকে ইংরাজী বাঙ্গলা ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করিয়া শুনাইত। ক্রমে তাঁহার বেশ ধর্ম্মজ্ঞান হইল। তিনি অল্প দিন পরে কেশবের হস্তে আপনার বিধবা স্ত্রী ও সমস্ত বিষয়, জমিদারী, টাকা ও বাণিজ্যের ভার দিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন।

এখনও কি পাঠক পাঠিকা বলিবেন "লেখা পড়া শেখা কেবল চাকরী করিবার জন্য"—?

রামতনু লাহিড়ী।

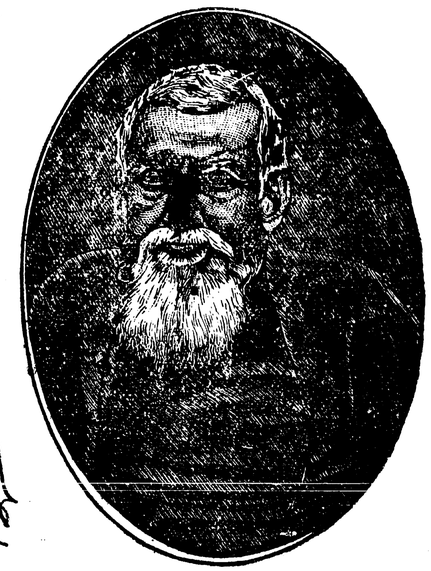

তিলক বালিকাগণ যে মহাত্মার ছবি আজ তোমাদের নিকট উপস্থিত করিতেছি ইহাঁর নাম কি পূর্ব্বে শুনিয়াছিলে? যদি না শুনিয়া থাক তবে শুন, ইহাঁর বিষয় কিছু বলি। ইনি একজন আমাদের দেশের বিখ্যাত ব্যক্তি। কিসের জন্য বিখ্যাত? অতুল বিভব সঞ্চয় করিয়া মতিলাল শীল যেরূপে বিখ্যাত হইয়াছিলেন সেইরূপ বিখ্যাত নয়; বুদ্ধি বিদ্যার জন্য মৃত দ্বারিকানাথ মিত্র যেরূপে বিখ্যাত হইয়াছিলেন সেরূপ নয়; দান ও বিবিধ সৎকীর্ত্তির জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় যেরূপ বিখ্যাত হইয়াছেন সেরূপ নয়; ইনি ধনীদের মধ্যে একজন নন; যদিও আজীবন সকল প্রকার সৎকার্য্যের উৎসাহদাতা, তথাপি সে বিষয়েও অগ্রগণ্য ব্যক্তি বলিয়া ইহাঁর নাম নয়; তবে কেন লোকে ইহাঁর প্রশংসা করে, আর কেনই

বা ইহাঁর জীবন বৃত্তান্ত তোমাদিগকে বলিতে চাহিতেছি? ইনি সাধুতার জন্য দেশে বিখ্যাত। ইনি একখানিও গ্রন্থ লেখেন নাই, সকল কাজেই অন্যের পশ্চাতে থাকিয়া কাজ করিয়াছেন, আপনাকে সকলের অপেক্ষা হীন মনে ভাবিয়া লুকাইয়া থাকিতে ভাল বাসিয়াছেন, কিন্তু তথাপি মৃগনাভি যেমন কাপড় ঢাকা থাকিলেও আপনাকে আপনি প্রকাশ করে, গোলাপ যেমন বনে লুকাইয়া থাকিলেও আপনাকে ধরা দেয়, সেইরূপ এই মহাত্মার সাধুতার সুবাস আপনা আপনি ইহাঁকে জানাইয়া দিয়াছে। যদিও ইনি এখন জীবিত আছেন এবং এখন এই কলিকাতাতেই বাস করিতেছেন, তথাপি নিজ চরিত্রের গুণে ইনি প্রাচীন কালের সাধুদের ন্যায় প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি হইয়াছেন; আমরা সকলে ইহাঁকে পিতৃতুল্য জানিয়া শ্রদ্ধা ভক্তি করি। এরূপ সাধু মহাত্মাকে জীবনে একবার দেখিতে পাওয়াও সৌভাগ্য।

অগ্রে ইহাঁর জীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ বলি। ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে গোয়াড়ি কৃষ্ণনগরে ইহাঁর জন্ম হয়; সুতরাং ইহাঁর বয়ঃক্রম এখন ৭১ বৎসর। বাল্যকালে ইনি পাঠশালায় লেখা পড়া অভ্যাস করেন। কিন্তু তখনকার বালকদিগের স্বভাব চরিত্র বড় মন্দ ছিল। বাল্যকাল হইতেই তাহারা অনেক কু-অভ্যাস শিক্ষা করিত। এই সকল কু সংসর্গে পড়িয়া তাঁহার পড়া শুনা ভাল হইতেছে না দেখিয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তাঁহাকে কলিকাতায় আনিয়া রাখিলেন।

ইহার কিছুদিন পরেই এদেশের লোককে ইংরাজী শিক্ষা দিবার জন্য স্কুলসোসাইটী নামে একটী সভা স্থাপন হয়। রাজা রামমোহন রায়, মহাত্মা ডেভিড হেয়ার প্রভৃতি কয়েকজন ইংরাজ ও বাঙ্গালি ভদ্রলোক এই সভার সভ্য ছিলেন। ডেভিড হেয়ার এই সভার সম্পাদক ছিলেন। রামতনু বাবুর কলিকাতা আসিবার কিছু পূর্ব্বে মহাত্মা হেয়ার সাহেবের যত্নে একটী ইংরাজী স্কুল স্থাপিত হয়। তাঁহার জ্যেষ্ঠ তাঁহাকে ঐ স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। হেয়ার সাহেবের স্কুল হইতে তিনি হিন্দু কলেজে গমন করেন। হিন্দু কলেজে তখন ডিরোজিও নামে একজন ফিরিঙ্গী যুবক চতুর্থ শ্রেণীর শিক্ষক ছিলেন। ইহাঁর নাম বাঙ্গালা দেশের সমুদয় শিক্ষিত ব্যক্তির জানা উচিত, কারণ যে সকল শিক্ষিত লোকের যত্নে প্রথম প্রথম সকল প্রকার উন্নতির স্রোত এদেশে প্রবাহিত হয় সেই সকল লোক এই ডিরোজিও সাহেবেরই শিষ্য ছিলেন। এই অসাধারণ বুদ্ধিশালী যুবকের বয়স তখন ২০ বৎসরের অধিক ছিল না, কিন্তু তিনি সুবিদ্বান, সুলেখক, সুকবি ও সুভাষী ছিলেন। তাঁহার চিত্ত সর্ব্বদা প্রসন্ন, মুখ হাসি হাসি, ও প্রকৃতি বড় মেশক ছিল। তিনি যে কেবল বালকগণকে পড়িবার বই পড়াইয়া ক্ষান্ত হইতেন তাহা নহে, কিন্তু অন্যান্য সময়েও তাহাদিগের মধ্যে বসিয়া গল্পচ্ছলে ও নানা প্রকার বিষয়ে অনেক উপদেশ দিতেন। যাহাতে তাহাদের কু-সংস্কার দূর হয়, সত্যের প্রতি ভালবাসা জন্মে, চিত্ত উদার হয়, চিন্তা করিবার শক্তি জন্মে, প্রাণে ভাল ইচ্ছা প্রবল হয়, সর্ব্বদা এইরূপ আলাপ করিতেন। তাঁহার ভালবাসা ও সদুপদেশের গুণে ত্বরায় অনেকগুলি ছাত্র তাঁহার শিষ্য হইল। তিনি ইহাঁদের সঙ্গে প্রতিদিন অনেকক্ষণ থাকিতেন। ইহাঁরা এদেশের ইংরাজী শিক্ষার ইতিহাসে "ডিরোজিও ক্লব" নামে বিখ্যাত। যাঁহারা তখন ডিরোজিও সাহেবের শিষ্য ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই তৎপরে এদেশে বড়লোক হইয়াছেন। মৃত রামগোপাল ঘোষ, যিনি

এদেশে একজন শ্রেষ্ঠ বক্তা বলিয়া বিখ্যাত, তিনি এই ক্লবের একজন সভ্য ছিলেন; রসিক কৃষ্ণ মল্লিক যাঁহার নাম সকলে জানেন না কিন্তু যিনি সে সময়কার একজন বড় লোক ছিলেন, তিনিও ডিরোজিওর শিষ্য। এই রূপে ডাক্তার কৃষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায়, রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, মৃত হরচন্দ্র ঘোষ, মৃত রাজা দিগম্বর মিত্র, মৃত রাধানাথ সিকদার, শ্রীযুক্ত বাবু শিবচন্দ্র দেব প্রভৃতি যে সকল ব্যক্তি পরে জনসমাজে এত যশ লাভ করিয়াছেন তাঁহারা সকলে ডিরোজিওর শিষ্য ছিলেন। ডিরোজিও তাঁহার সুমিষ্ট বাক্যের দ্বারা বালকগণের মন এমন বশীভূত করিয়াছিলেন যে ছেলেরা তাঁহার জন্য মরিতে পারিত। তিনি বালকদিগকে সত্য-প্রিয়, উদার, সাহসী ও তেজস্বী করিয়া তুলিতে লাগিলেন।

তাহারা দলবদ্ধ হইয়া হিন্দুসমাজের কুসংস্কার-বিরুদ্ধ অনেক আচরণ আরম্ভ করিল। তখন কলিকাতায় তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল। হিন্দুসমাজের দলপতিগণ দলবদ্ধ হইয়া ডিরোজিওকে তাড়াইবার জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিলেন। তাঁহার প্রতি এই দোষারোপ করা হইল যে তিনি বালকদিগকে নষ্ট করিতেছেন। এই কারণে ডিরোজিও কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার ক্লব তাঁহার বাসবাটী ইটালীতে উঠিয়া গেল। তাঁহার এত টান ছিল, যে ছেলেরা রৌদ্র, বৃষ্টি, জল, ঝড়ে কষ্ট পাইয়াও এবং বাড়ীর লোকের গঞ্জনা সহ্য করিয়াও তাঁহার বাড়ীতে যাইত। অতি অল্প বয়সেই ইহাঁর মৃত্যু হয়, কিন্তু এই অল্পকালের মধ্যে তিনি বাঙ্গালি ছাত্রদিগকে যে শিক্ষা দিয়া যান, সেই শিক্ষার সুফল অদ্যাপি দেখা যাইতেছে।

সে যাহা হউক রামতনু বাবু হিন্দু কলেজে গিয়া এই সকল বন্ধুর মধ্যে পড়িলেন। তিনি বিনয়ী, তিনি বন্ধুদিগের পশ্চাতে লুকাইয়া থাকিতে চিরদিন ভাল বাসেন। তিনি বন্ধুদিগের পশ্চাতেই থাকিয়া চিরদিন কাজ করিতেছেন। কিন্তু তাঁহার চরিত্রের গুণে ও সাধুতার গুণে তাঁহার সকল বন্ধুই তাঁহাকে গুরুতুল্য শ্রদ্ধা ভক্তি করিয়া থাকেন।

১৮৩৪ সালে ইনি কলেজ হইতে বাহির হইয়া হেয়ার সাহেবের স্কুলে একটী কর্ম্ম পাইলেন। এইখানে তিনি দশবৎসর কর্ম্ম করেন। পরে ১৮৪৫ সালে কৃষ্ণনগর কলেজ খুলিলে সেখানকার একটী শিক্ষকের পদ পাইয়া সেখানে যান। হেয়ার স্কুলে ইনি একজন সামান্য শিক্ষক ছিলেন, কিন্তু তথাপি ইহাঁর চরিত্রের গুণে ইনি সকলের এতদূর প্রিয় ছিলেন, যে যখন ইনি হেয়ার স্কুল ছাড়িয়া যান তখন ইহাঁর বন্ধু বান্ধব একত্র হইয়া ইহাঁকে সম্মান করিবার জন্য এক সভা করেন, ঐ সভাতে তাঁহাকে ভালবাসা ও শ্রদ্ধার চিহ্নস্বরূপ একটী সোণার ঘড়ি দেওয়া হয়।

কৃষ্ণনগর হইতে ইনি বর্দ্ধমান স্কুলের হেড মাষ্টার হইয়া যান। সেখান হইতে উত্তরপাড়া স্কুলে, তৎপরে রসাপাগলা স্কুলে, তৎপরে বরিশাল স্কুলে বদলী হন। সর্ব্বশেষে ১৮৬০ সালে আবার কৃষ্ণনগর কলেজে বদলী হইয়া আসেন। সেখানে থাকিতে থাকিতে ১৮৬৫সালে পেন্সন্ গ্রহণ করিয়া কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন। ইহাঁর প্রতি কৃষ্ণনগরের লোকের এত ভালবাসা যে ১৮৫৪ কি ১৮৫৫ সালে তাঁহারা ইহাঁর এক প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করেন, তাহা এখনও কৃষ্ণনগরে আছে। পেন্সন্ লওয়ার পর অবধি ইহাঁর শরীরের অবস্থা বড় মন্দ। একে বৃদ্ধাবস্থা তাহাতে শরীর খারাপ; ইনি আর পূর্ব্বের ন্যায় উৎসাহের সহিত নানা কাজে যোগ দিতে পারেন না। সর্ব্বদাই বাড়ীতে থাকিতে

হয়। এইরূপে ইহাঁর জীবনের শেষ দিন কাটিয়া যাইতেছে। কিন্তু যদিও বয়সে ইনি প্রাচীন তথাপি উৎসাহে যুবা। এখনও ইহাঁর নিকট বসিলে কত সদুপদেশ পাওয়া যায়। ইহাঁর পবিত্র মূর্ত্তি দেখিলেই অসাধু মন সাধু হইয়া যায়। নিকটে দুই দণ্ড বস, কেবল ধর্ম্মের কথা, সাধুতার কথা শুনিবে। যেরূপ মনটী লইয়া যাইবে সেরূপ মনটী লইয়া আসিতে পারিবে না; মলিন মন ভাল হইয়া যাইবে। আমাদের দেশের একজন কবি এই মহাত্মার বিষয়ে বলিয়াছেন;—

"যাঁর সঙ্গে একদিন করিলে যাপন,
সাত দিন থাকে ভাল পাপাসক্ত মন।"

ইহা অতি সত্য কথা। ইহাঁর সঙ্গে আধ ঘণ্টা থাকিলেই অপবিত্র মন পবিত্র হইয়া যায়।

আমরা ইহাঁর অনেকগুলি সদ্‌গুণ দেখিয়াছি। প্রথম সদ্‌গুণ বিনয়। এমন বিনীত লোক প্রায় দেখা যায় না। ইনি মনে করেন যেন ইনি সকলের অধম। যদি কখনও কোন ব্যক্তির কোন দোষ বলিতে হয় তখন ইহাঁর বড়ই ক্লেশ হয়। বলেন "আমি নিজে কত দোষে দোষী আমার অপরের দোষ দেখান ভাল হয় না কিন্তু যখন জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন সত্য রক্ষার জন্য বলিতেছি" এইরূপ করিয়া অনেক কষ্টে অপরের একটী দোষের কথা বলেন। সর্ব্বসাধারণে যে সকল লোককে ঘৃণা করে তাহাদের যদি একটি গুণ দেখিতে পান ইনি সেই গুণের কত প্রশংসা করেন। এমন কি আমরা দেখিয়াছি যে ইহাঁর পৌত্রের বয়সী লোকের নিকটেও বিনয়ের সহিত কথা কহিতেছেন, যেন সে তাঁহাকে কত শিখাইতে পারে।

ইহাঁর দ্বিতীয় গুণ সরলতা ও সত্যপ্রিয়তা। এমন সত্যপ্রিয়-সরল লোক আমরা আর দেখি নাই। কপটতাকে ইনি অন্তরের সহিত ঘৃণা করেন। তাহার একটী দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। হিন্দুকলেজে পড়িবার সময় অবধি ইহাঁর জাতিভেদ ও পৌত্তলিকতার প্রতি অবিশ্বাস জন্মে। কিন্তু তার পর কয়েক বৎসর লোকের ও গুরুজনের অনুরোধে জাতি ও পৌত্তলিকতা রাখিয়া চলিতেন। বহু বৎসর পূর্ব্বে, বোধ হয় বর্দ্ধমানে কর্ম্ম করিবার সময় একদিন পৌত্তলিক ক্রিয়া অনুসারে কোন মৃত আত্মীয়ের শ্রাদ্ধ করিতেছিলেন, তখন একটী বালক দাঁড়াইয়া উপহাস করিয়া অপরের নিকট বলিতেছিল—"বাবুর এদিকেত বলা হয় আমি জাত মানি না, ঠাকুর মানি না কিন্তু এদিকে আবার শ্রাদ্ধটীও করা আছে।" এই কথাগুলি রামতনু বাবুর প্রাণে বাণের ন্যায় বিঁধিল। তিনি সেই দিন হইতে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে অকপট ভাবে নিজ বিশ্বাসের মত কাজ করিবেন। এই প্রতিজ্ঞা করিয়া জাতির চিহ্ন পৈতা পরিত্যাগ করিলেন। দেশে ভয়ানক হুলস্থুল পড়িয়া গেল। কিন্তু তিনি ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া সমুদায় সহ্য করিলেন। সেই অবধি ইনি সকল বিষয়েই সরল ও অকপট। লোকে রুষ্টই হউক আর তুষ্টই হউক যাহা সত্য বলিয়া জানেন ও বিশ্বাস করেন সেইরূপ বলিবেন ও করিবেন।

তৃতীয়তঃ—ইহাঁর ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ অতি আশ্চর্য্য, এমন আর দেখা যায় না। পাছে কোন কাজে কোন প্রকারে অন্যায় হয় এই ভয়ে সর্ব্বদাই জড় সড়। অধর্ম্মকে ইনি বড় ভয় করেন। সর্ব্বদাই বলেন—"ছেলে যদি মূর্খ হইয়া সৎ থাকে তাহা ভাল, কিন্তু শিক্ষা পাইয়া যদি অসৎ হয় সে শিক্ষা চাই না।"

চতুর্থতঃ—ঈশ্বরের প্রতি ইহাঁর প্রগাঢ় ভক্তি।

বড় বড় বিপদের সময় ইনি যে ভাবে পরমেশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া সুস্থির থাকিয়াছেন তাহা দেখিয়া লোকে অবাক হইয়া গিয়াছে। ঈশ্বরের গুণ কীর্ত্তন শুনিলে ইনি চক্ষের জল রাখিতে পারেন না।

এই সাধু পুরুষের বিষয়ে অনেকগুলি ভাল ভাল গল্প আছে, তাহা আর এক্কবারে দেওয়া যাইবে।

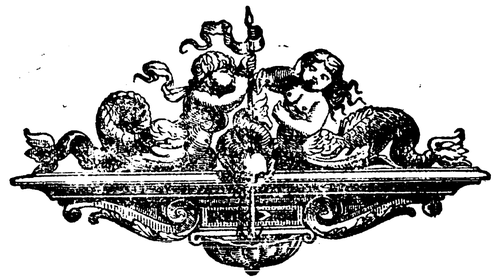

বালিকাদিগের বিশেষ পৃষ্ঠা।

সেলাই।
নং ২।

পাঠিকাগণ! সেবারে তোমাদের গলাবন্ধ বুনিবার বিষয় বলিয়াছিলাম, এবার ছোট মোজা বুনিবার বিষয় কিছু বলিব মনে করিতেছি। আশা করি আমি যাহা বলিব তোমরা তাহা একটু মন দিয়া শুনিতে চেষ্টা করিবে। ছোট মোজার যে ছবি এবার দেওয়া গেল এই ছবি দেখিয়া তোমাদের কেমন বোধ হইবে তাহা জানি না; কিন্তু আমি যখন ইহা প্রথম দেখিয়াছিলাম তখনই আমার এই রকম এক জোড়া মোজা বুনিবার ইচ্ছা হইয়াছিল।

ছোট ছেলেদের মোজা যত ফিকে রং দিয়া বুনা যায় ততই ভাল দেখায়, এজন্য আমরা ইহা সাদাতে ফিকে নীলেতে, সাদাতে ফিকে গোলাপীতে বা সাদাতে ফিকে লালেতে বুনিয়া থাকি। কখন কখন সাদাতে ঘোর গোলাপীতে, সাদাতে ঘোর নীলেতে কিম্বা সাদাতে ঘোর লালেতে ও যে না বুনি তাহা নয়, কিন্তু আমার বোধ হয় ফিকে রং দিয়া বুনিলেই কচি কচি ছেলেদের বেশী মানায়। মনে কর যে মোজাটির ছবি দেখিতেছ তাহা যেন সাদাতে আর ফিকে লালেতে বুনা হইয়াছে। আচ্ছা এখন বল দেখি ইহার কোন খানটায় লাল আর কোন খানটায় সাদা? যদি তোমাদের একটু বুদ্ধি থাকে তাহা হইলে নিশ্চয়ই বলিতে পারিবে; কিন্তু আমার যখন তোমাদিগকে পরীক্ষা করা উদ্দেশ্য নয় তখন আর তোমরা বলিতে পার কি না তাহা জানিবার জন্য অপেক্ষা করিলে চলিবে না, এজন্য আমি প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সমস্তই তোমাদিগকে বলিতেছি।

এই মোজা বুনিতে খানিকটা ফিকে লাল এবং খানিকটা সাদা পশম চেরা এবং পাঁচটা মোজা বুনিবার হাড়ের কাঁটা দরকার। প্রথমে লাল পশম দিয়া ৯৬টা ঘর তোল, এই ঘর গুলি সমান ৪ ভাগে ভাল করিয়া আরও ৩ টা কাঁটায় তুলিয়া লও তাহা হইলেই এক এক কাঁটায় ২৪টা করিয়া ঘর হইবে। ৪ কাঁটা দিয়া বড় মোজা যেরূপে বুনে এই মোজা ও সেই রূপে ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া বুনিতে হয় কিন্তু ইহাতে পাঁচটা কাঁটার দরকার কারণ ইহার ৪টা কাঁটায় ঘর লইতে হয় এবং ১টা কাঁটা দিয়া বুনিতে হয়।

প্রথম ও দ্বিতীয় বার—লাল পশম দিয়া উণ্টা।
৩বার—সাদা পশম দিয়া সোজা।

৪বার - সাদা পশম দিয়া *৪টা সোজা পশম সম্মুখে আনিয়া ১টাসোজা, ৩টা সোজা, ৩টা একসঙ্গে সোজা। আবার * চিহ্নিত স্থান হইতে আরম্ভ কর।

৫বার—সাদা পশম দিয়া সমস্ত সোজা; ৪ বারে যেখানে যেখানে ৩টা এক সঙ্গে সোজা বুনা হইয়াছে এবারেও সেখানে সেখানে ৩টা এক সঙ্গে সোজা বুনিতে হইবে।

৬বার—সাদা পশম দিয়া সমস্ত সোজা; কেবল ৫বারে যেখানে যেখানে ৩টা এক সঙ্গে সোজা বুনা হইয়াছিল এবারেও সেখানে সেখানে ৩টা এক সঙ্গে সোজা।

৭বার—সাদা পশম দিয়া সমস্ত সোজা; কেবল ৬বারে যেখানে যেখানে ৩টা এক সঙ্গে সোজা বুনা হইয়াছে এবারেও সেখানে সেখানে ৩টা এক সঙ্গে সোজা।

৮বার—সাদা পশম দিয়া সমস্ত সোজা। এখন একবার গুনিয়া দেখা আবশ্যক কতগুলি ঘর আছে, কারণ যদি ৪৮টা ঘর থাকে তাহা হইলে ঠিক হইয়াছে নতুবা ভুল।

৯বার—লাল পশম দিয়া সোজা।

১০বার—লাল পশম দিয়া উল্টা।

১১বার—লাল পশম দিয়া উল্টা।

১২বার—সাদা পশম দিয়া সোজা।

১৩ হইতে ৩০বার—সাদা পশম দিয়া ১টা ঘর উল্টা, ১টা ঘর সোজা।

৩১বার—লাল পশম দিয়া সোজা।

৩২ হইতে ৩৩বার—লাল পশম দিয়া উল্টা।

৩৪বার—সাদা পশম দিয়া সোজা।

৩৫বার—সাদা পশম দিয়া ক্রমাগত পশম সম্মুখে আনিয়া ২টা ঘর এক সঙ্গে সোজা।

৩৬বার—লাল পশম দিয়া সোজা।

৩৭ হইতে ৩৮বার—লাল পশম দিয়া উল্টা।

৩৯ হইতে ৪৭বার—লাল পশম দিয়া একবার ১টা উল্টা আর ১টা উপর দিক দিয়া উঠাইয়া লইতে হইবে, আবার তাহার পরের বারে পূর্ব্বে যেখানে উল্টা সেখানে উপর দিক দিয়া উঠাইয়া লইতে হইবে আর যেখানে উপর দিক দিয়া উঠাইয়া লওয়া হইয়াছে সেখানে উল্টা।

এখন পায়ের পাতার জন্য ১৮টা ঘর একটা কাঁটাতে উঠাইয়া লও এবং বাকি ৩০টা ঘর দুই ভাগ করিয়া দুইটা কাঁটায় তুলিয়া রাখ।

এতক্ষণ যেরূপ ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া বুনিতে হইয়াছে পায়ের পাতার জন্য সেরূপে বুনিতে হইবে না, এখন দুইটা কাঁটা দিয়া বুনিতে হইবে।

৪৮বার—লাল পশম দিয়া সোজা।

৪৯বার—লাল পশম দিয়া উল্টা।

৫০বার—লাল পশম দিয়া সোজা।

৫১বার—সাদা পশম দিয়া ক্রমাগত ১টা সোজা আর ১টা উল্টা।

৫৩ বার—সাদা পশম দিয়া ক্রমাগত একটা উপর দিক দিয়া উঠাইয়া লইতে হইবে আর উল্টা বুনিতে হইবে।

৫৪ বার—সাদা পশম দিয়া ক্রমাগত ১ টা উল্টা, ১ টা সোজা।

সাদা পশম দিয়া ৮২ বার পর্য্যন্ত, ৫১ বার হইতে ৫৪ বার পর্য্যন্ত যেরূপে বুনা হইয়াছে ঠিক সেইরূপে বুনিতে হইবে।

৮৩ বার—সাদা পশম দিয়া ৫১ বারের মত।

৮৪ বার—২ টা এক সঙ্গে উল্টা, ১ টা সোজা, ১টা উল্টা, ১ টা সোজা, ১ টা উল্টা, ১ টা সোজা, ১টা উল্টা, ১টা সোজা, ১টা উল্টা, ১টা সোজা, ১টা উল্টা, ২টা এক সঙ্গে সোজা।

৮৫ বার—সাদা পশম দিয়া ২ টা এক সঙ্গে উল্টা, ১ টা সোজা, ১টা উল্টা, ১ টা সোজা, ১ টা উল্টা, ১ টা সোজা, ২ টা এক সঙ্গে সোজা, ১ টা উল্টা, ১ টা সোজা, ১ টা উল্টা, ১ টা সোজা, ১ টা উল্টা, ২ টা এক সঙ্গে সোজা।

৮৬ বার হইতে একেবারে শেষ পর্য্যন্ত লাল পশম দিয়া।

৮৬ বার—সোজা।

৮৭ বার—১ টা সোজা, ২ টা উল্টা, ১ টা সোজা, ২টা উল্টা, ১টা সোজা, ২টা উল্টা, ১টা সোজা।

৮৮ বার—২ টা একসঙ্গে সোজা, ১ টা সোজা, ১ টা উল্টা, ২ টা একসঙ্গে সোজা, ১ টা উল্টা, ২টা সোজা, ১ টা উল্টা, ১ টা সোজা, ২টা এক সঙ্গে সোজা।

৮৯ বার—২টা এক সঙ্গে উল্টা, ১টা সোজা, ২ টা উল্টা, ১ টা সোজা, ২ টা উল্টা, ১ টা সোজা, ২ টা একসঙ্গে উল্টা।

৯০ বার—২টা একসঙ্গে উল্টা, ২ টা সোজা, ১ টা উল্টা, ২ টা সোজা, ২ টা একসঙ্গে উল্টা।

৯১ বার—৩ টা একসঙ্গে সোজা, ৩ টা সোজা, ২ টা একসঙ্গে সোজা।

৯২ বার—২ টা একসঙ্গে সোজা, ১ টা সোজা, ২ টা একসঙ্গে সোজা।

৯৩ বার—৩ টা একসঙ্গে সোজা।

৯৪ বার—যে ঘরটা আছে তাহার মুখ বন্ধ করিতে হইবে।

এখন পায়ের পাতার দুই ধারের ঘরগুলি বেশ করিয়া দুইটা কাঁটায় তুলিয়া লও। পূর্ব্বের যে ৩০ টা ঘর দুটা কাঁটায় উঠান আছে সেই দুই কাঁটার ঘর এবং এখনকার দুই কাঁটার ঘর সমস্ত একত্রে আবার ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া ১৬ লাইন ক্রমাগত একবার সোজা একবার উল্টা বুনিতে হইবে।

১৭ বার—সোজা; কেবল গোড়ালির শেষভাগের ঘর দুইবার দুইটা একসঙ্গে সোজা বুনিতে হইবে কারণ গোড়ালির দিকের ঘর ১৫ টা ১৫ টা করিয়া দুই কাঁটার আছে।

১৮ বার—উল্টা।

১৯ বার—সোজা, কেবল ১৭ বারে যেখানে যেখানে দুইটা একসঙ্গে সোজা বুনা হইয়াছিল এবারেও সেখানে ২ টা একসঙ্গে সোজা।

২০ বার—উল্টা।

এখন ক্রমাগত ৮ লাইন সোজা; কিন্তু পূর্ব্বে গোড়ালির শেষদিকে যেরূপ দুইবার করিয়া দুইটা একসঙ্গে সোজা বুনিয়া ঘর কমাইতে হইয়াছিল এবারেও ঠিক তার উল্টা দিকে অর্থাৎ পায়ের পাতার দুই ধারের ঘরগুলি যে দুই কাঁটায় আছে এক লাইন অন্তর সেই দুই কাঁটারই একেবারে শেষদিকের দুইটা ঘর একসঙ্গে সোজা বুনিতে হইবে। এইরূপে বুনা হইলে পর মোজার উল্টা দিকে অন্য মোজারও যেরূপে মুখ বন্ধ করিতে হয় এই মোজারও সেইরূপেই করিতে হয়।

এখন ৩৫ ও ৩৬ বার বুনাতে মোজার যে ফাঁক ফাঁক ঘর হইয়াছে সেই ঘরের ভিতর দিয়া যে যে পশম দিয়া মোজা বুনা হইয়াছে সেই সেই পশম একত্রে পাকাইয়া ছবিতে যেরূপ দেখিতেছ সেইরূপ করিয়া দিয়া তাহার দুই ধারে দুইটা পশমের থোপ করিয়া দিতে হইবে। এই থোপও যে যে পশমের মোজা সেই সেই পশম দিয়া করিতে হইবে।

ধাঁধা।

গতবারের উত্তর।

১।—নোনা (No = না)।

২।—মরণ।

৩।—বর—গোবর।

৪।—মেঘ।

৫।—শিশু।

নূতন।

১। ভট্টাচার্য্যগণ মোরে বলেন বানর,
স্ত্রীজাতিরা মোরে কিন্তু করেন আদর।
পুষ্প কভু পত্র কভু যন্ত্র রূপ ধরি,
আমার নিকটে কিছু নাহি রয় ভারি।
কোন নিরাকার ফুল সাকার হইলে পোষাক হয়?

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে মুদ্রিত এবং ২ নং বেনিয়াটোলা লেন, "সখা" কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

এপ্রেল, ১৮৮৫।

ঠাকুরদাদার গল্প।

শিশির।

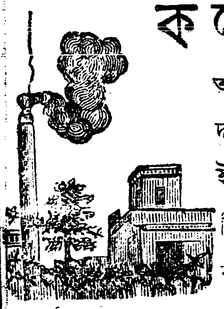

কয়েক দিন পরে বালকগণ আবার একত্র হইয়া ঠাকুর দাদার নিকট উপস্থিত হইল;—ইচ্ছা বেড়াইতে গিয়া কোন বিষয়ে কিছু নূতন শিক্ষা করিবে। নবীন বাবুও প্রস্তুত; সন্তুষ্ট মনে সকলকে সঙ্গে লইয়া মাঠে বেড়াইতে গেলেন। আজ কি বিষয়ে কথা হইবে? নবীন বাবু সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন "বায়ুতে যে সব জলকণা সাগর, হ্রদ, নদ, নদী, প্রভৃতি জলাশয় হইতে উঠিয়া অদৃশ্য বাষ্পাকারে থাকে, তাহাদের সম্বন্ধে কি কি বলা হইয়াছে? কোন্ কোন্ আকারে তাহাদিগকে দেখা যায়, মনে আছে কি?" সকলেই উৎসাহের সহিত বলিয়া উঠিল "হাঁ, আছে বৈ কি? কুয়াশা, মেঘ, বৃষ্টি, শিলাবৃষ্টি, তুষার, এই কয়েকটীর কথা বলা হইয়াছে।" তখন নবীন বাবু হাসিয়া বলিলেন "বেশ্। তোমরা সব কথা মনে রাখিয়াছ ত? (সকলে 'হাঁ') তবে এখন বল দেখি আর কিসের কথা বলা বাকী আছে? সকলে চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিল। মোহিতকৃষ্ণ চুপি চুপি গণেন্দ্রকে বলিল "কেন? শিশিরের কথা ত বলা হয় নি?" চারু ও কিশোরী হাস্য করিয়া বলিল "ছি মোহিত! তুমি দাদা বাবুকে লজ্জা কর? তাহ'লে শিখিতে পারিবে কেন? যাঁহার কাছে শিক্ষা করিব, তাঁহাকে কি লজ্জা করিলে হয়? তুমি ত বড় নির্ব্বোধ!" নবীন বাবু সকলকে শান্ত করিয়া বলিলেন "লজ্জা ও বিনীত ভাব একটু থাকা ভাল বটে, তবে কোনও বিষয়েই অধিক হওয়া উচিত নহে। সে যাহা হউক, অদ্য শিশিরের কথাই বলিব। হিম রাত্রে পড়ে, পাতা, ঘাস এই সকলেতেই বেশী পড়ে, গোলমাল করে না, ঝড় বহে না, তাই সকলে তাহাকে চিনে না, জানে না, মনে রাখে না। শিশির প্রতি দিন পৃথিবীর গাছের পাতা সকলকে কেমন স্নান করাইয়া দেয়, কেমন সুন্দররূপে ফুলের পাপড়ীর গায়ে অমৃতের ফোঁটার মত দুলিতে থাকে, যেন ছোট শিশুর পবিত্র সুকোমল সোণার নাকে রূপার নলক দুলিতেছে! আহা! তাহা দেখিলে কে না আশ্চর্য্য হয়! মোহিত হয়! একেবারে পরমেশ্বরের খেলা দেখিয়া ও প্রকৃতির শোভা দেখিয়া প্রাণ মন পাগল হইয়া উঠে! যথার্থ, যখন শীতকালে মাঠের সবুজবর্ণের ঘাসগুলি

শিশিরে ভিজিয়া যায়, তাহাদের মধ্যে মধ্যে মাকড়সার জাল গুলা যেন রূপার সূতায় প্রস্তুত মনে হয়;—এমন সময়ে পূর্ব্বদিক রক্তবর্ণ করিয়া সিন্দুর মাখাইয়া যখন সূর্য্য উঠিতে থাকেন, আর সেই রক্তিম আভা যখন ঐ শিশিরের গায়ে পড়ে—তখন, আহা! তখন যে কি এক চমৎকার শোভা হয়, তাহা বলা যায় না, কেবল দেখিলেই জানা যায়। তবে যে-সে চক্ষে তাহা বুঝা যায় না, হাসতে খেলতে ছড়ি হাতে করে বাবু-আনা করতে করতে, হতভাগা ছেলেদের মত বেড়ালে সেই অপরূপ শোভা দেখা যায় না। শান্ত ও ভক্তিপূর্ণভাবে, নম্রতা ও বিনয়ের সহিত, গম্ভীর অথচ প্রশান্ত, অনন্ত শোভার ভাণ্ডার প্রকৃতির দিকে চাহিলে,—চাহিয়া আশ্চর্য্যের সহিত নমস্কার করিলে, তবে প্রকৃতি তাঁর সেই গুপ্ত সুন্দর মনোহর রূপ দেখান। তা সে সকল এখন থাক্। শিশিরের শোভার কথা মনে এসে আমায় ভুলাইয়া দিয়াছিল। আমি ঐ সকল দেখিতে বাস্তবিকই পাগল হইয়া যাই। আহা! আহা! !" আর কথা বাহির হইল না। নবীন বাবুর দুটী চক্ষে দুফোঁটা জল দেখা দিল। অল্পক্ষণ সকলেই গম্ভীরভাবে পূর্ণ হইয়া চুপ করিয়া রহিলেন। তার পর নবীন বাবু বলিতে আরম্ভ করিলেন:—

"বৃষ্টি প্রভৃতি দ্বারা অনেক জলীয় বাষ্প কমিয়া গেলেও বায়ুতে সর্ব্বদাই কিছু পরিমাণে বাষ্প থাকিয়া যায়। আমাদের দেশে প্রায় কখনই এমন সময় আসে না যখন বায়ুতে একটুও বাষ্প থাকে না। হাজার বৃষ্টি হউক, ঝড় হউক, শিল পড়ুক, খানিকটা বাষ্প বাকী থাকিবেই থাকিবে। ঐ সময়টা খুব কমিয়া যায় বটে, কিন্তু একেবারে বাষ্পহীন কখনই হয় না।" অমূল্য জিজ্ঞাসা করিল "যখন খুব গ্রীষ্মের সময় ভয়ানক আগুনের হল্কার মত বাতাস বহে তখনও কি উহাতে জলীয় বাষ্প থাকে?"—নবীন বাবু উত্তর করিলেন—"তখনই আরও অন্য সময় অপেক্ষা বেশী থাকে। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, বায়ু যত শীতল হইবে ততই উহার বাষ্প জল হইয়া পড়িবে, আর যত অধিক গরম হইবে, ততই উহার মধ্যে অধিক পরিমাণে বাষ্প ধরিবে। সে কথা তোমাদের ভুলিয়া যাওয়া উচিত নয়। সেই জন্যই গ্রীষ্মকালে বায়ুতে বেশী বাষ্প মিশিয়া থাকে।"

মন্মথ:—"সে কি রকম হবে? তাহ'লে ত ঠাণ্ডা লাগিত?"

নবীন বাবু:—"না, তা হবে কেন? জল হলেই কি ঠাণ্ডা হয়? গরম জল কি ঠাণ্ডা? তা যদি না হয় তবে গরম বাষ্প ঠাণ্ডা হবে কেন? বায়ু যখন গরম হয়, তখন তাহার বাষ্পও গরম হয়, কাজেই ঠাণ্ডা লাগে না। বুঝিলে? (সকলে "হাঁ"।) আবার আর একটা কথা বলিয়া রাখি; তোমরা যে মনে কর শীতকালে বায়ুতে খুব বেশী বাষ্প থাকে, তা ঠিক নয়, বড় ভুল। বরং শীতকালেই বায়ু সর্ব্বাপেক্ষা বাষ্পহীন হয়। সে সময়ে বায়ু উত্তর দিক হইতে আসে। সে দিকে সাগর নাই কাজেই বাষ্প আনিবার সম্ভাবনা নাই। আর শীতকালে বাতাস শীতল, এজন্য উহার বাষ্প সবই প্রায় জমিয়া জল হইয়া যায়, কাজেই সে সময়ে বায়ুতে বেশী বাষ্প দাঁড়াইতে পায় না। আর কখন মনে করিও না যে শীতল হইলেই বাষ্প অধিক থাকে। বরং ঠিক তাহারই বিপরীত। গরম বাতাসে বাষ্প বেশী থাকে, ঠাণ্ডা বাতাসে বেশী বাষ্প থাকিতে পারে না, জল হইয়া যায়।"

কিশোরী—"কি আশ্চর্য্য! আমরা কি ভুলই ভাবিয়া রাখিয়াছিলাম! আজ বেশ শিক্ষা হইল।

আরও চাই, বলুন দাদাবাবু! শিশির তবে শীতকালেই বেশী পড়ে কেন? বাষ্পই যদি শীতকালের বায়ুতে কম রহিল আর গ্রীষ্মকালে বেশী রহিল, তবে গ্রীষ্মকালে শিশিরের নামগন্ধও নাই আর শীতকালেই বা এত শিশির কোথা হইতে পড়ে? এ ভারী আশ্চর্য্য মনে হচ্ছে। ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিন না?"

মন্মথ, অমূল্য, গণেন্দ্র, চারু, নগেন, চন্দ্র, দেবন—সকলে একেবারে গোল করিয়া বলিয়া উঠিল—"আমরাও ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম, কিশোরী আমাদের সকলেরই কথা বলিয়াছে। এখন বলুন, শুনি।"

ছেলেদের এ বিষয়ে বিশেষ আগ্রহ ও এরূপ উৎসাহ দেখিয়া নবীনবাবু মহা খুসী হইয়া বলিতে লাগিলেন—"আর সব কথাই সহজ। বৃষ্টিরও যে নিয়ম, শিশিরেরও তাই। বাষ্প হইয়া বাতাসে মিশিয়া আছে, দেখা যাইতেছে না, হঠাৎ যে কোন কারণে যেই শীতল হইল, অমনি জল হইয়া দেখা দিল। এখন দেখ শীতকালেও বায়ুতে কিছু বাষ্প থাকে, তার উপর আবার দিনের বেলায় সূর্য্য যে উত্তাপ দিতে থাকেন, তদ্দ্বারা জলাশয় সমূহ হইতে অনেক বাষ্প উঠে। এইরূপে সন্ধ্যার সময়ে বা কিছু পূর্ব্বে বায়ুতে অনেক পরিমাণে বাষ্প জমা হয়। অন্য সময় হইলে উহা বাষ্প হইয়াই থাকিয়া যাইত, কিন্তু তাহা আর হইতে পাইল না। কারণ বায়ু শীঘ্রই খুব শীতল হইয়া যায় আর ঐ বাষ্প প্রায় সবই জল হইয়া পড়ে। সূর্য্য যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ সকল বস্তুই গরম হয়, জলও গরম হয়, হইয়া বাষ্প হইয়া উপরে উঠে, বায়ুতে মিশে যায়। এই বায়ু যখন আবার শীতল হয়, তখন আর বাষ্প ধরিয়া রাখিতে পারে না। শীঘ্রই ইহা জল হইয়া যায়। এই জলকে শিশির পড়া বলে।

"এই সময়ে গরম হওয়া সম্বন্ধে দু একটা নূতন কথা বলিয়া দিই মন দিয়া শুনিবে। বড় শক্ত কথা এগুলি, খুব মন দাও। যত বস্তু আছে সকলেরই "তাপ-গ্রাহিতা" শক্তি আছে অর্থাৎ সকল দ্রব্যই তাপ দিলে উত্তপ্ত হয়, তার মধ্যে খানিকটা গরম প্রবেশ করে। তাপ যে কি, তাহা এখন বলিব না, তবে মোটামুটি এই জানিয়া রাখ যে সব জিনিষ তাপ দিলে গরম হয়। কোন বস্তু অনেক তাপ দিলে তবে গরম হয় আবার অন্য কোন বস্তু তাপ দিলেই শীঘ্র গরম হয়। মনে কর যেমন লৌহ প্রভৃতি ধাতু গুলি শীঘ্র তাতিয়া উঠে, জল তত শীঘ্র গরম হয় না। এখন বেশ বুঝিলে? সব জিনিষের তাপ-গ্রাহিতা শক্তি সমান নয়। এই গেল একটা কথা। আর একটা কথা এই যে সকল জিনিষেরই তাপ ছড়াইবার শক্তি আছে, অর্থাৎ কোন জিনিষ যদি গরম হয় তবে সেই তাপ সে সর্ব্বদাই চারি দিকে ছড়াইতে থাকে; নিয়ত, একটুও থামে না। ইহার নাম "বিকীরণ" শক্তি। এই শক্তি আছে বলিয়াই আমরা সূর্য্য হইতে উত্তাপ পাই, অগ্নি হইতে গরম পাই এবং গরম বস্তু হইতে গরম পাই। আর বাস্তবিকই এই শক্তি আগে তার পর তাপ-গ্রাহিতা শক্তি। কেননা বিকীরণ না হইলে তাপ পাইব কোথায় যে গ্রহণ করিব? বুঝিতেই পারিতেছ? (সকলে—"বেশ্"।) এই বিকীরণ অর্থাৎ তাপ ছড়াইবার শক্তি প্রত্যেক বস্তুরই আছে। তবে এখন আর একটা কথা বলি সেটা এই যে যে বস্তুর তাপ-গ্রাহিতা শক্তি যে পরিমাণে অধিক তাহার বিকীরণ শক্তিও সেই পরিমাণে অধিক। অর্থাৎ যে বস্তু যত শীঘ্র উত্তপ্ত হয় সে বস্তু তত শীঘ্র আবার শীতলও হইয়া পড়ে। লৌহ যেমন শীঘ্র গরম হয়, আবার তেমনি শীঘ্র ঠাণ্ডা হইয়া যায়। একথা তোমরা অনেকেই জান।

কড়াতে দুধ জ্বাল দেওয়া হইলে দেখিতে পার; ঐ দুধটা আর একটা পাত্রে ঢালিয়া কড়াটা খালি করিয়া রাখ, শীঘ্রই দেখিবে কড়া শীতল হইয়া গিয়াছে, কিন্তু দুধটা তখনও যেন আগুন। আবার গরম হবার সময়ে কড়ার আংটা দুটীতে যখন হাত দেওয়া যায় না এমনি গরম, দুধ গরম হইবার তখনও অনেক বিলম্ব। এ তোমরা আজই বাড়ী গিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিও। অর্থাৎ লোহার কড়া যত শীঘ্র গরম হয় তত শীঘ্র আবার শীতলও হয়, তাপ ছড়াইয়া বাহির করিয়া দিয়া ঠাণ্ডা হইয়া পড়ে। কিন্তু দুধ কম তাপ-গ্রাহিতা শক্তির জন্য গরম হইতে দেরী লাগে, আবার তেমনি জুড়াইতেও বিলম্ব হয়; এই তিনটী কথা মনে রাখিবে। আর একটী কথা আছে—যখনই তাপ গ্রহণ করে সেই সময়েই আবার তাপ বিকীরণও করে। অর্থাৎ সকল বস্তু সকল সময়েই তাপ গ্রহণ ও বিকীরণ করিতেছে। তবে যার বিকীরণ অপেক্ষা গ্রহণ বেশী হয় সে জিনিষটা গরম হয়, আর যার গ্রহণ অপেক্ষা বিকীরণ বেশী সেটা ঠাণ্ডা হয়। ঐ কড়ার দৃষ্টান্তই ধর। উহা যতক্ষণ আগুনের কাছে থেকে তাপ গ্রহণ করিতেছিল, ততক্ষণ কি কেবল গ্রহণ করিতেছিল, বিকীরণ কার্য্য কি তখন বন্ধ ছিল? তা নয়, বিকীরণ ও করিতেছিল। তা না হলে তাহার নিকটে হাত লইয়া গেলে গরম ঠেকিত না। (সকলে—"ঠিক") বেশ, দুটী কাজ এক সঙ্গে চলিতেছিল। কিন্তু বিকীরণ অপেক্ষা গ্রহণ অধিক করিতেছিল এজন্য তখন কড়া গরম বোধ হইল। আবার যখন নামাইয়া হাওয়ায় রাখা গেল, তখন কি কেবল বিকীরণ হইতেছিল, তাপ গ্রহণ করিতেছিল না? তা নয়। তবে তখন বিকীরণই প্রবল, এজন্য ঠাণ্ডা হইয়া গেল। বুঝিলে? আচ্ছা বল দেখি মোহিত! চারিটা কথা কি?"

মোহিত:—"১ম, সব জিনিষের তাপ গ্রহণ করিয়া গরম হইবার শক্তি আছে, উহার নাম তাপ-গ্রাহিতা শক্তি। ২য়, সব জিনিষেরই আবার তাপ ছড়াইয়া শীতল হইবার শক্তি আছে, উহার নাম তাপ-বিকীরণ শক্তি। ৩য়, যে বস্তুর তাপ-গ্রাহিতা শক্তি যত প্রবল, অর্থাৎ যাহা শীঘ্র গরম হয়, তাহার বিকীরণ শক্তিও তত প্রবল অর্থাৎ তাহা শীঘ্র আবার শীতলও হয়। ঠিক রাগের মত। কতকগুলা লোক শীঘ্র ঝাঁ ক'রে রেগে যায়, আবার ঝাঁ ক'রে রাগ প'ড়ে ও যায়; কিন্তু যাদের রাগ শীঘ্র হয় না, তাদের যদি রাগ হয় ত আর শীঘ্র পড়ে না। তেমনি যে বস্তুর তাপ-গ্রাহিতা শক্তি কম, গরম হইতে দেরী হয়, তাহার বিকীরণ শক্তিও কম, উহা শীতল হইতেও দেরী হয়। ৪র্থ, প্রত্যেক বস্তুই এক সময়ে তাপ গ্রহণ এবং বিকীরণ দুইই করে, তবে যাহা অধিক হয় তাহাই প্রকাশ পায়; যদি বিকীরণ অপেক্ষা তাপ গ্রহণ করে বেশী তবে উহা গরম হয়, নহিলে যদি গ্রহণের চেয়ে বিকীরণ বেশী হয় তবে শীতল বোধ হয়। অর্থাৎ ৫০ ভাগ তাপ গ্রহণ করিয়া যদি কোন বস্তু ১০ ভাগ মাত্র বিকীরণ করে তবে উহাতে ৪০ ভাগ তাপ থাকে তাই গরম দেখি কিন্তু তলে তলে যে দশ ভাগ বিকীর্ণ হইয়া গেল তাহা আর বুঝিতে পারি না এই রকম। নয় কি?"

নবীন বাবু আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন:—"মোহিত বেশ্ সুন্দর বুঝাইয়া দিল ত? তোমরা বলিতেছিলে মোহিত লাজুক। এই দেখ সে তোমাদের চেয়ে ভাল ছেলে। কেমন মন দিয়া শুনিয়াছে, কেমন দৃষ্টান্ত দুটী দিয়া বুঝাইয়া দিল। বেশ্ মোহিত! সে যাক্। এখন তোমরা সকলেই এই কয়েকটী কথা যদি মনে না রাখিতে পার তাহা হইলে আর শিশির পতনের কথা বুঝিতে

পারিবে না, বেশ্ মন দিয়া কথা কয়টী 'সখা'তে পড়িবে, আরও ভাবিবে, লোকের সঙ্গে এই বিষয় লইয়া আলাপ করিবে ও কথা বার্ত্তা কহিবে; তার পর বুঝিতে পারিয়া স্মরণ করিয়া রাখিবে। আজ এই পর্য্যন্ত থাকুক। আর এক দিন বাকী সমস্ত কথা বলিব। শিশিরের কথা এক দিনে শেষ হইবে না। আজ রাত্রি হইল বাড়ী যাই চল।"

সকলে আশ্চর্য্য ও নূতন কথা শিখিলেন বলিয়া আনন্দ করিতে করিতে ও কৃতজ্ঞতার সহিত ঠাকুর দাদার মুখের দিকে চাহিতে চাহিতে বাড়ী ফিরিয়া চলিলেন।

শেয়ালের গল্প।

নুষের মধ্যে নাপিত যেমন, পাখীর মধ্যে কাক যেমন, দেবতাদের মধ্যে নারদমুনি ঠাকুর যেমন ছিলেন, লোকে বলে জানোয়ারদের মধ্যে শেয়াল তেমন। শেয়াল পণ্ডিত; সে কালে তাহার কত প্রতাপই ছিল। কুমীরের সাত ছেলে; শুনিয়াছি সব গুলিকে না কি শেয়ালের নিকট পড়াইতে দেওয়া হইয়াছিল। শেয়াল-পণ্ডিতও স্ত্রীর সঙ্গে যুক্তি করিয়া সাত দিনে সাতটার সদ্গতি করিয়াছিল। তারপর কি হইল সকলেই জানে। কিন্তু পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে এখন আর শেয়ালের সে দিন নাই। ইস্কুলে যত মাষ্টারি খালি হয়, একটা শেয়ালকেও তাহাতে দরখাস্ত পাঠাইতে শুনি না। কত জায়গায় কত শক্ত মোকদ্দমা উপস্থিত হয়, এখন আর তাহার মীমাংসার জন্য শেয়ালের কাছে যাওয়া হয় না। তবুও শেয়ালের যাহা আছে তাহাতে নাম রক্ষার কাজ চলে।

শুনিয়াছি শেয়াল কুকুরের জাতি। হইতেও পারে; নহিলে তাহাদের মধ্যে এত শত্রুতা কেন? তা ছাড়া অনেক সময় কুকুর ঠিক্ শেয়ালের মতন ডাকিতে পারে; শেয়াল ও মাঝে মাঝে কুকুরের ভাষায় আলাপ করিয়া থাকে। শেয়ালের ডাক সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা কহিয়া থাকেন। অনেকে ঐ ডাকের অর্থ বেশ বুঝিতে পারেন। আমি বহু অনুসন্ধানে তিন প্রকারের ব্যাখ্যা সংগ্রহ করিয়াছি:—

১। প্রথম শেয়ালের পায় কাঁটা ফুটিল। সে কাঁদিল—"উঃ! আ!" দূর হইতে অন্য শেয়াল জিজ্ঞাসা করিল "ক্যা হুয়া?" গোল মাল শুনিয়া অন্যেরা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল "ক্যা-ক্যা-ক্যা-ক্যা হুয়া?" তার পর সকলে মিলিয়া কতক্ষণ "আহা" "আহা" করিল; শেষে আহত শেয়ালকে এই বলিয়া সান্ত্বনা করিল যে "হুয়া তো হুয়া!"

২। প্রথম শেয়াল বলিল "আরে ওয়া? হা হা-হা!" দ্বিতীয় শেয়াল জিজ্ঞাসা করিল "ক্যা হুয়া" উত্তর হইল "মৈ রাজা হুয়া"; শুনিয়া সকলে মিলিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল "আচ্ছা হুয়া!" "আচ্ছা হুয়া!"

৩। শেয়াল অন্য জন্মে তামাক খোর ছিল। অধুনা সে সুখ হইতে বঞ্চিত হইয়া ভয়ানক কষ্ট পাইতেছে। তাই প্রহরে প্রহরে সেই হুঁকো যন্ত্রের কথা তাহার মনে হয়; আর বেচারা ঘন ঘন 'হুঁক্কা' 'হুঁক্কা' শব্দ উচ্চারণ পূর্ব্বক মনের অভাব জানায়।

প্রতি প্রহরেই শেয়াল ডাকে তাহাতেই তাহাকে যামঘোষ উপাধি প্রদান করা হইয়াছে। শেয়ালের ডাক শুনিয়া এক রাজার মনে বড়ই কষ্ট হইল; তিনি মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "মন্ত্রী ওরা কি চায়?" মন্ত্রী বলিলেন "বড় খিদে পেয়েছে কিছু খাবার চায়।" অমনি হুকুম হইল ১০০০০৲ টাকার সন্দেশ কিনিয়া ওদের বাড়ী পাঠাইয়া দাও। ধূর্ত্ত মন্ত্রীর দশহাজার টাকা লাভ হইল। এক প্রহর পরে আবার শেয়াল ডাকিল। "এবারে কি চায়?" "বড় শীত, গরম কাপড় চায়।" হুকুম হইল লক্ষ টাকার বনাত কিনিয়া দাও। এক প্রহর পরে আবার শেয়াল ডাকিল। "এখন কি চায়?" "বড় মশা, মশারি চায়।" আরো লক্ষ টাকা মঞ্জুর। আবার এক প্রহর পরে শেয়াল ডাকিল "এবারে কি চায়?" "এবারে কিছু চায় না, মহারাজকে আশীর্ব্বাদ করে।" অমনি রাজা মহা সন্তুষ্ট হইয়া কোটি টাকা মূল্যের শাল মন্ত্রীকে দিয়াফেলিলেন।

শেয়ালের একটা দুর্ব্বলতা আছে। এক শেয়াল ডাকিলে আর গুলি চুপ করিয়া থাকিতে পারে না। আমার কোন বন্ধুর বাড়ীতে একটা শেয়াল খাবার খুঁজিতে আসিয়াছিল! স্বাভাবিক ধূর্ত্ততার সাহায্যে কেহ দেখিতে পাইবার পূর্ব্বেই সে একটা ঘরের ভিতর যাইয়া মাচার নীচে আশ্রয় গ্রহণ করিল। সেখানে কতক্ষণ ছিল বলা যায় না, কিন্তু সে সেখানে থাকিতে থাকিতেই জঙ্গলে একটা শেয়াল ডাকিল। অমনি আর কথা নাই, বেচারা দেশ কাল সব ভুলিয়া গিয়া সেই ঘরের ভিতর হইতেই "ক্যা হুয়া" "ক্যা হুয়া" প্রশ্ন করিতে আরম্ভ করিল। প্রশ্নের উত্তর আর জঙ্গল হইতে শুনিতে হইল না। বাড়ীর লোকেরা আসিয়াই সে বিষয়ে তাহার জ্ঞান পরিষ্কার করিয়া দিল।

শেয়ালের ধূর্ত্ততা সম্বন্ধে সকলেই কিছু কিছু জানেন। আমাদের একজন চাকর একবার একটা শেয়ালকে লক্ষ্য করিয়া ইট ছুড়িয়াছিল। দৈবাৎ ইটটা শেয়ালের কপালে লাগিল। লাগিবামাত্রই শেয়াল 'হিঁক্' শব্দ করিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। শেয়াল মরিয়াছে শুনিয়া সকলেরই আনন্দ। তাহাকে টানিয়া ওঠানে আনিয়া সকলে বৃত্তাকারে তাহার চারিদিকে দাঁড়াইলেন। অনেক মন্তব্য প্রকাশের পর একজন বলিলেন "আমার সন্দেহ হয়, এটা মরে নি।" এবিষয়ে কিঞ্চিৎ তর্ক বিতর্ক হইল, তারপর একজন বলিলেন "অত কথায় কাজ কি, একটা লাঠি এনে ঘা মেরে সন্দেহ দূর করে দাও না?" এই বলিয়া তিনি লাঠি আনিতে চলিলেন। তিনি চলিয়া যাওয়াতে যে একটুকু ফাঁক হইয়াছিল, শেয়ালটাও সময় বুঝিয়া সেই খান দিয়া চম্পট করিল।

এক পাদ্রী সাহেব পাড়া গাঁয়ে থাকিতেন। সেখানে শেয়ালের বড় অত্যাচার; তাঁহার সবগুলি মুরগী খাইয়া ফেলিত। সাহেব উপায়ান্তর না দেখিয়া খুব শক্ত একটা কাঠের ঘর করিলেন, তাহার ভিতরে মুর্গী রাখিয়া দরজা বন্ধ করিয়া রাখা হইত। একদিন সাহেবের চাকরাণী মুর্গীর ঘরে যাইয়া দেখে, যে একটা শেয়াল ঘরের ভিতর আসিয়া প্রায় সবগুলি মুর্গী মারিয়া ফেলিয়াছে। কেবল কয়েকটী মাত্র প্রাণভয়ে উপরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। সে গুলিকেও উদরসাৎ করিবার জন্য চেষ্টায় আছে। চাকরাণীকে দেখিয়াই ধূর্ত্ত শেয়াল মৃতপ্রায় হইয়া রহিল। সাহেব আসিয়া শেয়ালকে মৃতপ্রায় দেখিলেন এবং তাহার একটু আহ্লাদের বিষয় এই হইল যে খাইতে খাইতে পেট ফাঁপিয়া শেয়ালটাও মরিয়া গিয়াছে। এখন তাহার প্রেতাত্মার উদ্দেশে ইচ্ছামত গালিবর্ষণ করিয়া

তাঁহাকে অনেক দূরে মাঠে ফেলিয়া দিয়া আসা হইল। যিনি ফেলিয়া দিতে গিয়াছিলেন তিনি একবার পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখেন যে শেয়ালটা দৌড়িয়া পলাইতেছে!

সংকেত।

মার মনের ভাব উপরের তিনটী কথায় হয়তো অনেকে স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছেন না। মুখে কথা না বলিয়া অন্য কোন চিহ্ন বিশেষ দ্বারা মনের ভাব প্রকাশ করার নাম সংকেত—অর্থাৎ আমি এ প্রস্তাবে যতবার সংকেত কথাটা ব্যবহার করিব ততবারই ঐরূপ বুঝিতে হইবে।

কোন না কোন আকারে সংকেত সকল স্থানেই প্রচলিত আছে। আমরা দিনের মধ্যে কতবার সংকেতের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকি! বন্ধু আসিয়া একটা কিছু করিতে অনুরোধ করিলেন, তুমি মাথা নাড়িলে; আমি তোমার উপর চটিয়া গিয়া ভয় প্রদর্শন করিলাম, তুমি মুখে কিছু না বলিয়া অঙ্গুলি বিশেষ উন্নত করতঃ আমাকে হনুমানের খাদ্য খাইতে বলিলে; ইত্যাদি, আর কত বলিব। এ সকলই সংকেত। এই প্রকারের সংকেত সকলেই কিছু কিছু ব্যবহার করিয়া থাকেন।

ইংলণ্ডে বোবা এবং কালারা এইরূপ সংকেতের সাহায্যে মনের ভাব প্রকাশ করিয়া থাকে। হাতের এক এক প্রকার ভঙ্গি করিয়া তাহারা ইংরাজি বর্ণমালার এক একটা অক্ষর বুঝায়। অক্ষর হইলে আর শব্দ রচনা শক্ত থাকে না। আমাদের দেশেও আছে।

"অহি, কুম্ভ, চক্র, টঙ্কার, তরল, পবন, যাতা।"

হস্ত থাকিতে কেন মুখে কথা বলি। অর্থাৎ সাপের ফণার মত করিয়া হাত তুলিলেই একটী স্বরবর্ণ বুঝাইবে। এক হাতের মুষ্টির উপর আর এক হাতের মুষ্টি রাখিয়া কুম্ভের অনুকরণ (!!!) করিলেই ক বর্গের একটী অক্ষর বুঝাইবে। হাত ঘুরাইয়া চক্র, বাতাসে টোকা দিয়া টঙ্কার, হাতে বাতাসে ঢেউ তুলিতে চেষ্টা করিয়া তরল, পাখার কার্য্য হাতে করিয়া পবন, ও হাতে হাতে চাপিয়া যাতা করিলে, আর চবর্গ, টবর্গ, তবর্গ, পবর্গ, যবর্গ (য, র, ল, ব, শ, ষ, স, হ, ক্ষ ইত্যাদি) সকলই ক্রমান্বয়ে হইতে লাগিল।

স্বরবর্ণ বলিয়া পাঁচ আঙ্গুল দেখাইলে পঞ্চম স্বরবর্ণ (উ) বুঝাইল, পবর্গ বলিয়া ও আঙ্গুল দেখাইলে আর পবর্গের তৃতীয় বর্ণ (ব) বুঝাইল। ইত্যাদি। একটা শব্দ শেষ হইয়াছে ইহা বুঝাইতে হইলে হাততালি দিতে হয়। সুতরাং প্রত্যেক শব্দের শেষে হাত তালি পড়িবে।

প্রচলিত টেলিগ্রাফের অধিকাংশই সাংকেতিক। জাহাজের লোকেরা নানা প্রকারের নিশান ব্যবহার করিয়া সাংকেতিক আলাপ করিয়া থাকে। কখনও বা একটী মাত্র নিশান হাতে লইয়া, তাহাকে নানা প্রকারে নাড়িয়া সংকেত করা হয়। কখন মাথার টুপী হাতে করিয়া তদ্বারা সংকেত করা হয়। আরো এত প্রকারে সংকেত করা হয় যে কি বলিব। কোন সময় এত দূরের লোককে সংকেত হয় যে এ সকল কিছুই তত দূর হইতে দেখা যায় না। তখন খুব উচ্চ জায়গায় ঘর করিয়া তাহার একটা দিক কেবল খড়খড়ি দ্বারা বদ্ধ করা হয়। ঘরের ভিতরে আলো থাকে। খড়খড়ি খুলিলে সেই আলো অনেক দূর হইতে দেখা যায়। খড়খড়ি খুলিয়া কিছুকাল পর বদ্ধ করিলে এক প্রকার সংকেত বুঝায়, আর খুলিয়া অমনি বদ্ধ করিলে অন্য প্রকারের সংকেত বুঝায় এই দুই প্রকারের সংকেত দ্বারা সব অক্ষর বুঝান যাইতে পারে। খড়খড়ি ওয়ালা ঘরের পরিবর্ত্তে অনেক সময় খুব উজ্জ্বল আলো ব্যবহার করা হয়। তখন তাহাকে একখানা তক্তা দ্বারা ঢাকিয়া ফেলিলেই কাজ চলে। সংকেত করিবার সময় তক্তা খানা সরাইতে হয়, তবেই আলোটা দেখা যায়। তক্তা সরাইয়া অল্পক্ষণ রাখিলে একপ্রকার সংকেত আর অধিকক্ষণ রাখিলে অন্য প্রকার সংকেত বুঝায়।

সংকেতের কথা আমরা শেষ করিলাম। টেলিগ্রাফে যে সংকেত ব্যবহার করা হয় তন্মধ্যে মর্স সাহেবের সংকেত প্রণালীই অধিক প্রচলিত। মর্সের টেলিগ্রাফের সংকেত এই প্রণালীতে করা হয়। মর্সের টেলিগ্রাফে টাক্ টিক্ করিয়া শব্দ হয়, তাহার হ্রস্বতা ও দীর্ঘতা অনুসারে দুই প্রকারের সংকেত হইতে পারে। শেষ যত প্রকার সংকেতের কথা বলা হইল, সব গুলিই কেবল হ্রস্ব দীর্ঘ লইয়া হইয়াছে। শব্দ কি আলোক অধিকক্ষণ থাকিলে তাহা দীর্ঘ, তাহার চিহ্ন (—) এই রূপ। অল্পক্ষণ থাকিলে তাহা হ্রস্ব, চিহ্ন (-) এইরূপ।

মনোহর ছবি।

শীলা এগার বৎসরের বালিকা, তাহার দাদার নাম প্রিয়নাথ, বয়স চৌদ্দ বৎসর। দুই ভাই বোনে এত ভাব যে কেহ কাহাকেও অধিকক্ষণ না দেখিয়া থাকিতে পারিত না। প্রিয়নাথ কিছু খাবার পাইলে আগে সুশীলাকে তাহার অর্দ্ধেক দিয়া অপর অর্দ্ধেক আপনি খাইত; সুশীলাও কিছু পাইলে দাদাকে না দিয়া খাইলে সুখ পাইত না। সকাল বেলা বিছানা হইতে উঠিয়া যখন দুই ভাই বোনে এক সঙ্গে বসিয়া এক মনে পড়াশুনা করিত তখন তাহাদিগকে দেখিলে সকলেরই চক্ষু শীতল হইত। প্রসন্ন বাবু যখন পাড়ায় ও গ্রামে সকলের মুখে আপন ছেলে মেয়ের গুণের কথা শুনিতেন তখন তাঁহার আহ্লাদের পরিসীমা থাকিত না।

একদিন বিদ্যালয় হইতে বাড়ী আসিয়া প্রিয়নাথ কোথাও সুশীলাকে দেখিতে পাইল না। খুঁজিয়া খুঁজিয়া দেখে সুশীলা তাহাদের ছোট বাগানে একটী বড় কামিনী ফুলের গাছের তলায় বসিয়া রহিয়াছে। সুশীলা তাহার ছোট ছোট দুখানি হাত জোড় করিয়া সজল নয়নে উপরদিকে চাহিয়া কি বলিতেছে। আজ তাহার কিসের দুঃখ যে সে এত কাঁদিতেছে? কেহ কি তাহাকে ধমকাইয়াছে বলিয়া সুশীলার অভিমান হইয়াছে? সুশীলার মত শান্ত ও ধীর মেয়েকে কি কেহ বকিতে পারে? সে যে ভুলিয়াও কোন অন্যায় করিতে জানে না। তাহার সেই কাঁদ কাঁদ নয়ন

দুটী, সেই কোমল ও সরল মুখ খানি দেখিলে আজ কাহার প্রাণ না গলিয়া যায়? প্রিয়নাথ সুশীলার দুটী একটী কথাও শুনিতে পাইল। সে কাতর ভাবে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেছে "হরি! শুনেছি তুমি বড় দয়াবান, দয়া করিয়া আমার পিতা মাতা ও ভ্রাতাকে সুখে রাখ, আমার বড় ভয় হয়, পাছে তাঁদের কাহারো অসুখ হয়, কাল থেকে মার যে মাথা ধরেছে, কি হবে ঠাকুর? তুমি ভাল ক'রে দাও। তোমার দয়াই সব সুখ দিতে পারে। দয়া ক'রে সকলকে ভাল রাখ।"

শুনিয়া প্রিয়নাথের মুখে কোন কথা বাহির হইল না, সে দেখিল সুশীলার ন্যায় গুণের ভগ্নী সকলের নাই। তাহার কাছে দাঁড়াইয়া তাহার মন যেন পবিত্র হইল, সে ভাবিল "এই বুঝি স্বর্গ! আমি কখনও এত আনন্দ পাই নাই, সুশীলার কাছে দাঁড়াইয়া আমার এত আনন্দ হইতেছে, না জানি ইহার মত ভক্তিভরে ঈশ্বরকে ডাকিতে পারিলে কত সুখ ও আনন্দ হয়।" ধন্য সুশীলা, তোমাকে কেহ না শিখাইলেও তুমি আপনাআপনি পরমেশ্বরকে ডাকিতে শিখিয়াছ। সেই দিন হইতে তাহারা দুই ভাই ভগিনী প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে সকল কায ত্যাগ করিয়া পরমেশ্বরকে কায়মনে ডাকিত। সেই দিন হইতে তাহারা দুই জনে কোন কষ্ট পাইলে পরম পিতার নিকট তাহা নিবেদন করিত। কিছুদিন পরে প্রিয়নাথের বড় পীড়া হইল, প্রিয়নাথ আর উঠিতে পারে না, আপনি খাইতে পারে না, এমন কি তাহার কথা কহিবার শক্তিও রহিল না। সুশীলা ভ্রাতার এই দশা দেখিয়া অত্যন্ত শোকাকুলা হইল। কিন্তু দুঃখে পড়িয়াও দাদার সেবা করিতে বিরত হইল না। তাহার আহার নাই, নিদ্রা নাই; যখনই দেখ, সুশীলা দাদার কাছে বসিয়া সেবা করিতেছে, রাত্রি জাগিয়া দাদাকে ঔষধ খাওয়াইতেছে। বারণ করিলেও সে রাত্রি জাগিতে ক্ষান্ত হইল না। ক্রমে ক্রমে প্রিয়নাথ আরোগ্য লাভ করিল বটে কিন্তু অত খাটিয়া ও অত্যাচার করিয়া সুশীলা নিজে পীড়িতা হইয়া পড়িল, পীড়িতা হইয়াও সে এক দিনের জন্য ঈশ্বরকে ডাকিতে বিরত হইল না। যখন সুস্থ ছিল, তখনও তাহার যেমন হাসি মুখ ছিল ঘোর অসুখের মধ্যে পড়িয়াও সেই সুন্দর ভাব নষ্ট হইল না। এত ক্লেশ যেন তাহার নিকট কোন ক্লেশ বলিয়াই বোধ হইত না। দেখিতে দেখিতে বালিকার অন্তিমকাল উপস্থিত হইল। বালিকাকে দেখিবার জন্য গ্রামের সকলেই একত্র হইলেন, তাহার সেই দশা দেখিয়া সকলেই কান্দিতে লাগিলেন। দাদাকে বাঁচাইতে পারিয়াছি এই ভাবিয়া মৃত্যু সময়েও সুশীলার মুখে আনন্দ দেখা গেল। ধন্য সুশীলা! আমরা তোমার ন্যায় বালিকা দেখি নাই। এমন বালিকাকে কাহার না ভাল বাসিতে ইচ্ছা হয়। এমন মনোহর ছবি ঘরে থাকে কাহার না সাধ হয়।

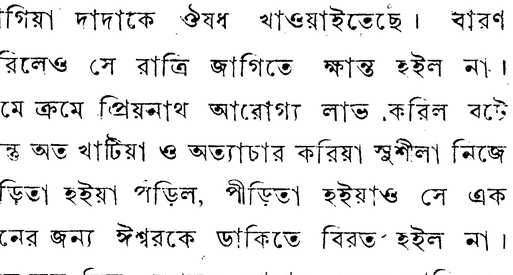

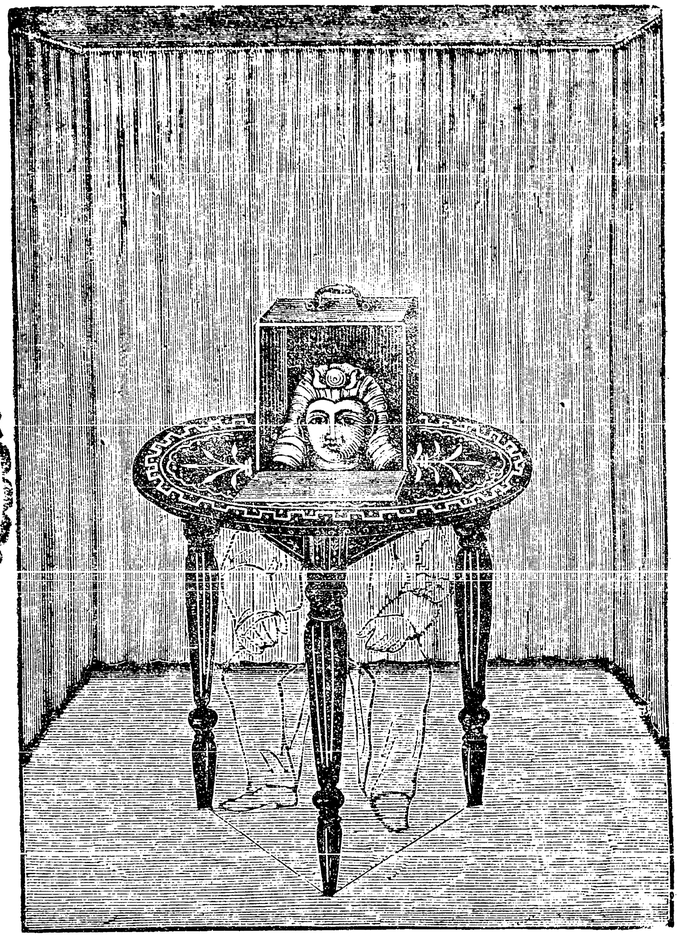

কাটামুণ্ডু কথা কয়।

একদিন বৈকালে কলুটোলা ষ্ট্রীট দিয়া বেড়াইতে যাইতেছি—দেখিলাম একটি বাড়ীর পাশের ছোট একটি একতালা ঘরের দুয়ারে একজন মুসলমান বসিয়া ঘণ্টা বাজাইতেছে এবং বলিতেছে 'কাটা মুণ্ডু কথা কয়, দেখে যাও, এক পয়সা'। শুনিয়া সেই স্থানে একটু দাঁড়াইয়া আছি এমন সময় একজন আপীষ ফেরতা বাবু ঘরের দুয়ারের পর্দ্দার আড়াল হইতে বাহির হইলেন। আমি তাঁহাকে ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম 'মহাশয়! ব্যাপারটা কি?' বাবুটী উত্তর করিলেন 'মহাশয়! অতি আশ্চর্য্য, প্রকৃতই কাটা মুণ্ডুতে কথা বলিতেছে।' আমি বলিলাম 'কাটা মাথায় কি প্রকারে কথা কহিবে।' তিনি বলিলেন 'যাহা স্বচক্ষে দেখিলাম তাহা কি আবার অবিশ্বাস করিতে হইবে। রক্ত গড়িয়ে পড়্চে, মহাশয়, বলেন কি? আপনার যদি সন্দেহ হয়

তবে একটা পয়সা খরচ ক'রে দেখে আসুন।' আমি দরজার লোকটাকে একটি পয়সা দিয়া গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম ঘরটী অত্যন্ত ক্ষুদ্র। সূর্য্যের আলোক প্রবেশ করিবার পথ নাই। কয়েকটী গেলাসের আলোতে ঐ ক্ষুদ্র গৃহটী কিয়ৎপরিমাণে আলোকিত হইয়াছে। দেখিলাম দ্বারের কিছু দূরে একটি সাদা কাপড়ের পর্দ্দা দ্বারা ঘরটী ছোট বড় দুই কামরায় বিভক্ত হইয়াছে। ঐ পর্দ্দাটী মেজে হইতে অনুমান দুই হাত উচ্চ। ঐ পর্দ্দার এক দিকে দর্শকেরা দাঁড়াইয়া দেখেন; অন্য দিকে মেজেতে একটি গোল টেবিল রহিয়াছে, তাহার সম্মুখের দিকের তিনটী পায়া ও তাহার উপর একটি কাঠের বাক্স দেখা যায়। এই কাপড়ের পর্দ্দার দ্বারা দুইটি কাজ হয়। প্রথমতঃ কোন দর্শক ঐ টেবিলের নিকটে যাইতে ও তাহার কোন দ্রব্য স্পর্শ করিতে পারেন না; দ্বিতীয়তঃ ঘাড় হেঁট করিয়া টেবিলের নিচু দিয়া টেবিলের পেছন দিককার ঘরের দেয়াল দেখা যাইতেছে কি না তাহা দেখা যায় না।

দর্শকেরা উপস্থিত হইলে টেবিলের উপরিস্থিত বাক্সটী উঠাইয়া লওয়া হয় এবং তাহার উপরে একখানা টিনের থালার উপর একটী রক্তাক্ত নরমুণ্ড দেখা যায়। একজন মুসলমান প্রশ্ন করিতেছে এবং টেবিলের উপরিস্থিত নরমুণ্ড উত্তর দিতেছে। নরমণ্ডের কথা বার্ত্তা শুনিয়া আমার নিশ্চয় বোধ হইল যে ঐ মুণ্ডই কথা কহিতেছে, অন্য কোন লুক্কায়িত স্থান হইতে কেহ কথা কহিতেছে না। একবার মনে করিলাম যে টেবিলের উপর এমন কোন শিল্প-কৌশল আছে যাহার মধ্যে শরীরটী লুক্কায়িত রহিয়াছে; কিন্তু বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম সেরূপ কিছুই নাই।

প্রিয় বালক বালিকাগণ! তোমরা কি কাটা মুণ্ডের কথা বলা দেখিয়াছ? যদি দেখিয়া থাক তবে তাহা কি প্রকারে হয় তাহা জান কি? এই বিষয়টী ভাল করিয়া বুঝিলে তোমরা জানিতে পারিবে যে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান শাস্ত্রের দ্বারা নানা রকম আমোদ জনক বিষয় প্রস্তুত হয়।

তোমরা সকলেই দর্পণে আপনাপন মুখ দেখিয়া থাক। এক খানা কাচের পিছনে পারা মাখাইলে দর্পণ প্রস্তুত হয়। যতক্ষণ কাচের পৃষ্ঠে পারা মাখান না যায় ততক্ষণ তাহার মধ্য দিয়া অপর দিকের পদার্থ সকল দেখা যায়। কাচের পৃষ্ঠে পারা মাখাইলে আর তাহার মধ্য দিয়া কোন পদার্থ দেখা যায় না কিন্তু তাহার সম্মুখে কোন বস্তু ধরিলে তাহার প্রতিবিম্ব দর্পণের উপরে পড়ে। প্রিয় পাঠক পাঠিকাগণ! বাজিকরেরা বিজ্ঞানের এই নিয়মটী লম্বন করিয়া কাটামুণ্ডের দ্বারা কথা বলাইতে পারে। উপরে যে টেবিলটির কথা বলিয়াছি ঐ টেবিলের সম্মুখে যে তিনটি পায়া আছে তাহাদের মধ্যে টেবিলের উপরের তক্তা হইতে মাটি পর্য্যন্ত বড় দুইখানি আয়না বসান আছে। ঐ আয়নার সম্মুখে যদি কোন পদার্থ থাকে, আয়নার উপরোক্ত নিয়মানুসারে তাহার প্রতিবিম্ব পতিত হয় কিন্তু ঐ আয়নার পেছনদিকে পারা মাখান থাকায় তাহার আড়ালে কোন দ্রব্য থাকিলে তাহা দেখা যায় না। আয়না দুখানি এমন কৌশলে বসান যে একটু দূর হইতে গেলাসের অল্প আলোকে আয়না যে আছে তাহা বুঝা যায় না। ঐ আয়না দুখানি পাশাপাশী সোজা বসান নহে; যে রকম বাঁকা করিয়া বসান তাহা উপরের ছবিতে দেখ।

বাজিকরেরা দর্শকদিগের বিভ্রম জন্মাইবার জন্য মেজেতে ঘাস এবং খড় ছড়াইয়া টেবিলের মধ্যস্থল হইতে প্রত্যেক আয়না যত দূরে আয়নার ঠিক তত দূরে সম্মুখে একটি গোল গেলাসে আলো দেয়। এইরূপ দুইখানি আয়নার সম্মুখে দুইটি গেলাস থাকায় তাহার প্রত্যেকটির প্রতিবিম্ব টেবিলের মধ্যস্থলে মেজের উপর পতিত হয় সুতরাং দর্শক আয়নার সম্মুখেই দাঁড়াইয়া ঠিক যেন দেখিতে পান যে টেবিলের নিচে ও বাহিরে সমস্ত মেজেতেই ঘাস বিস্তৃত এবং টেবিলের নিচে একটি আলো জ্বলিতেছে। গোল গেলাসে আলো দিবার কারণ বুঝিয়াছ কি? তোমরা যখন দর্পণে মুখ দেখ তখন দেখিয়া থাকিবে যে তোমার দক্ষিণ হাত ছবির বাম হাত, তোমার দক্ষিণ চক্ষু ছবির বাম চক্ষু অর্থাৎ তোমার উল্টা ছবি আয়নার উপরে নির্ম্মিত হইয়াছে। কেন এই প্রকার উল্টা ছবি হয় তাহা আমরা পরে বুঝাইয়া দিব। গোলাকার পদার্থ ভিন্ন আর সকল প্রকার পদার্থেরই দক্ষিণ বাম নির্দ্দিষ্ট করা যাইতে পারে; কেবল গোলাকার পদার্থের দক্ষিণ বাম নির্দ্দিষ্ট করা যাইতে পারে না, কারণ তাহার সকল দিকই গোল। অন্য আকৃতির আলোক দিলে পাছে দর্শক সম্পূর্ণরূপে না ঠকেন, কেহ দক্ষিণ বাম বিবেচনা করিয়া হঠাৎ ধরিয়া ফেলিতে পারেন এই জন্য চালাক বাজীকর গোলাকার গেলাস ব্যবহার করে।

এই প্রকারে দর্শকের দৃষ্টি বিভ্রম ঘটাইয়া বাজিকর আয়নার পেছনে বসিয়া টেবিলের উপরিভাগে একটি ছিদ্র দিয়া আপন মস্তক বাহির করিয়া দেয়। ঐ ছিদ্রের উপর এক-খানা মাঝখানে কাটা টিনের থালা আছে; এই থালা খানি মানুষের গলার মাপে গোল করিয়া কাটা; তাহার দুই অর্দ্ধ দুইদিক হইতে ঠিক জোড়া দিয়া দেওয়া হয় তাহাতে বোধ হয় যেন আস্ত থালা খানার উপর মুণ্ডটি রহিয়াছে। পরে কিয়ৎপরিমাণ কৃত্রিম রক্ত আলতা ও মেজেণ্টা দ্বারা প্রস্তুত করিয়া ঐ থালায় ঢালিয়া রাখে এবং মুণ্ডের গলদেশে মাখাইয়া দেয়। ঐ মুণ্ড অর্থাৎ লুক্কাইত মানুষ কথা কহিতে থাকে! বোধ হয় যেন কাটা মুণ্ড কথা কহিতেছে। দেখ দেখ কেমন মজা।

বালক বালিকাগণ! বিজ্ঞান শাস্ত্রে এই প্রকারের বহুবিধ আমোদের জিনিষ আছে। তাহার কতকগুলি আমরা ক্রমশঃ তোমাদিগকে শিখাইয়া দিব।

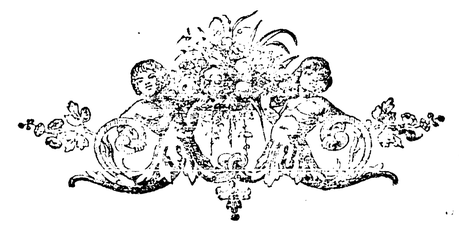

প্রাণ কাঁদা চাই।

আমাদের একজন বন্ধু সম্প্রতি এক গ্রামে স্কুল গৃহে রজনীতে শয়ন করিয়াছিলেন। রাত্রি অনেক হইয়াছে, স্কুলের ২।৩ খানি বেঞ্চ একত্র করিয়া তাহার উপর শুইয়াছেন। এজন্য ভাল ঘুম ও হইতেছে না, কাজেই আপন মনে শুইয়া শুইয়া কত কথা ভাবিতেছেন,—এমন

সময়ে কে যেন গুন্ গুন্ করিয়া বাহিরে গান করিতেছে শুনিতে পাইলেন। অল্পক্ষণ শুনিয়া মনে সন্দেহ হইল, বুঝি গান নহে। তখন আস্তে আস্তে উঠিয়া বাহিরে আসিলেন; আসিয়া দেখেন যে দুইটী স্ত্রীলোক, জীর্ণ শীর্ণ দেহ, কাঁদিতেছে; নিকটে গেলেন, কিন্তু তাহাদের জীর্ণ শীর্ণ দেহ দেখিয়া তাঁহার প্রাণ কেমন করিয়া উঠিল। কিছুক্ষণ কথা কহিতে পারিলেন না, বুক দুর দুর করিতে লাগিল। আহা! আহা! বুঝি ইহাঁরা পীড়িত। অসহায় অবস্থায় এখানে কি জন্য আসিল? এই সব চিন্তায় তাঁহার খুব দুঃখ হইতে লাগিল। কিন্তু কি করেন, জিজ্ঞাসা করিলেন। যাহা উত্তর পাইলেন, তাহাতে তাঁহার বুক ভাঙ্গিয়া গেল। অতি ক্ষীণ স্বরে স্ত্রীলোক দুটী উত্তর করিল—"মহাশয়! আমাদের যে ভয়ানক ক্ষুধা পাইয়াছে, তাহাতে আমরা এখনই মরিয়া যাইব। এতক্ষণ অজ্ঞানের মতন হইয়া ছিলাম এখন যেন সর্ব্ব শরীর কি করিতেছে, আর বাঁচি না। না খেয়ে খেয়ে আমাদের শরীরে আর কিছুই পদার্থ নাই।"

আমাদের বন্ধু জানিতেন যে সে গ্রামের চারিদিকে খুব দুর্ভিক্ষ হইয়াছে, সুতরাং তখনই বুঝিলেন যে ঐ দুটী স্ত্রীলোক দুর্ভিক্ষের জ্বালায় কাতর হইয়া ভিক্ষায় বাহির হইয়াছিল, হয়ত কোথাও কিছু না পাইয়া শেষ ক্লান্ত হইয়া ঐ স্থানে পড়িয়া মরিতে বসিয়াছে। কাল সকাল বেলা আর তাহাদের কেহ জীবিত দেখিতে পাইবে না, এমন অবস্থা হইয়াছে। রাত্রি তখন ১টা কিম্বা ২টা। এত রাত্রে কোথায় খাবার পাবেন? তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "সন্ধ্যা অবধি ত আমরা এখানে রহিয়াছি এতক্ষণ বল নাই কেন?" আহা! বলিবে কি? নিষ্ঠুর মানুষ!—যাহাদিগকে বলিয়াছিল, তাহারা দিল না, হয়ত তাহাদের কিছুই দিবার ছিল না। যাহা হউক হতাশ হইয়া ও মৃত্যু নিশ্চিত জানিয়া হতভাগিনী রমণী দুজনেই শীতে হিমে বাহিরে পড়িয়া গোঁ গোঁ করিতেছে। পাষাণ ও তাহাদের অবস্থা দেখিলে গলিয়া যায়। আমাদের উক্ত বন্ধুর চক্ষে আর জল ধরিল না, তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন, এবং ঐ হতভাগিনীদিগকে সাহায্য করিবার জন্য যথা সাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তত রাত্রে কার বাড়ী বা যাবেন? মনে করিলেন স্কুল ঘরটাই খুঁজিয়া দেখিবেন। তাহাই করিলেন, ঘরটীর চারিদিক আতিপাতি করিয়া খুঁজিলেন। এক কোনে এক গ্লাস দুধ ও একটু চিনি দেখিতে পাইলেন। ঐ খাবার টুকু পাইয়া তাঁহার যে কি আহ্লাদ হইল তাহা আর কি বলিয়া জানান যায়? আমাদের পাঠক পাঠিকাদের ত আর পাথরের চেয়েও শক্ত হৃদয় নয়; তাঁহারা নিশ্চয়ই এই হতভাগিনী স্ত্রীলোকদের এরূপ ভয়ানক দুঃখের কথা শুনিয়া কাঁদিতেছেন। এখন, সেই দুধ ও চিনি টুকু পাওয়াতে সকলেরই আনন্দ হইল। উহা কোথা হইতে আসিল? কে এই অন্ধকারে স্কুল ঘরে রাত্রি দুটোর সময়ে দুর্ভিক্ষ-পীড়িত মৃতপ্রায় দুটী লোকের জন্য দুধ চিনি দিয়া গেল? ভাবিলে ভক্তিতে আর কৃতজ্ঞতাতে প্রাণ ভরিয়া যায়। সন্ধ্যার সময়ে আমাদের ঐ বন্ধুর চা খাওয়ার জন্য ঐ দুধ চিনি আসিয়াছিল, ঘটনাক্রমে কোন কারণে তাঁহার উহা খাইতে মনে ছিলনা। ভাগ্যে এরূপ অভাবনীয় আশ্চর্য্য ব্যাপার হইয়াছিল, না হইলে সেই রাত্রে দুটী প্রাণীর মৃত্যু হইত, দুটী মানুষ—আমাদের মত দুটী প্রাণ, অনাহারে,—আহা! না খেতে পেয়ে,—বাহির হইত!

সেই দুধ আর চিনি টুকুতে একটু গলা ভিজাইয়া তাহারা যেন বাঁচিল, বাঁচিবার আশা হইল। তখন তিনি তাহাদিগের হাত ধরিয়া ঘরের মধ্যে আনিলেন, না হইলে শীতে তাহারা বাঁচিত না। ঘরে আনিয়া যত্ন করিয়া শোয়াইলেন। পরে প্রভাত হইলে সকলের নিকট ভিক্ষা করিয়া তাহাদিগকে খাওয়াইলেন। আহা! দীন হীন, দুঃখী অসহায় মৃতপ্রায় দুটী প্রাণী তাঁহার জন্য বাঁচিয়া গেল।

এইরূপে কত গ্রামে দুর্ভিক্ষের পীড়ায় যন্ত্রণা পাইয়া কত লোক যে, কত অসহ্য কষ্ট পাইতেছে তাহার ঠিক নাই? গবর্ণমেণ্ট অনেক সহায়তা করিতেছেন বটে, কিন্তু আমরা দেখিয়া আসিয়াছি ও আমাদের যে সকল বন্ধুরা নিয়ত ঐ সকল দীন দুঃখীদের দুঃখ দূর করিবার জন্য ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন তাঁহাদের মুখে ও শুনিতেছি যে শুদ্ধ গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে যাহা হওয়া উচিত তাহা হইতেছে না, এজন্য নানা স্থান হইতে নানা দেশ বিদেশ হইতে দয়ালু লোকে সাহায্য করিতেছেন। বর্দ্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া প্রভৃতি স্থানের চারিদিকে কত হাজার হাজার লোক যে যন্ত্রণা পাইতেছে তা মনে করিলে ও বুক ফাটিয়া যায়। সখার পাঠক পাঠিকাগণ! তোমাদের আর কি সাহায্য করিতে বলিব? তোমরা শিশু, পয়সা টাকা কোথা পাবে? তবে একটা কথা বলিতে পারি। সেটা এইঃ—যখন তোমাদের খাবার সময় হবে, তখন যেন সেই দীন হীনদের কথা মনে ক'রে একটু দুঃখ হয়, তাদের দুঃখে দুঃখী হ'লে, পরমেশ্বরের কাছে তাদের দুঃখ নিবারণের জন্য তোমরা প্রার্থনা করিলে ও তাহাদের মঙ্গল হবে। আর কিছু হউক আর না হউক, তোমাদের হৃদয়ের খুব উন্নতি হবে। রোজ একবার দুবার করিয়া তোমরা হতভাগ্য নরনারীর কথা চিন্তা করিও; রোজ বন্ধুদের সঙ্গে বসিয়া তাহাদের দুঃখ মোচন করিতে তোমরা পার কি না সে বিষয়ে পরামর্শ করিও। আর যদি কিছু পয়সা যোগাড় করিতে পার তবে আমাদের কাছে হউক বা বঙ্গবাসী কি সঞ্জীবনীর কাছে বা অন্য কোন স্থানে পাঠাইয়া দিও। দুঃখিত হওয়া চাই, প্রাণ কাঁদা চাই!

বসন্ত সঙ্গীত।

(১)

আইলাম আজ আমি এত দিন পরে,
বহুদিন থেকে সবে ডাকিতেছ মোরে,
মধুর তপন তাপ লইয়া সাথেতে
দেখরে এসেছি আমি জগৎ মোহিতে।

(২)

মলয় হইতে বায়ু বহিছে আমার,
কুঞ্জে কুঞ্জে কুসুম ফুটিছে অনিবার;
আমারে দেখিয়া যত তরু লতা রাজি,
সন্তাষে যতনে নানা ফল ফুলে সাজি।

(৩)

শীতকালে যেই বৃক্ষ মৃতপ্রায় ছিল,
মম আগমনে তারা জীবন পাইল,
ফুটিল শাখায় তার কুসুম সুন্দর,
মধুর গুঞ্জন তাহে করে মধুকর।

(৪)

দেখরে নিকুঞ্জ বনে কি শোভা ধরেছে,
পাতায় পাতায় ফুল কেমন ফুটেছে,
তদুপরে বিহঙ্গম সুমধুর রবে
পুলকে আমার বার্ত্তা জানাইছে সবে।

(৫)

ওই বসি পিক কুল গাছের শাখায়
গাইছে মধুর গীত শুনাতে আমায়;
ফুলের সৌরভ মাখি মৃদুল পবন
আমার বারতা লয়ে ধায় অনুক্ষণ।

(৬)

দেখরে চাহিয়া নদী কি শোভা ধরেছে
রূপের ছটায় যেন চমকি চলিছে,—
ফুটেছে তাহার পাশে সুরভি বকুল
সৌরভ পাইয়া তথা ধায় অলিকুল।

(৭)

দেখরে কানন মাঝে ফুল কত জাতি—
সুন্দর বরণ কিবা—ফোটে দিবা রাতি,
কোন স্থানে ফুটিয়াছে গোলাপ কলিকা,
শোভিতেছে কোন স্থানে চারু সেফালিকা।

(৮)

দেখরে চাহিয়া ওই পর্ব্বত ভেদিয়া
বহিছে ঝরণা কিবা দিক উজলিয়া,
ভাস্কর কিরণ রাশি পড়িছে তাহায়,—
কি সুন্দর শোভা আহা ধরিয়াছে তায়

(৯)

বালক বালিকা সবে আমারে দেখিয়া
মধুভাবে ডাকে মোরে আনন্দে মাতিয়া,
আমার সুন্দর ফুল তুলিয়া আদরে
পরিতেছে কত স্থানে কত যত্ন করে।

(১০)

বালক বালিকা তোরা আয়রে ছুটিয়া
আয়রে তোদের সাথে খেলিব বসিয়া;
আমার বিকাশ কালে তোমরা কখন
থেক না থেক না কেহ বিষাদে মগন।

(১১)

বালক বালিকা তোরা আয় ছুটে আয়,
বড় ভাল বাসি তোদের কোমল হৃদয়;
ক্রোধ, দ্বেষ, হিংসা আদি পরিহরি আয়;
দূর করি কুবাসনা আয় সবে আয়।

(১২)

যেই জন রচিলেন এ বিশ্ব ভুবন,
যাঁহার কৃপায় মোর এরূপ মোহন,
তাঁহার মহিমা গান আয় সবে গাই,
সরল হৃদয়ে আয় তাঁর পানে চাই।

ধাঁধা।

গত বারের প্রশ্নের উত্তর।

১। কপি।

২। (এইটীতে ভুল হইয়াছিল। "ফুল" (কথাটী "ইন্দ্রিয়" হইবে। ইহার উত্তর—"চোক;" চোক+আ=চোকা)

নূতন।

১। তিন বর্ণে নানারূপে করি বিচরণ,
সবার নিকটে আমি আদরের ধন।
দ্বিতীয় তৃতীয় বর্ণে করিলে মিশ্রণ
পশু হয়ে করি আমি কাননে গমন।
আদি অন্তে মিলাইলে কম্ম হয়ে যাই,
তৃতীয়ে ছাড়িলে আমি ক্ষুদ্র মুদ্রা হই।
সুবোধ তোমারি হাতে রহিয়াছি আমি;
চিনিতে পারিলে কিহে বল দেখি তুমি।

২। এক গৃহস্থের বাগানে এক সারিতে ৩৬টী আমের গাছ ছিল। ১ম গাছটীতে ১টী, ২য় টীতে ২টী, তৃতীয় টীতে ৩টী এইরূপে ৩৬শ টীতে ৩৬টী আম হইত। ঐ গৃহস্থ মৃত্যু সময়ে উক্ত ৩৬টী গাছ তাঁহার ছয় পুত্রদিগকে দিয়া যান এবং বলিয়া যান যে প্রত্যেকের ভাগে যেন ছয়টী করিয়া আম গাছ হয় এবং আমের সংখ্যাও যেন প্রত্যেকের সমান হয়। বল দেখি কে কোন্ কোন্ গাছ পাইবে?

মে, ১৮৮৫। বৈশাখ, ১২৯২।

নব বর্ষ।

মহা হর্ষ নব বর্ষ আস্‌ছে শিশুগণ!
কেমন মজা নূতন রাজা দিলেন দরশন।
রাঙ্গা রবি—সোনার ছবি—সরস হাসি হাসে,
বল্‌ছে সবায় "দেখ্‌বিত আয় নূতন রাজ আসে।"
সুবাস লয়ে ত্বরিত হয়ে মলয় পবন চলে,
"পাও হে চেতন, লোক সাধারণ! রাজা এলেন বলে"

পক্ষীগণে খুসী মনে গায় মঙ্গল গান,
কুসুম সুখে কোমল মুখে হাস্‌ছে খুলে প্রাণ।
সকল ধরা সুখে ভরা বিভুর মহিমায়;—
এল নূতন আদরের ধন, পুরাতন ঐ যায়।
দেখ্‌ছে সবে ভক্তিভাবে নববর্ষে চেয়ে,
তোমরা সবাই জাগ্‌বে কি ভাই নূতন জীবন লয়ে?

সময় গেলে রত্ন দিলে আর তো নাহি পায়,
অমন ধনে, অবোধ জনে, হেলায় হারায়।
গত বর্ষ গেল ওই চক্ষে দিয়ে ধুলো!
হা করিয়ে রইল চেয়ে অলস ছেলে গুলো।
দেখ দেখি কি ফাঁকিতে প'ড়ে গেল তারা,
শেখ দেখে এখন থেকে পাঠক পাঠিকারা।

পরাণপণে বিদ্যাধনে কর্‌বে উপার্জ্জন,
গরিব লোকে দয়ার চোকে দেখো সর্ব্বক্ষণ।
স্বার্থ আর অহঙ্কার দিস্‌না মনে ঠাঁই,
আত্মসুখে মত্ত হয়ে করিস্‌নে বড়াই।
কর চেষ্টা যাতে শেষটা পরম সুখে রবে,
তোমায় দেখে সকল লোকে "দেশের রতন" কবে।

নূতন বছর নয়নগোচর যাঁহার করুণায়,
এস সবে ভক্তিভাবে প্রণমি সে পায়।
মাগি ভিক্ষা করুন রক্ষা ভারত-বন্ধুগণে,
দেশের হিত সুসাধিত হউক দিনে দিনে।
দুর্ভিক্ষেতে এ বারেতে হ'ল বড় ক্লেশ,
সে হাহাকার না থাকে আর, বাঁচে যেন দেশ।
অধম তারণ কাঙ্গাল-শরণ পিতা দয়াময়,
দিউন শক্তি, তাঁতে ভক্তি সদাই যেন রয়।
তাঁর দয়াতে কুশলেতে থাক ভাই বোন্!
সুখী হও, সুযশ পাও, বিমল হউক মন!

হাসি, কান্না, কোন্‌টা ভাল ?

যার সুখ সেই হাসে ; আর যাহার দুঃখ সেই কাঁদে। তাই জিজ্ঞাসা করি ভাই পাঠক পাঠিকা যে বৎসর গেল ইহাতে তুমি বেশী হাসিয়াছ না কাঁদিয়াছ ? যে বালক বালিকা নিজের উন্নতি করিতে এবং অপর দশ জনের উপকার করিতে গত বৎসরের অধিকাংশ সময় কাটাইয়াছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই বলিবেন আমরা অধিক হাসিয়াছি।

আর যে সকল ছেলে নিজের উন্নতির কথা ভুলিয়া গিয়া দিন রাতি 'মজা' করিয়া কাটাইতে গিয়াছিলেন তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করিবার আগেই আমি বুঝিতেছি তাঁহাদের সুখ হয় নাই। ছবির দিকে একবার তাকাও দেখি। হাসির চেহারা গুলি দেখিতে ভাল, না—কান্নার চেহারা গুলি ? তবে যাহাতে, বছরের শেষে 'কি করিয়াছি' ভাবিতে বসিয়া মনের সুখে হাসিতে পার কেন সেই জন্য যত্নবান্ হও না ?

লীলার ভয়।

আজ লীলাবতীর বাবা ও মা কেহই বাড়ীতে নাই। বাবা কোন কাজে বাহির হইয়াছেন। লীলার মা তাঁহার এক বন্ধুর অসুখ হওয়াতে তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছেন। লীলার উপর বাড়ীর সমস্ত ভার। নলিনীকে ও খোকাকে রাখিতে হবে। মা বলিয়া গিয়াছেন "লীলা! বাড়ীর সমস্ত ভার তোমার হাতে রহিল, তুমি বাড়ী ছাড়িয়া কোথাও যাইও না; খুব সাবধানে থাকিবে যেন বাড়ীতে কেহ না আসে; নলিনী ও খোকাকে বেশ সাবধান করিয়া রাখিবে, আমি শীঘ্রই আসিব।" লীলা মাতার কথা গুলি মন দিয়া শুনিয়াছিল, ও তাহা পালন করিবে বলিয়া মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল। একাদশ বর্ষীয়া বালিকা লীলা আজ এ বাড়ীর গৃহিনী। সে নলিনীকে খাবার দিয়া, খোকাকে লইয়া খেলিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে বেলা চলিয়া গেল; যখন চারিদিক আঁধার হইয়া আসিল, তখন লীলাও আপন ঘরে প্রদীপ জ্বালিল। ভাইটীকে অনেক চেষ্টা করিয়া ঘুম পাড়াইল। নলিনীও ক্রমে ঘুমাইয়া পড়িল। লীলা এখন সেই নির্জ্জন ঘরে একাকী বসিয়া ভাই বোনকে পাহারা দিতে লাগিল। বেচারা লীলা অনেকক্ষণ ধরিয়া বসিয়া মার অপেক্ষা করিতেছে, আর পারে না। কে জানে কেমন একটা লুকান ভয় তাহার প্রাণকে কাঁপাইতে লাগিল। তাহার সমস্ত শরীর শিহরিয়া উঠিল। বুক দুর দুর করিতে লাগিল। বোধ হইতে লাগিল কে যেন পিছুতে বসিয়া আছে, সরিয়া দেখিল কেহই নয়। কি আপদ! লীলা আর কি করে? তবু বোধ হইতে লাগিল কে তাহার পিছনে। একে এই ভয় তাহাতে আবার কাহার চলন ফেরনের খস্ খস্ শব্দ হইতে লাগিল। আহা! লীলা অনেক সহ্য করিতেছে, আর পারে না। একবার একবার ইচ্ছা করিতেছে যে বাড়ী ছাড়িয়া দৌড়িয়া পলাইয়া যায়, কিন্তু মার কথা মনে জাগাতে তাহা পারিয়া উঠিতেছে না। বিষম পরীক্ষা। একদিকে ভয়ানক ভয়ে লীলার পা দুখানিকে টানিয়া লইয়া যাইতে চায়, আর এক-দিকে মার কথা তাহাকে ধরিয়া রাখে—অনেক কষ্টে এখন পর্য্যন্তও ভাই বোনের বিছানার পাশে বসিয়া আছে। হঠাৎ খট্ করে কি যেন খুলিবার শব্দ হইল, অমনি ভয়ে চীৎকার করিয়া লীলা লাফাইয়া উঠিল। চাহিয়া দেখে 'মিউ' 'মিউ' করিয়া তাহার বিড়ালটী শয্যা পার্শ্বে বসিল। এতক্ষণ পরে লীলাবতীর ঘাড়ে ভূত চাপিল। সে মনে করিল "৭টা বাজিল, মা বাবা কেহ আসিতেছেন না; আমি খিড়কি দরজা দিয়া বাহিরে গিয়া দেখি মা আসিতেছেন কিনা?" কাজেই ভাই বোনকে একাকী রাখিয়া খিড়কি দরজা খুলিয়া দেখিতে গেল। দ্বার খুলিয়া মাঠ পানে চাহিয়া রহিল। কতক্ষণ দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিল জন প্রাণীও তাহার চক্ষে পড়িলনা। অনেকক্ষণ দাঁড়া-ইয়া পা দুখানি ধরিয়া গেল, তবুও মা এলেন না। এতক্ষণ পরে তাহার চৈতন্য হইল। 'মা ত এলেন না; যাই তাদের দেখি হয়ত বাড়ীতে কোন চোর ঢুকিয়াছে।' এই বলিয়া সে যেমন সিঁড়ির কাছে আসিয়াছে, অমনি বাড়ীর ভিতর মানুষের পায়ের শব্দের মত 'খট' 'খট' শব্দ শুনিতে পাইল। কি সর্ব্বনাশ! যার কথা না শুনিয়া যাহা

হইবে বলিয়া ভয় পাইয়াছিল, হায় হায় তাহাই হইয়াছে। সর্ব্বনাশ! বাড়ীতে নিশ্চয়ই চোর ঢুকিয়াছে কোন সন্দেহ নাই। লীলা! কেন বাড়ী ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছিলে, এখন ভোগ কর। সে আর ভয়ে এক পাও অগ্রসর হইতে পারিল না। আস্তে সিঁড়ির তলায় লুকাইয়া—ঘরে কে ঢুকিয়াছে তাহাই দেখিতেছে। দেখিতে লাগিল বটে কিন্তু লীলাতে আর লীলা নাই—ভয়ে প্রায় চেতনা হারা হইয়াছে। যদিও শীত কাল তথাপি অত্যন্ত ঘামিতেছে, তাহার সমস্ত শরীর থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

লীলা দেখে বারাণ্ডার আলো ক্রমে ক্রমে ঘরের কাছে আসিতে লাগিল। দেখে একজন লোকে বাতি হাতে করিয়া তাহাদের বিছানার কাছে আসিতেছে। আর লীলা স্থির হইয়া থাকিতে পারিল না। সে পাগলের মত ছুটিয়া গিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া চীৎকার করিয়া বলিল "তুমি আমার ভাই বোনকে ছুঁতে পারবে না। আমি ছুঁতে দেবোনা। দেবো না।" লীলার কথা শুনিয়া লোকটী বলিয়া উঠিলেন "আরে! এই যে এখানে!" লীলা বুঝিল ইহা তাহার পরিচিত গলা; কিন্তু কাহার গলা তাহা তখন বুঝিতে পারিল না। তিনি আবার বলিয়া উঠিলেন "ওগো! লীলাকে কোথায় খুঁজিতেছ? এই যে লীলা! (লীলার প্রতি) কি মা! কোথায় ছিলে, আমরা তোমাকে সমস্ত বাড়ী খুঁজিয়া বেড়াইতেছিলাম!" লীলা বাবার মুখ পানে তাকাইয়া কাঁদিয়া ফেলিল। কিছুই বলিতে পারিল না। মাতা ঘরে আসিয়া লীলাকে কিছু শক্ত কথা শুনাইবেন ভাবিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার গায়ে হাত দিয়া দেখেন একেবারে ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে, মুখখানি নীলবর্ণ; কাজেই শক্ত কথা মুখ দিয়া বাহির হইল না। মা একটু তিরস্কার করিলেন। বকুনি খাইয়া লীলার চৈতন্য হইল, মুখ দিয়া একটী দুটী কথাও বাহির হইল।—"তুমি কোথা দিয়ে এলে, আমিত দেখিতে পাই নাই। আমি ৭টা থেকে পিছনের উঠানে দাঁড়াইয়া তোমায় তল্লাস করিতে ছিলাম।"

মাতা। এতক্ষণ! তুমি কি এখন এলে। আমি সাম্নের দরজা দিয়া আসিয়াছি। তোমার শরৎ মাসীমার অত্যন্ত অসুখ বাড়িয়াছে তাই এত দেরী হ'য়ে গেল। বড় ক্লান্ত হয়েছ, কিঞ্চিৎ আহার করিয়া শয়ন কর।

বাবা। আহা! লীলা আমার, ভাই বোনদের রক্ষা করিবার জন্য আমার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে গিয়াছিল।

লীলা লজ্জায় বাবার বুকের ভিতর মুখখানি লুকাইয়া ধীরে ধীরে বলিল "না বাবা আমার দোষ নাই, আমি একলাটী ছিলাম। কেহই আমার কাছে ছিল না, ভয় হবে না?"

পিতা গম্ভীরভাবে উত্তর করিলেন "না লীলা, একজন পরম দয়ালু বন্ধু তোমার অতি নিকটে ছিলেন, কিন্তু তুমি ভয়ে তাঁহাকে ভুলিয়া গিয়া-ছিলে। তাঁহাকে স্মরণ করিলে মা! তোমার আর ভয় থাকিত না। তিনি সর্ব্বদা তোমার নিকটে থাকিয়া তোমাকে রক্ষা করিয়াছেন। পাঠক পাঠিকাগণ! এমন সুহৃৎ কে তা কি বুঝিতে পারিয়াছ?

ঠাকুরদাদার গল্প।

শিশির

(পূর্ব্বের পর)।

একদিন প্রাতঃকালে সকলে বাগানে বেড়াইতে গিয়া স্থির করিলেন যে সেদিনকার শিশিরের কথার বাকী টুকু আজ শেষ করিয়া বুঝিতে হইবে। নবীন বাবুও উপস্থিত ছিলেন, সকলকে চারিদিকে বসাইয়া শিশিরের গল্প বলিতে লাগিলেন। প্রথমে সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন সেদিনকার কথা সকলের মনে আছে কি না? সে কথা সকলেরই স্মরণ ছিল। সুতরাং নূতন কথা আরম্ভ হইল।

মন্মথ বলিল—"আজ বলিয়া দিন, দাদা বাবু, শীতকালে বেশী শীতল বলিয়া বায়ুতে বাষ্প কম থাকিলেও শিশির বেশী পড়ে কেন? এ কথাটা পরিষ্কার করিয়া বুঝিতে হইবে।"

নবীন বাবু বলিতে লাগিলেন:—"আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি যে বায়ু কখনই একেবারে বাষ্প-হীন হয় না। একটু না একটু জলীয় বাষ্প তাহাতে থাকেই থাকে। শীতকালেও সূর্য্যের উত্তাপ থাকে, ঐ উত্তাপে নদী, হ্রদ, সাগরাদি হইতে জল বাষ্প হইয়া উঠে। আরও একটা নিয়ম আছে যে বায়ু যত শুষ্ক অর্থাৎ বাষ্পহীন হয়, ততই উহার বাষ্প লইবার শক্তি বাড়ে। অর্থাৎ কোন জলাশয়ের উপর দিয়া যদি একটী অধিক বাষ্প-বিশিষ্ট বায়ু-প্রবাহ চলিয়া যায় তাহা হইলে উহা ঐ জলাশয় হইতে যে পরিমাণে জল বাষ্প করিয়া লইয়া যাইবে, শুষ্ক বায়ু-প্রবাহ তাহার উপর দিয়া বহিয়া গেলে তাহা অপেক্ষা অধিক পরিমাণে জল বাষ্প করিয়া লইয়া যাইবে। এ অতি সোজা কথা। কাজেই ঐ দুটী কারণে শীতকালের দিনের বেলায় বায়ুতে অনেকটা বাষ্প জমা হয়। এবং ঐ বায়ু সকালে ও রাত্রের অপেক্ষা কিছু গরম বলিয়া উহার বাষ্পটা জমিয়া তখন জল হইতে পারে না। কিন্তু যেই সূর্য্য অস্ত যায়, তার সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর উপরের সমস্ত জিনিষ তাপগ্রহণ অপেক্ষা তাপ বিকীরণ বেশী করিতে থাকে, অমনি ঐ বায়ু তাহাদের গায়ে ঠেকিয়া ঠাণ্ডা হইয়া পড়ে। যেমন ঠাণ্ডা হয় অমনি ক্রমে ক্রমে দিনের বেলার সঞ্চিত বাষ্পগুলা সব জল হইয়া যায়। ঐ জল খুব ছোট ছোট কণার আকারে বায়ুতে ভাসিয়া বেড়ায় ও নিকটস্থ পদার্থ সকলে লাগিতে থাকে। ইহারই নাম হিম। শীতকালের রাত্রে সমস্ত বাতাসটাই এই হিম পূর্ণ হইয়া যায়, সে সময়ে বাহিরে এলে গা বরফের মত কন্ কন্ করিতে থাকে। বুঝিতে পারিয়াছ?"

নলিন বলিয়া উঠিল "না দাদা বাবু! আমি ভাল বুঝিতে পারি নাই। আমাকে যতক্ষণ না ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিবেন ততক্ষণ আমি আর বেশী বলিতে দিব না।"

নবীন বাবু একটু হাসিয়া বলিলেন "কেন? এর ভিতর ত আর কোন শক্ত কথা নাই। শক্ত কথা যা কিছু সে দিনই বলিয়া দিয়াছি। তুমি ত সেদিন শুনিয়াছ যে, সকল দ্রব্যেরই "তাপ-গ্রাহিতা শক্তি" আছে, কোন গরম জিনিষের নিকট এলেই গরম হবে। আবার তেমনি সকল জিনিষেরই "তাপ-বিকীরণ শক্তি" আছে, উহা থাকাতে গরম জিনিষ মাত্রই নিজের গরম

চারিদিকে ছড়াইয়া দেয়। (নলিন,—"হাঁ শুনিয়াছি।") তবে আর কি? যতক্ষণ সূর্য্য মাথার উপর ছিল, পৃথিবী ও তাহার উপরিস্থ সব সামগ্রী গরম হইতেছিল বা তাপ গ্রহণ করিতেছিল। তখনই আবার তাপ বিকীরণও করিতেছিল, কিন্তু খরচ অপেক্ষা জমা বেশী ব'লে, অর্থাৎ বিকীরণ অপেক্ষা সূর্য্যের নিকট হইতে অধিক তাপ গ্রহণ করিতেছিল বলিয়া, দিনের বেলা সব জিনিষ গরম হইয়াছিল। এখন গরম পৃথিবীর গায়ে লাগিয়া বাতাসও একটু গরম হইয়াছিল। সেই গরম বাতাসে উঠিয়া জলাশয় সকলের জল সূর্য্যের তেজে বাষ্প হইয়া ভাসিতেছিল। এই সব গেল দিনের বেলায়। সন্ধ্যা হইল, সূর্য্য অস্ত গেল, পৃথিবীর গা ঠাণ্ডা হইল, তাহার উপরের জিনিষও সব ঠাণ্ডা হইয়া পড়িল। এই সব ঠাণ্ডা জিনিষের গায়ে বাষ্প-শুদ্ধ ঐ গরম বাতাস যেই লাগিতে লাগিল, অমনি উহার বাষ্প জল হইয়া ঐ সব ঠাণ্ডা জিনিষের গায়ে শিশির হইয়া পড়িল। এইরূপে শীতল হইতে হইতে যখন পৃথিবীর নিকটের সমস্ত বাষ্পটাই একেবারে শীতল হইয়া গেল, তখন সমস্ত বায়ুতে যত জলীয় বাষ্প ছিল তার অনেকটাই শীতল হিম হইয়া পড়িল। এবং ঐ হিমময় বায়ু যেখানে লাগিল অমনি খানিকটা হিম তাহার গায়ে রাখিয়া যাইতে লাগিল। এই রকমেই ঘাসে, পাতায়, জানালার কাচে, শ্লেটে, সব স্থানে সকালে উঠিয়া শিশির ফোঁটা ফোঁটা দেখা যায়। প্রথমে যখন শিশির জমিতে থাকে তখন কিন্তু একেবারে ঐ রকম ফোঁটা ফোঁটা হয় না। প্রথমে একটু সাদা দাগের মত পড়ে। ঠিক ভাল চাকু ছুরীর ফলাতে মুখ হইতে হাই দিলে যেমন সাদা হইয়া যায়, তেমনি প্রথমে খুব গুঁড়ি গুঁড়ি বাষ্প জমিতে আরম্ভ হয়, তার পর ক্রমে যত বেশী জমে তত কতকগুলা একত্র হইয়া শেষে বড় ফোঁটা হইয়া পড়ে। তা বোধ হয় তোমরাই কত দিন দেখিয়াছ, পাতার গায়ে সাদা দাগের মত সব শিশির কণা স্থির হইয়া রহিয়াছে, যেই তুমি নাড়িলে অমনি একটার পর আর একটা একত্র মিলিয়া বড় বড় ফোঁটা হইয়া পড়িল। না?—(সকলে "ঠিক্ ঠিক্।") এইরূপে শীতকালের রাত্রে শিশির পতন হয়। যথার্থ ধরিলে কিন্তু শিশির পড়ে না, বৃষ্টির মত ঝুপ্ ঝাপ্ করিয়া কখন পড়ে না। শিশির হয় বা জমে বলিলেই ঠিক বলা হয়। কেন না, বৃষ্টি যখন পড়ে, তখন কেবলই পড়ে, কোন দিকে চায় না, বাতাস ঠাণ্ডা হ'ল কি না, পৃথিবীর উপরকার জিনিষগুলা এখনও গরম আছে কি না, এ সব কিছুই দেখে না। উপরের বাতাস শীতল হইল, বাষ্প সব জমিয়া গেল, জলবিন্দু হইয়া ভারী হইল, আর অমনি হু হু করিয়া এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গেল। শিশির ত সে রকম নয়। শিশির উপরের বায়ুতে নয়, পৃথিবীর নিকটেরই বায়ুতে বাষ্প হইয়া এতক্ষণ ছিল, যেই দেখিল ক্রমে সুবিধা হইতেছে, সব জিনিষ ঠাণ্ডা হইতেছে, অমনি তাহাদেরই গায়ে লাগিয়া তাহাদেরই গায়ে জলবিন্দু হইয়া শিশির হয়। কাজেই তাহাকে আর শিশির পড়া বলা যায় না। শিশির বরং ঠাণ্ডা জিনিষের গায়ে বাতাস থেকে জমে বা হয় বলিলেই উচিত কথা বলা হয়।"

নলিন:—"হাঁ দাদা বাবু! এইবার আমি বেশ বুঝেছি। আর আমি যখন বুঝেছি, তখন আর কেহ বুঝিতে বাকী নাই।"

অমূল্য:—"আচ্ছা! শীতকালে যেদিন মেঘ

করে সেদিন রাত্রে কিছু শিশির হয় না কেন? আমার ঠোঁট ফেটে গিয়েছিল, মা বল্লেন যে শিশির দিলে ভাল হবে। আমি ভোরে উঠিয়া শিশির খুঁজিবার জন্য কত পাতা, ঘাস, ফুলগাছ ঘুরিলাম কোথাও দেখিতে পেলাম না। তখন মাকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন 'মেঘ হইলে শিশির পড়ে না।' আমি তখনই আপনাকে এ কথাটা জিজ্ঞাসা করিব মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু মনে ছিল না, হঠাৎ আজ মনে পড়িল; বলিয়া দিন্ না?"

কিশোরী বলিল "তাইত? ঠিক কথা; শীতকালে যে দিন মেঘ করে সেদিন হিম পড়ে না বটে।" আর আর সকলেই এই কথার সায় দিল। ঠাকুর দাদা বলিতে আরম্ভ করিলেন।

"যে দিন মেঘ হয় সে দিন যথার্থই কিছু শিশির জমিতে পায় না, কেন—বলিতেছি। বলিবার পূর্ব্বে কিন্তু আর একটা কথা বুঝান আবশ্যক। কি শীত, কি গ্রীষ্ম সব কালেই যেদিন মেঘ হয় সেদিন বড় গরম হয়,তা বোধ হয় সকলেই জান। এক এক দিন এমনি গুমোট হয় যে প্রাণ আই ঢাই করিতে থাকে, মানুষকে অস্থির করিয়া তুলে। আবার যখন সন্ধ্যার সময় একটু বায়ু বহিয়া মেঘগুলাকে সরাইয়া দেয়, কিম্বা এক পশলা বৃষ্টি হইয়া মেঘ কাটিয়া যায়, তখন প্রাণ বাঁচে, ঠাণ্ডা হয়। কেমন? (সকলে "এ কে না জানে?") বেশ, কেন হয় বল দেখি? নিশ্চয়ই জান না। আমি বলিতেছি শুন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে সব জিনিষ একই সময়ে তাপ গ্রহণ ও বিকীরণ উভয়ই করে। মনে আছে। পৃথিবী ও সূর্য্যের নিকট হইতে দিনের বেলা তাপ গ্রহণ করিতে থাকে, আবার তখনই খানিক খানিক তাপ বিকীরণও করিতে থাকে। কেমন করিয়া জানিতে পারি? আচ্ছা, মনে কর এই গ্রহণ হইতে বিকীরণের তাপ বাদ দিলে যা বাকী থাকে দিনের বেলা আমরা সেই টুকুই অনুভব করিতে পাই; যে টুকু চলিয়া যায় সে টুকুও অনুভব করি না, আর যে তাপটা সূর্য্য হইতে আসে তারও সবটা পাই না। বিকীর্ণ হইয়া যেটা বাকী থাকে তাহাই আমরা পাই। বেশ, এখন কোন কারণে যদি ঐ বিকীরণ বন্ধ করা যায়, তবেই সূর্য্য হইতে প্রাপ্ত সমুদায় তাপই অনুভব করা যাইবে। এখানেও ঠিক তাই হয়। রোজ আমরা দেখিতে পাই সূর্য্য হইতে গৃহীত তাপের খানিকটা বিকীর্ণ হইয়া আকাশে ছড়াইয়া যায়, পৃথিবী থেকে উড়ে যেখানে ইচ্ছা চলিয়া যায়, তাই গরম কম বোধ হয়। মেঘ হইলে ঐ বিকীরণ হওয়ার পক্ষে বাধা পড়ে, উপরে ছাতের মত মেঘ স্তূপে স্তূপে রহিয়াছে তা ভেদ করিয়া পৃথিবীর বিকীর্ণ তেজ আকাশে পলাইয়া যাইতে পায়না, এজন্য সেখান থেকে আবার প্রতিফলিত হইয়া অর্থাৎ ঠিক্‌রিয়া পৃথিবীর দিকে আসে, কাজেই পৃথিবীর নিকটের বায়ু খুব গরম বোধ হয়। বুঝিলে? এই জন্য দুইটী কারণে মেঘ হইলে বায়ু গরম থাকে:—১মতঃ, বিকীরণ ভাল করিয়া হইতে পায় না, ২য়তঃ, মেঘের দিকে যে উত্তাপটা উঠিয়াছিল সেটা আবার প্রতিফলিত হইয়া পৃথিবীর দিকেই ফিরিয়া আসে। এই দুইটী কারণে মেঘলা রাত্রে পৃথিবী শীতল হইতে পায়না। কাজেই তাহার নিকটের বায়ুও শীতল হয় না, কোন জিনিষও শীতল হয় না। এই জন্য ঐ বায়ুর বাষ্প বাষ্পই থাকিয়া যায়, শিশির হইতে পায় না, ঐ জন্য গাছের তলায় বা ঘরের ছায়ার মধ্যেও শিশির হয় না। বুঝিলে? (সকলেই "হাঁ")।

ঐরূপে যেদিন জোরে হাওয়া হয় সে দিনও শিশির ভাল জমে না। নানা স্থানের গরম বায়ু আসিয়া পড়াতে বাতাসটা খুব ঠাণ্ডা হইতে পায় না। আর বায়ুর চলাচল হওয়ার জন্যও উহা শীতল হয় না। কাজেই ভাল রকম শিশির জমে না, যাও একটুক আধটুক জমে তাও উড়িয়া যায়।

শিশির জমিবার নিয়ম এখন বেশ্ শিখিলে। আর একটী কথা বলিয়া অদ্য বাড়ী যাইব। তোমরা দেখিয়াছ যে ঘাস, পাতা প্রভৃতি কতক গুলি জিনিষে শিশির অন্য কতকগুলি জিনিষের চেয়ে বেশী জমে, এর কারণ কি?—না, পূর্ব্বে বলিয়াছি বিকীরণ শক্তি সকলের সমান নয়। যে সকল বস্তু শীঘ্র তাপ বাহির করিয়া শীতল হইতে পারে তাহারাই বেশী শিশির পায়। ঘাস, পাতা, কাচ, তুলা, পশম (যেমন চুল, কম্বল ইত্যাদি), লোহার বার প্রভৃতি সামগ্রী রাত্রে বাহিরে থাকিলে উহাদিগের গায় যত শিশির জমে, অন্য জিনিষের গায় তত জমে না। মোট নিয়মই এই যে, যে দ্রব্য যত শীঘ্র শীঘ্র গরম তাড়াইয়া দিয়া ঠাণ্ডা হইতে পারে তাহাতে তত পরিমাণে শিশির জমে।"

সকলে:—"খুব ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলাম দাদাবাবু।" নবীন বাবু বলিলেন "এই কথা বলিতে বলিতে একটা ভাল কথা মনে পড়িল। শিশির যেমন নিঃশব্দে স্বর্গ থেকে পড়ে, মানুষের উপরে তেমনি জ্ঞান ও ধর্ম্ম স্বর্গ থেকে পরমেশ্বর নিঃশব্দে পাঠাইয়া দেন। কিন্তু শিশির যেমন গরম না তাড়াইলে জমে না, মানুষও তেমনি যত দিন নিজের অহঙ্কার রূপ তাপকে তাড়াইয়া দিয়া বিনয়ী, শান্ত ও নম্র না হয়, ততদিন জ্ঞান ও ধর্ম্মের শিশির তার প্রাণে দাঁড়াইতে পারে না। এই উপদেশ সর্ব্বদা মনে করিয়া অহঙ্কারের তেজ কমাইবে আর নম্র হইয়া বিনয়ী হইয়া কেবল শিখিতে চেষ্টা করিবে। তবে জ্ঞানী ও ধার্ম্মিক হইয়া জগতের উপকার করিতে পারিবে। চল আজ বাড়ী যাই।"

৺ তারকনাথ প্রামাণিক।

বালক বালিকাগণ! উপরে যাঁহার ছবি দেখিতেছ, ইঁহার বিষয়ে আজ তোমাদিগকে কিছু বলিব। অল্প লেখা পড়া শিখিয়া, অল্প বয়সে বিষয় কর্ম্ম আরম্ভ করিয়া, শরীরের শ্রম, বুদ্ধির জোর, কাজে মনোযোগ, ও ধর্ম্মপথে মতির দ্বারা লোকে নিজের

অবস্থার কিরূপ উন্নতি করিতে পারে,যদি দেখিতে চাও, তবে এই সাধু ব্যক্তির জীবন চরিত মনোযোগ দিয়া পড়।

ইহাঁর নাম তারকনাথ প্রামাণিক। কলিকাতায় ইহাঁর নাম জানে না এমন লোকই নাই। ইনি জাতিতে কাঁসারি ছিলেন। সিমলায় কাঁসারি পাড়াতে বাড়ী। ১২২৩ সালের ৫ই আশ্বিন ইহাঁর জন্ম হয়, এবং ১২৯১ সালের ৭ই চৈত্র ইহাঁর মৃত্যু হইয়াছে; সুতরাং মৃত্যুকালে ইহাঁর বয়স ৬৮ বৎসর হইয়াছিল। ১২ বার বৎসর বয়সের সময় ইনি ইহাঁর খুড়ার একটি বাসনের দোকানে কর্ম্ম আরম্ভ করেন। বার বৎসরের পূর্ব্বে কত লেখা পড়া জানা সম্ভব তাহা সকলেই বুঝিতে পার। যাহারা শ্রম করিয়া খায়, এবং যাহাদের ছেলে পিলেকে শ্রম করিয়া খাইতে হইবে, তাহারা বড় বড় বাবুদের মত ছেলে-পিলেকে ভাল রকম লেখা পড়া শিখাইতে পারে না। তারকনাথকেও বার বৎসর বয়সে নিজের হাতে শ্রম করিয়া বাসন পিটিয়া খাইতে হইয়াছিল। সচরাচর দেখা যায় যে এত অল্প বয়সে, ভাল রকম লেখা পড়া না শিখিয়া, কাজ কর্ম্মে লাগিলে অনেক ছেলে প্রায় কুসঙ্গে পড়িয়া বয়ে যায়; কাজে তাহাদের মনোযোগ থাকে না; অল্প বয়সে তামাক, গাঁজা বা মদ খাইতে শিখিয়া একেবারে অপদার্থ হইয়া পড়ে, কিন্তু তারকনাথের বিশেষ প্রশংসার বিষয় এই যে এই সকল দোষে তাঁহাকে ধরিতে পারে নাই। তিনি যে শ্রমে কাতর ছিলেন না, এবং তাঁহার যে কোন প্রকার অপব্যয় ছিল না, তাহা তাঁহার উন্নতি দেখিয়াই বুঝিতে পারা যায়। তিনি দিন দিন নিজ ব্যবসায়ে এমন উন্নতি লাভ করিতে লাগিলেন যে ১২৫৯ সালে হাবড়ার একটী "ডক" অর্থাৎ "জাহাজ মেরামতি কারখানা" কিনিলেন। তাঁহার হাতে ঐ ডকটীর অবস্থা দিন দিন ভাল হইতে লাগিল। তাঁহার বিলক্ষণ আয় হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে তিনি ধনী হইতে লাগিলেন। ক্রমে কলিকাতায় বড় বাজারে একটী বাসনের দোকান করিলেন এবং আরও অনেক দোকানের অংশীদার হইলেন। ক্রমে দশ দিক হইতে টাকা আসিতে লাগিল।

তারকনাথের ধন বাড়িতে লাগিল সেই সঙ্গে দানশক্তিও প্রকাশ পাইতে লাগিল। সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় যে ধন হইলে লোকের ধর্ম্মে মতি থাকে না, কত প্রকার কুপথে মতি হয়, কত কুসঙ্গী যোটে, কত বদ খেয়ালি উপস্থিত হয়, ধনের গরমীতে মন মত্ত হয়। কিন্তু তারকনাথ প্রামাণিকের এ সব দোষ ঘটে নাই। তিনি ধনী হইয়াও ধর্ম্ম-ভীরু ও বিনীত লোক ছিলেন। এটি তিনি সর্ব্বদাই অনুভব করিতেন যে জগদীশ্বর ধন দিয়াছেন পরোপকারের জন্য। এই জন্য তিনি সকল ক্রিয়া কর্ম্মে হাজার হাজার গরিব লোককে দান করিতেন। এমন দিন প্রায় যাইত না যে দিন তাঁহার দ্বারে দলে দলে গরিব-লোক অন্ন পাইত না;—প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মে ইহাঁর অটল আস্থা ছিল এবং ইহাঁর দান ধ্যান ও সেকেলে লোকের মত ছিল। সকল দেশের ধর্ম্ম শাস্ত্রেই এই উপদেশ দিয়াছে যে গোপনে দান করিবে—নাম কিনিবার ইচ্ছায় দান করিলে সে দানের মূল্য থাকে না; তাহা অতি ছোট কাজ। আমাদের শাস্ত্রে বলিয়াছে—"দত্ত্বা ন পরিকীর্ত্তয়েৎ"—দান করিয়া তাহা বলিবে না। খ্রীষ্টানদিগের বাইবেল পড়িলে দেখা যায় যে—যীশু তাঁহার শিষ্যদিগকে বলিতেছেন যে "তোমরা যখন দান করিবে, তখন তোমাদের বামহস্ত যেন

জানে না যে তোমাদের দক্ষিণ হস্ত কি কাজ করিল," এত গোপনে পরোপকার করিতে হইবে। সকল শাস্ত্রের, সকল সাধুর এই উপদেশ। কিন্তু কত লোকে এই মহা উপদেশ ভুলিয়া গিয়া সুখ্যাতি পাইবার জন্য দান ধ্যান করে; দশজনে প্রশংসা করিবে এইজন্য লোককে দেখাইয়া পরোপকার করে! আবার কতজন একটু লোকের উপকার করিয়া নিজের মুখে দেমাক করিয়া বেড়ায়;—লোকের কাছে বাহাদুরী করে; উপকৃত ব্যক্তি একটু মনের অনভিমত কাজ করিলে তাহাকে লোকের কাছে কৃতঘ্ন বলিয়া নিজের কৃত উপকারকে বাড়াইয়া বলে। আমি এমন করিয়াছি, তেমন করিয়াছি, আমি উহাকে খাইতে পরিতে দিয়াছি, আমি উহাকে রক্ষা করিয়াছি, এই সকল বলিয়া লজ্জা দিবার চেষ্টা করে। এ সকল ভাল মনের কর্ম্ম নয়; ইহাতে নিকৃষ্ট মনই প্রকাশ পায়। তারকনাথের মন এত নীচ ছিল না। তাঁহার বিনয় এত অধিক ছিল যে কেহ প্রশংসা করিলে বড় লজ্জা পাইতেন। যখন দান করিতেন, এমন গোপনে করিতেন যে বাড়ীর লোকেও জানিতে পারিত না। কর্ম্মচারিদের হাত দিয়া দান করিলে পাছে তাহারা জানিতে পারে, এজন্য যে কিছু দান করিতেন তাহা প্রায় নিজের হাতে করিতেন। যখন কোন লোক আসিয়া তাঁহাকে দুঃখ জানাইত, এবং তাঁহার মনে কিছু দিবার ইচ্ছা হইত তখন তিনি কি দিবেন তাহা মনে মনে স্থির করিতেন, কিন্তু যে ব্যক্তি প্রার্থনা করিয়াছে তাহাকে কিছু বলিতেন না। গোপনে টাকা লইয়া, তাহাকে নির্জ্জনে ডাকিয়া লইয়া যাইতেন, এবং আস্তে আস্তে তাহার হাতখানি পশ্চাতদিকে লইয়া, টাকাগুলি হাতে গুঁজিয়া দিয়া, তাহার হাতখানি মুঠা করিয়া দিতেন ও বলিতেন "যৎকিঞ্চিৎ হইল এখানে দেখিবেন না" সুতরাং সে ব্যক্তি গণিয়া দেখিতে পারিত না, এবং তাঁহার বাড়ী পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বেও জানিতে পারিত না যে কত পাইল।

এইরূপে কত লোক যে তাঁহার সাহায্য পাইয়াছে, কত লোকে যে তাঁহার অর্থে মানুষ হইয়াছে তাহার সংখ্যা হয় না। তাঁহার অনেক দানের কথা তাঁহার মৃত্যুর পরে জানিতে পারা গিয়াছে। এরূপ শুনিতে পাওয়া যায় যে স্কুলের গরিব ছাত্রদের বেতন দিবার জন্য তাঁহার মাসে ১৫০ টাকা ব্যয় হইত। একবার একটী গ্রামে বড় জল কষ্ট হওয়াতে, একজন ভদ্রলোক তাঁহার নিকট আসিয়া অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "মহাশয় কত খরচ লাগিবে।" ভদ্রলোকটি একটী পুষ্করিণী খননের খরচের অনুমান করিয়া কয়েক শত টাকার হিসাব দিলেন। তারকনাথ হাসিয়া বলিলেন—"না মহাশয় আপনি যত টাকা বলিলেন তাহাতে হইবে না। পুকুর কাটিতে এত, ঘাট বাঁধাইতে এত, প্রতিষ্ঠা করিতে এত, ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতে এত" এই বলিয়া নিজে একটী খরচের আনুমানিক হিসাব করিলেন এবং একদিন লুকাইয়া ভদ্রলোকটীকে সেই সমুদায় টাকা দিলেন।

তাঁহার দান এইরূপ ছিল। আমরা আগেই বলিয়াছি তাঁহার দান সেকেলে লোকের মত ছিল। এরূপ দানের একটা দোষ এই, অনেক দুষ্ট লোক গরিব সাজিয়া ঠকাইয়া লয়, অনেক অলস লোক যাহারা খাটিয়া খাইলে সুখে চালাইতে পারিত, তাহারা ভিক্ষা করিয়া সেই টাকায় বদমায়েসি করে। তারকনাথের দানে এ দোষ যে ঘটিত না এরূপ বলা যায় না। দেশের কত

অভাব আছে, তাহা নিবারণের জন্য কত সভা হইতেছে, সে সকল প্রকাশ্য সভাতে তাঁহার বিশেষ দান ছিল না। পাছে লোকে জানিতে পারে এই ভয়েই বোধ হয় দিতেন না। কিন্তু তিনি সাবধান হইলেও তাঁহার সুখ্যাতি দেশ বিদেশে গিয়াছিল। এমন কি ১৮৭৭ সালের দিল্লী দরবারের সময় লর্ড লিটন বাহাদুর তাঁহার বদান্যতার সুখ্যাতি করিয়া এক প্রশংসাপত্র দিয়াছিলেন।

তাঁহার জীবনের শেষ ৫।৮ বৎসর বিষয় কর্ম্ম হইতে অবসর লইয়া, কেবল ধর্ম্ম-চিন্তায় সময় যাপন করিতেন। প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কেবল পূজা, আহ্নিক, শাস্ত্রপাঠ, হরি সংকীর্ত্তনে কাল কাটাইতেন; এবং যে সকল ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত আসিতেন, তাঁহাদের সহিত শাস্ত্র চর্চ্চা করিয়া আনন্দ-লাভ করিতেন।

এরূপ ধর্ম্ম-পরায়ণ, সত্য-নিষ্ঠ, বিনয়ী লোক দেশের অলঙ্কার স্বরূপ। সেকেলে লোকদিগের মধ্যে এইরূপ সাধুলোক অনেক পাওয়া যাইত। আমরা নূতন শিক্ষা পাইয়া যদি এই সকল সদ্‌গুণ হারাই, তবে তাহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি? যাঁহার বিদ্যা আছে অথচ অভিমান নাই; ধন আছে অথচ মনে অহঙ্কার নাই; বিষয়-কর্ম্ম আছে অথচ অসত্য ব্যবহার নাই; যাঁহার ধর্ম্মে প্রগাঢ় অনুরাগ, দুঃখীর প্রতি দয়া, এরূপ ব্যক্তিকে আমরা প্রাণের সহিত শ্রদ্ধা করি।

তারকনাথের আর একটী বড় সদ্‌গুণ ছিল। তিনি অতি উদার ছিলেন। পরের দোষ দেখাইতে ভাল বাসিতেন না। একদিন তাঁহার বৈঠকখানায় বসিয়া দুইজন ভদ্রলোক পরের দোষ-গুণের বিষয় বিচার করিতেছিলেন, তিনি বাহির হইতে শুনিতে পাইয়া বলিলেন,—"দেখুন মহাশয়! কোন ব্যক্তির গুণের ভাগ কত, দোষের ভাগ কত, এ বিচার আদালতের বিচারক করিবেন; আমরা যখন পরের কথা কই, তখন তাঁহার গুণের আলোচনা করা ভাল, দোষের আলোচনাতে আমাদের লাভ কি?" প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মে তাঁহার আস্থা ছিল, সুতরাং ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্ম-সমাজের প্রতি তাঁহার ভাল ভাব ছিল না, তথাপি তিনি এমনই উদার ছিলেন যে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের কথা হইলেই বলিতেন,—"আমার ত বোধ হয় তিনি স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য অপেক্ষা বড় পণ্ডিত ছিলেন। কারণ স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য এক প্রকার শাস্ত্রই পড়িয়াছিলেন, কিন্তু রামমোহন রায় সকল শাস্ত্রেই পণ্ডিত ছিলেন।"—

এইরূপে সেই সাধু-প্রকৃতি সদাশয় পুরুষ যথাসাধ্য নিজের ও অপরের কল্যাণ-সাধন করিয়া বিগত চৈত্র মাসে এই পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়াছেন। ইহাঁর মৃত্যুতে কলিকাতার ভূষণ-স্বরূপ একটী লোক আমরা হারাইয়াছি। এরূপ সদ্‌গুণ-বিশিষ্ট লোক যে দেশে অধিক জন্মে সেই দেশের মুখ উজ্জ্বল হয়।*

* আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে ৺তারকনাথ প্রামাণিকের জীবনের ঘটনাবলী যাহা লেখা হইল তাহা সমুদায়ই তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু কালীনাথ প্রামানিক মহাশয়ের নিকট হইতে পাইয়াছি।

গাধা-সিংহ।

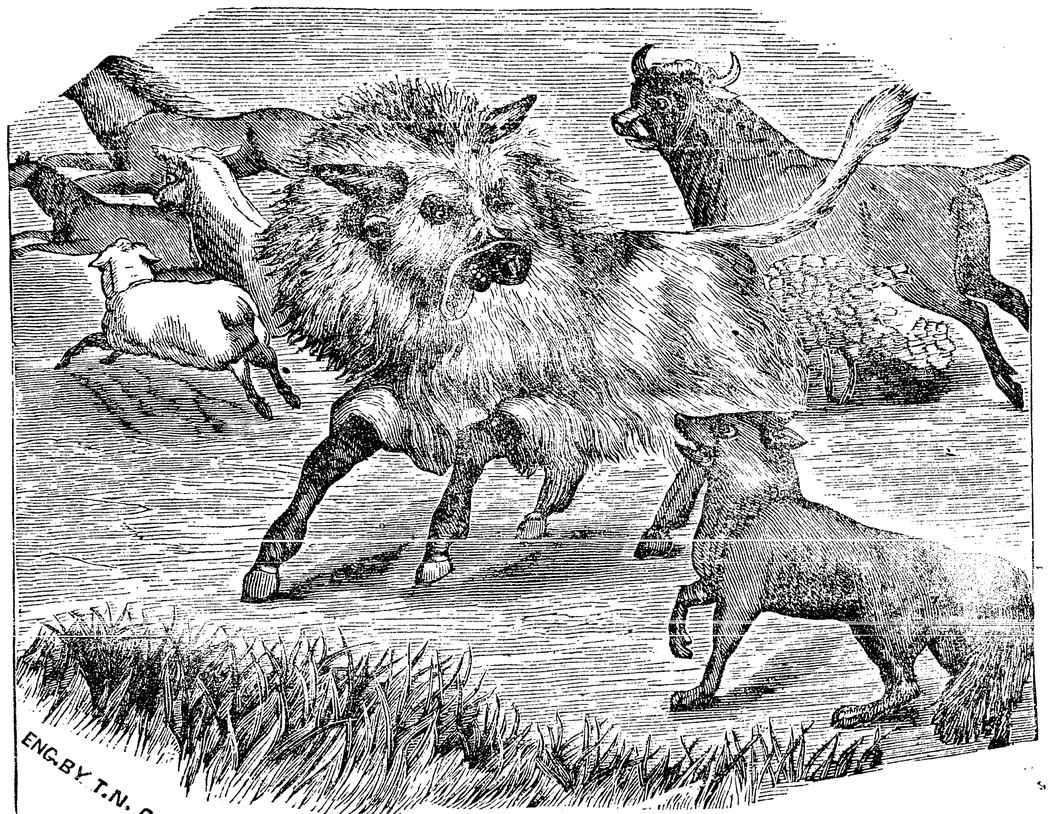

সে সময়ে গাধাও কথা কহিতে পারিত। সে কত কি ভাবিত; আমাদের অনেকের মত বুদ্ধি করিয়া নূতন ফিকিরে আপনার ঘাস জলের যোগাড় করিত। একদিন গাধা মহাশয় এক চাষার কলাইএর ক্ষেতে কিছু যোগাড়ের আশায় ঢুকিয়াছিলেন। চাষাটা কিছু নির্দ্দয় লোক, সে লাঠি মারিয়া আমাদের গর্দ্দভ-চন্দ্রকে বাহির করিয়া দিল।

দুই এক ঘা চড় চাপড় খাইয়া অনেক ছেলের বুদ্ধি যেমন সূক্ষ্ম হইয়া যায়, আমাদের গাধারামেরও লাঠি খাইয়া একটা নূতন বুদ্ধি গজাইয়া উঠিল। সে একটা সিংহের চামড়ায় আপনার শরীরটা ঢাকিয়া ফের সেই কলাইএর ক্ষেতে দেখা দিল। চাষা দেখিল একটা সিংহ আসিয়াছে, সে প্রাণভয়ে পলাইয়া গেল। গাধার মজা আর দেখে কে। বিলক্ষণ রকম উদর পূরণ করিয়া গাধারাম পশুদের দলে আসিলেন এবং লাফালাফি, ঝাপাঝাপি করিয়া তিনি যে সিংহ, ইহা তাহাদিগকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন। নির্ব্বোধ পশুরা গাধাকে গাধা বলিয়া চিনিতে

পারিল না। ঘোড়া, গরু, মেষ প্রভৃতি যত পশু সকলই দৌড়িয়া পলাইতে লাগিল। অবশেষে এক খেঁকশিয়াল সেইখানে আসিয়া গাধার খুর দেখিয়া এবং তাহার সুমিষ্ট গলার স্বর শুনিয়া তাহাকে গাধা বলিয়া চিনিয়া ফেলিল। তখন গাধারামসিংহের সিংহত্ব আর কিছুই রহিল না। সকলেই তাহাকে গাধার মত ব্যবহার করিতে লাগিল।

গল্পটা অনেক কালের; তবে উপদেশটী ভাল। যে গাধা তাহার গাধা থাকাই উচিত। সে যদি সিংহের গুণ না পাইয়া সিংহ সাজিতে যায় তবে তাহার এইরূপই দশ জনের নিকট হাসির পাত্র হইতে হয়। আজ কাল দেখিতে পাই অনেক ছেলে তাহাদের ছেলেত্ব ভুলিয়া গিয়া বুড়োর মত কথা কহিতে ভাল বাসে। যে ৫ম বা ৬ষ্ঠ শ্রেণীর বালক আপনার কতটা বিদ্যা, বুদ্ধি তাহা না বুঝিতে পারিয়া তাহার গুরু জনের মত ধর্ম্মের কথা বা অন্যান্য বড় কথা লইয়া নাড়াচাড়া করিতে যায়, সেই ছেলেকে একজন 'গাধা-সিংহ' বলিয়া জানিও। যাঁহার যতটুকু পুঁজি আমরা তাহার কাছে তত-টুকুই দেখিতে ইচ্ছা করি। আমরা বালকের নিকট এই চাই, যে তিনি পড়া শুনায় যত্নবান হইবেন, সৎ এবং লোক-প্রিয় হইবেন, শারীরিক শ্রম করিয়া শরীরকে সুস্থ রাখিবেন এবং পিতা-মাতার বাধ্য হইয়া সুপুত্রের কাজ করিবেন। বালি-কার নিকট এই চাই যে,তিনি নানাবিধ গৃহ-কর্ম্মে সুনিপুণা, সুশীলা ও দয়াবতী, বিদ্যা উপার্জ্জনে যত্নশীলা এবং আত্মীয়-স্বজনের অনুগতা হইবেন। ইহা ছাড়া যদি দেখিতে পাই যে একটী ছোট ছেলে অথবা মেয়ে এমন সকল কথা বলে অথবা এমন সকল বিষয় লইয়া নাড়াচাড়া করে যাহার কিছুই সে বুঝে না, তাহা হইলেই জানিলাম যে সেই ছেলে অথবা মেয়ে বিগড়িয়া গিয়াছে। সে ছিল গাধা এখন সাজিতে চায় সিংহ।

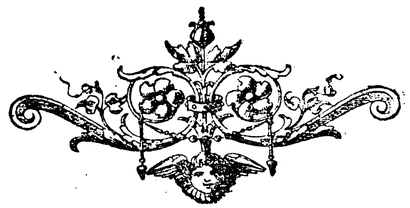

সত্যের জয়।

বিষ্ণুপুর খাঁটি পাড়া গাঁ। সেখানে রেল নাই, ঘোড়ার গাড়ীটী পর্য্যন্ত পাওয়া যায় না। এই ছট্ ফটে গরমের সময় বরফ পাওয়া যায় না, লেমনেড্ পাওয়া যায় না, কলের জল পর্য্যন্ত নাই। সেখানকার লোককে সহরের লোকে অজ্ পাড়াগেঁয়ে বলে ঠাট্টা করে। কিন্তু তা হলেও তারা আমাদের মত খায় পরে, আমাদের মত কথা বলে, লেখা পড়া শেখে; ঘরে অতিথি এলে আদর করে তাকে খেতে দেয়। রাত্রিতে হঠাৎ যদি কোন পথিক যায়গা না পেয়ে গ্রামের মধ্যে আসে ভদ্র লোকেরা আদর করে তাকে আপনার বাড়ীতে থাক্‌তে দেন। তার সঙ্গে আলাপ করেন। পাড়াগাঁয়ের লোকের এই গুণটী খুব। সহরে এটা বড় দেখা যায় না।

বিষ্ণুপুর গ্রাম খানি বড় ছোট নয়। সব-শুদ্ধ হাজার ঘর ভদ্র লোকের বাস। ছোট লোকও প্রায় চার পাঁচ শত ঘর হবে। ভদ্র লোকদের মধ্যে দামোদর মণ্ডল সবচেয়ে বড়। দামোদর জাতে চাষা। দামোদর নিজে হাতে লাঙ্গল চষে, ব্যবসা করে, মাথায় মোট

করে অনেক টাকা করেছেন। বড় অমায়িক লোক। পরের উপকার করিবার জন্য সদা ব্যস্ত অথচ তাঁর কথা কখনও খবরের কাগজে বাহির হয় না। সদাই হরিনাম করেন। পূজা বা পাঁঠা বলি হয় না কিন্তু দীন দুঃখীদের দেওয়া থোয়া বার মাসই চলে—তার কামাই নাই। গ্রামখানি দামোদরের তালুক। গ্রামের ছোট লোকেরা তাঁর ছেলের মত। বাইরের একখানি ঘরে তিনি বসে থাকেন, আর গাঁয়ের যত ছোট লোক সবাই এসে তাঁর কাছে বসে কথা বলে, নালিশ করে। দামোদরকে তারা বাপের মত দেখে। গ্রামের আর আর বামুন, কায়েত, বৈদ্য-দের সঙ্গেও দামোদরের বেশ ভাব আছে। হবেই না বা কেন—যে ভাল হয় তার কেউ শত্রু থাকে না!

দামোদরের একটী ছেলে। ছেলেটী কলি-কাতায় এম, এ, পাস করিয়াছেন। বাড়ীতেই থাকেন। তাঁর নাম প্রসন্ন বাবু। প্রসন্ন বাবুর পিতার অনেক টাকা পয়সা কাজেই তিনি আর চাক্‌রি না করে বাড়ীতেই বাবার বিষয় এবং ব্যবসায় যোগ দিয়ে টাকা রোজগার করেন। ছেলে যা ভাল বোঝেন তাহাই করেন, বাপ কোনও কাজে বাধা দেন না। ছেলেও বাবার মত না নিয়ে কাজ করেন না। ছেলের স্বভাব বাপের মত খুব সৎ। কিন্তু তা হলেও ছেলের একটু খরচ বেড়েছে। দামোদর কাপড় পরেন হাঁটুর নীচে নামে না, কিন্তু প্রসন্ন বাবুর রেলীর ঊনপঞ্চাশ দরকার হয়। কর্ত্তার গায়ে জামা প্রায়ই থাকে না,কেবল কাঁধে এক খানি দশ আনা দামের বিলাতি উড়ানি; কিন্তু ছেলের গায়ে জামা, ফরেস ডাঙ্গার উড়ানি। প্রসন্ন বাবু বাবাকে ভাল কাপড়চোপড় পর্ত্তে খুব অনুরোধ করেন কিন্তু কর্ত্তা বলেন "আর বাবা! আমার তিন কাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে, এখন তুমি ভাল পর। আমি এই রকম করে কাল কাটিয়ে দিই। বরং আমাকে যে ভাল কাপড় দেবে সে কোনও গরিবকে দাও"।

প্রসন্ন বাবুর এখন নজর বড় হয়েছিল! তিনি গাঁয়ের ভিতর একটি বেশ পরিষ্কার পথ করে দিলেন। একটি ছোট খাট ইংরেজি-বাঙ্গলা স্কুল করিলেন। একটি ছোট ডাক্তার আনিয়ে ডাক্তারখানা করিলেন। একটী ডাক্ বাক্স বসাই-লেন। এ সকলই বাপের পরামর্শে। গ্রামের লোক বড় খুসী। বামুন গুলো দুহাত তুলে আশীর্ব্বাদ কর্ত্তে লাগ্‌ল।

যাক্ আমরা এত ক্ষণ অপর কথা বলিলাম। এখন আসল কথা বলা যাক্। আগেই বলেছি বিষ্ণুপুরে প্রায় চার পাঁচশ ঘর ছোট লোকের বাস। এদের মধ্যে চাঁড়ালই বেশী। গদা চাঁড়াল (চণ্ডাল) তাদের মধ্যে একজন। গদা প্রসন্ন বাবুর বাপের সখের পাইক্। গদাকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় তোমার নাম কি? গদা বুক্ ফুলিয়ে বলে "আমার নাম গদাধর সর্দ্দার!" কিন্তু আমরা কি কর্‌ব বুড় কর্ত্তা দামোদর ঘোষ তাকে "গদা" বলেই ডাকেন। আমরা তাঁর কাছেই শিখেছি। যদিও গদা নামটা শুন্‌তে খারাপ লাগে তবু "গদা" বলে ডাক্‌লেই গদাধর অমনি "আজ্ঞে" বলে উত্তর দেয়।

গদার গড়ন খুব মোটা সোটা—খুব মজবুত। মাথা খুব বড়—মাথায় এক মাথা বাউরি চুল—তেলে মাথাটী কুচ্‌কুচে। খুব কোঁক্‌ড়া চুল। গদা ভারী চুলের গরব করে। রং মুস্‌কো কালো। অন্ধকার রাত্রিতে দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। গাঁয়ের ভদ্রলোকের ঘরের বুড়ীরা বলেন "বাপ্‌রে গদার

গড়ন ত নয়—যেন যমের দূত!" গদা লম্বায় ঝাঁড়া চার হাত। দাঁতে মিসি লাগান। সাম্‌নের উপরের দুটী দাঁতে ভোম্‌রার দাগ কাটা। এই হল গদার চেহারা।

গদা খুব লাঠিয়াল—সে দেশে তার মতন লাঠি খেলোয়াড় দেখা যেত না। সবাই তাকে "ওস্তাদ" বল্‌ত। সে কিন্তু লোক ভাল নয়। বুড় মনিব দামোদর ঘোষের খুব সখের চাকর হলেও গদাধর ডাকাত। মনিবের খুব বিশ্বাসী। গদা বল্‌ত "আমি যতদিন থাক্‌ব মনিবের এক-গাছি কুট চুরি যাবে না।" কথাটাও খুব সত্য। গদা মনিবের খুব বিশ্বাসী, কিন্তু সে ডাকাতি করে। সে বৈশেখ, জষ্টি মাসের অন্ধকার রাত্রিতে চুপি চুপি কোথায় চলে যেত আবার রাত্রিতেই আস্‌ত। কর্ত্তা বুঝ্‌তে পার্ত্তেন, তাই অনেক বোঝাতেন কিন্তু তবু ডাকাতি করা ছাড়্‌তে পার্ত্তনা। প্রসন্ন বাবু কিছু জানিতেন না আর কেহই জানিতে পারিত না। কিন্তু কর্ত্তা গদার জন্য বড়ই ভাবেন। ভাল করে খান না, কথা বলেন না। প্রাণে যেন কেমন একটা খুঁৎ খুঁতুনি ধরে গেল। এদিকে ক্রমাগত গদাকে বলেন, বোঝান। গদার একটা গুণ ছিল, গদা খুব সরল। কর্ত্তা যখন তাকে সব বল্‌তেন, সে বলিত "আমার খুব ইচ্ছা হয় যে ভাল হই, কিন্তু কেমন আমার খেলারোগ, আমি ডাকাতি করে কিছু নিই না; কেবল যাই খেলাবার জন্যে।" কর্ত্তা বড়ই ত দুঃখিত হলেন। শেষে অনেক ভেবে চিন্তে বলিলেন "গদা আমি তোকে বড় ভাল বাসি, তোকে আমি হয় ভাল কর্‌ব না হয় আমি নিজে মর্‌ব!" কথাগুলি এমন ভাবে বলিলেন যে গদা কথা শুনে চম্‌কে উঠিল। তখন সে বলিল "আপনি আমাকে কি কর্ত্তে বলেন বলুন, কিন্তু আমি বোধ হয় ভাল হতে পার্‌ব না!" কর্ত্তা অনেক ভেবে চিন্তে বলিলেন "তুই ডাকাতি কর্‌, কিন্তু কোনও জিনিস্ নিবি না, আর সকলের কাছে সত্য কথা বল্‌বি।" গদা এই কথা শুনে বড়ই খুসী হয়ে বলে উঠিল "এই হলেইত আপনি রাজী।" কর্ত্তা বলিলেন "হাঁ"। গদা মনে মনে খুব খুসী হইল। সে মনে করিলে "জিনিস্ ত নিই না—তবে সত্যি কথা বল্‌ব, তা আমি ত ডাকাত বলে আর কেউ জানে না, এক মনিবরা জানেন। গাঁয়ের লোক জানেও না, তারা আমাকে জিজ্ঞাসাও কর্‌বে না।" এই ভাবিয়া গদা একদিন লাঠি ঘাড়ে করে রাত্রিতে যাইতেছে এমন সময় একজন লোকের সঙ্গে দেখা হইল, সে জিজ্ঞাসা করিল "কি গদাধর এত রাত্রিতে কোথায় যাও?" গদা এখন বিষম মুস্কিলে পড়িল, মিথ্যা কথাও বলিতে পারে না, সত্য বলাও মুস্কিল, কাজেই ফিরে আস্‌তে হল। এইরূপ আরও দুই এক দিন হ'ল, তখন দেখিল এক সত্য বল্‌তে গিয়েই সে ধরা পড়ে গিয়েছে। গদা এখন থেকে ডাকাতি ছাড়িল।

বুড় কর্ত্তা কেমন চতুর! এক সত্য কথা বলিতে শিখাইয়া গদার চির অভ্যস্ত ডাকাতি ছাড়াইয়া দিলেন।

সত্য কথা সমুদয় সৎ কার্য্যের মূল। সর্ব্বদা সত্য কথা বলিতে শিখিলেই কোন প্রকার অসৎ কাজ করা অসম্ভব হইয়া উঠে।

স্থানাভাবে এবারে গত বারের ধাঁধার উত্তর এবং নূতন ধাঁধা দেওয়া গেল না।

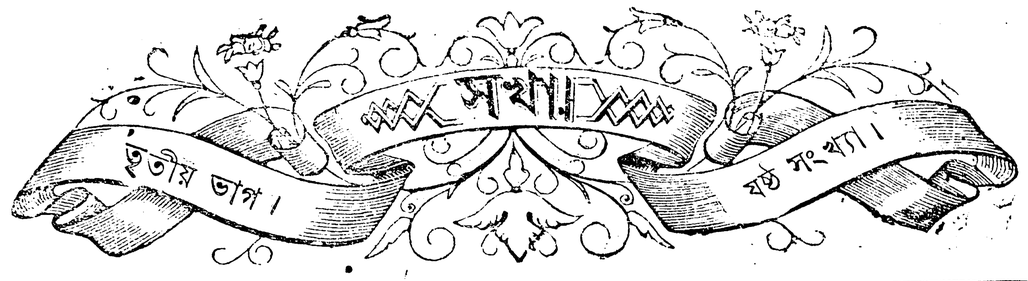

জুন, ১৮৮৫। জ্যৈষ্ঠ, ১২৯২।

ঠাকুরদাদার গল্প।

আগ্নেয়গিরি।

অনেক পরে একদিন নবীন বাবু ও তাঁহার বালকগণ আবার গঙ্গাতীরে বেড়াইতে গিয়াছেন। তথায় বসিয়া নানা বিষয়ে কথা-বার্ত্তা হচ্ছে, এমন সময়ে একজন লোক কতক-গুলি তুব্‌ড়ী-বাজী লইয়া উপস্থিত হইল ও বলিল "বাবু! খুব ভাল তুব্‌ড়ী, নেবেন? আট পয়সা ক'রে একটা।" নলিন চন্দ্র ক্ষেপে দাঁড়ালেন—চারিটা চাই। তুব্‌ড়ী চারিটা কেনা হইল। ফেরীওয়ালা চলিয়া গেলে নবীন বাবু বলিলেন "এই তুব্‌ড়ীতে যখন আগুণ দেওয়া হয় তখন কি রকম হয় বল দেখি, নলিন?" নলিন অমনি উঠিয়া দাঁড়াইয়া একটা তুব্‌ড়ী লইয়া মাটিতে রাখিল, হাতে একটা বড় গোছের কঞ্চি লইয়া যেরূপ ভাব ভঙ্গী করিয়া আগুণ দিবার মত করিল, দেখিয়া সকলের মহা হাসি পড়িয়া গেল। হাসি থামিলে নলিন বাবু বলিতে লাগিলেন "এই—যখন—এই রকম করে—আগুণ দেব,—তখন অমনি ফুর ফুর—ফুর ফুর ক'রে সব বেরবে, আর কেমন মজা হবে!!" সকলে নলিনের আনন্দ দেখে খুসী হইলেন। নবীন বাবু তার পর জিজ্ঞাসা করিলেন—"কে পার বল দেখি, প্রকৃতির স্বাভাবিক তুব্‌ড়ী-বাজী কোথায় হয়?" কিশোরী বলিল "আমরা বইতে পড়িয়াছি আগ্নেয়গিরিতে হয়।" নলিন বলিয়া উঠিল "তবে আমি সে আগ্নেয়গিরি কিন্‌বো?" —এই সকলে হো হো ক'রে হেসে উঠিলেন।—তখন সে চারিদিক চেয়ে ঠাকুরদাদার হাত ধ'রে বলিল "না দাদা! তবে সে কি রকম আমায় বুঝায়ে দিতে হবে।"

নবীন বাবু আরম্ভ করিলেন। "বহু দিন হইল আমি তোমাদের পর্ব্বতের কথা বলিয়াছিলাম। আগ্নেয়গিরি এক রকম পর্ব্বত, তবে পর্ব্বত অপেক্ষা ছোট, তাহাকে বরং পাহাড় বলা যায়। অনেক রকমের আগ্নেয়গিরি দেখা যায়, পর্ব্বতের গায়ে, বা আলাদা, দ্বীপে বা সমুদ্রের জলের ভিতর। সাধারণতঃ তাহারা প্রায়ই অধিক উচ্চ হয় না। কাস্পিয়ান সাগরের চারিদিকে যে সকল আগ্নেয়গিরি দেখা যায় তাহারা দেখিতে অতি ছোট, এমন কি সামান্য উচ্চ ঢিবি করা কাদা মনে হয়। আবার ওদিকে আণ্ডিস্ পর্ব্বতের মধ্যে কটোপাক্সী নামক গিরি ১৮,৮৮৭ ফুট অর্থাৎ ৩½ সাড়ে তিন মাইলেরও বেশী উচ্চ। ইহাদের আকার

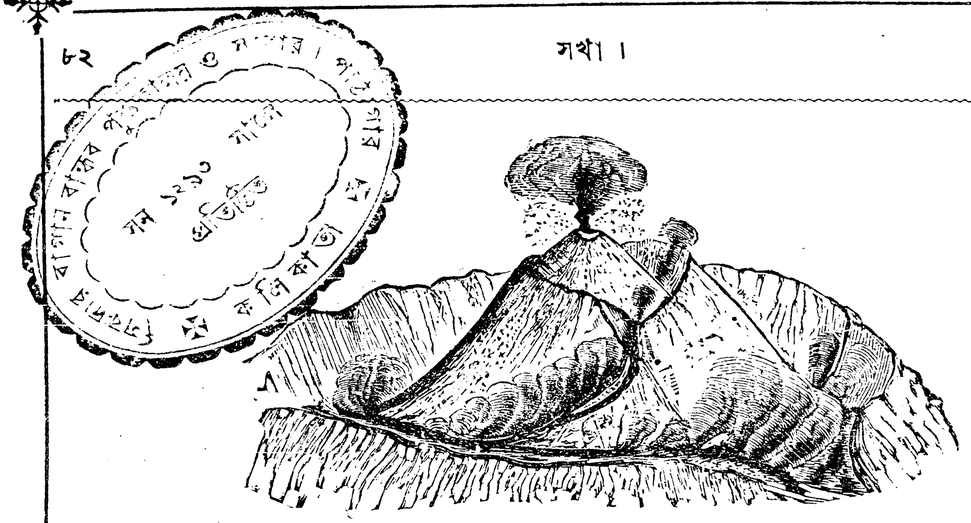

প্রায়ই গোল হইয়া থাকে। দেখিতে ঠিক তুব্‌ড়ীরই মতন। (ছবি দেখ।) তাহার চূড়ার উপরে একটী প্রকাণ্ড গহ্বর থাকে, এবং ঐ গহ্বরের তলা হইতে পৃথিবীর গর্ভ পর্য্যন্ত একটী ভয়ানক নল থাকে।"

গণেন্দ্র—"হাঁ, আমরা পড়িয়াছি ঐ গহ্বরের নাম crater ক্রেটার আর ঐ নলের নাম shaft সাফ্‌ট্‌। নয়?"

নবীন বাবু বলিলেন—"ঠিক কথা। নলের ভিতর হইতে জ্বলন্ত রক্তবর্ণের আভা বাহির হয়; ঐ আলো প্রায় সর্ব্বদাই আগ্নেয় পর্ব্বতের চূড়ার উপর দেখা যায়। আর ঐ নল দিয়া সর্ব্বক্ষণ এঞ্জিনের মত ধুঁয়া বাহির হইতে দেখা যায়। কাজেই, ভিতরে যার এমন ভয়ানক অগ্নিকুণ্ড দিন রা'ত গম্ গম্ কর্‌ছে, তার উপর দিয়া ধুম বা আলো যে বাহির হবে এ আশ্চর্য্য কি?"

মন্মথ—"ওঃ আমার গায়ে কাঁটা দিচ্ছে! আচ্ছা, দাদাবাবু! সেখানে কেও যেতে পারে?"

নবীন বাবু—"পারে বৈ কি? আমার এক বন্ধু তিনবার বিখ্যাত ভিসুভিয়স্ নামক আগ্নেয়-গিরি দেখিতে যান। তিনি বলেন প্রথমতঃ পাহাড়ের তলায় বেশ্ সুন্দর সুন্দর গাছ ও দ্রাক্ষা-লতার ঝোপ, তাহার মধ্যে ছোট্ ছোট কুটীর সকল অতিশয় শোভা করিয়া থাকে। তাহার উপর ক্রমে ছোট ছোট গাছপালা; ক্রমে আর গাছ নাই, কেবলই পাহাড়, তাহার মধ্য দিয়া চলিতে হয়। ক্রমে একটু একটু গরম টের পাওয়া যায়। শেষে যত শিখর দেশের নিকট উঠা যায় ততই ভয়ানক। সেখানে মাঝে মাঝে এক একটা ফাটল আছে; ঐ ফাটলের ভিতর দিয়া ভিতরের জ্বলন্ত গলা পাথর প্রভৃতি দেখা যায়, দেখিয়া প্রাণ উড়িয়া যায়। আর গন্ধকের ধোঁয়ার গন্ধে নিশ্বাস বন্ধ হইয়া যায়। তার পর চূড়াতে পঁহুছিলে যে মনে কি হয়, সে আর কি বলা যায়? তিনি বলিতেন—'সেখানকার দৃশ্য আর কি বলিব? উপরে অন্ধকার করিয়া রাশি রাশি ধূম উঠিতেছে আর সেই অত্যুচ্চ শিখরে আমি বসিয়া যখন মুখ হেঁট করিয়া গহ্বরের দিকে চাহিলাম, দেখি সে বর্ণনা করা অসম্ভব,—ভীষণ অগ্নিময় সমুদ্র যেন গর্জ্জন করিতেছে। আমার মাথা ঘুরিয়া গেল, বুক ঘন ঘন কাঁপিতে লাগিল। বুঝি বা পায়ের নীচের ছাত ভাঙ্গিয়া যায়। তাহা হইলেই সর্ব্বনাশ! সেই অগ্নিকুণ্ডে পুড়িয়া তৎক্ষণাৎ ভস্মীভূত হইতে হইবে।

ভয়ে নামিয়া আসিতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু দৃশ্যটী এমনি গম্ভীর ও মনোহর যে সে চমৎকার স্থান ছাড়িয়া আসিতেও ইচ্ছা হয় না।' আরও কত কথা যে তিনি বলিয়াছিলেন তা সব বলিতে গেলে রাত ফুরাইয়া যাইবে।"

কিশোরী—"কে তিনি, দাদা?"

নবীন বাবু—"তোমরা জান না।"

নলিন—"আমি যখন বড় হব, আমি সেই স্থানটা দেখ্‌তে যাব।"

নবীন বাবু—"হাঁ এই ত চাই। নিজে নিজে দেখে শিখ্‌বে। আমরা বুড় হয়েছি আমাদের আর দেখা হবে না। তোমরা খুব লেখা পড়া শিখে নানা দেশ বেড়াবে, কত কি শিক্ষা করিবে ও জ্ঞান বাড়াইয়া বড় লোক হইবে। এখন, যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহাদের মুখের বর্ণনা কেবল শুনিয়া রাখ।"

আগ্নেয়গিরি যত পুরাতন হয়, আর যত বার তাহার অগ্ন্যুদ্গম হয় ততই তাহার আকার নূতন হইতে থাকে। ভিসুভিয়স্ পর্ব্বতের ঠিক এই রূপ হইয়াছে। ইহার ঠিক মধ্যস্থলে একটী চূড়া, তাহার চারিদিকে আর একটী পুরাতন চূড়ার ভাঙ্গা খানিকটা দেখা যায়, তাহার চারিদিকে আবার একটা আরও পুরাতন চূড়ার ভাঙ্গা অংশ দেখা যায়। এরূপ হওয়ার কারণ তোমরা বুঝিতেই পারিতেছ। যেমন বেশী তেজ হইলে এক একটা তুব্‌ড়ী ফাটিয়া যায়, তেমনি ভিতরে আগুনের তেজ বেশী হইয়া প্রতি অগ্ন্যুদ্গমের সময়ে পুরাতন চূড়া উড়িয়া যায় ও তাহার উপর আবার গলা পাথর প্রভৃতি পড়িয়া নূতন একটা চূড়া প্রস্তুত হয়।"

অমূল্য—"আগ্নেয় পর্ব্বত ত এক রকম বুঝিলাম; উহার অগ্ন্যুদ্গম কিরূপে হয়, দাদা বাবু?"

নবীন বাবু—"ওঃ! সে বড় ভয়ানক ব্যাপার! না দেখিলে তার কিছুই জ্ঞান হয় না, কিছুই ধারণা করা যায় না। দেখাও সহজ নয়। তবে যাঁহারা প্রাণপণ করিয়াও জ্ঞান লাভের জন্য এই ভীষণ অগ্নিকাণ্ড দেখিতে সুবিধা পান, তাঁহাদের বর্ণনা শুনিয়া কিঞ্চিৎ আভাস মাত্র পাইতে পারিবে। কোথাও কিছু নাই,—হঠাৎ হয়ত এক দিন দূরে মেঘ গর্জ্জনের ন্যায় ভয়ানক শব্দ শোনা যায়, আর তার সঙ্গে সঙ্গে ভূমি-কম্প হইতে থাকে। তখনি লোকে বুঝিয়া লয় যে একটা ভয়ানক ব্যাপার শীঘ্রই উপস্থিত হইবে। কাজেই যে যেখানে পায় সব ধন কড়ি, বন্ধু বান্ধব সঙ্গে লইয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করে। ক্রমে ঐ বজ্রধ্বনি ও ভূমি-কম্প আরও প্রবল হইয়া উঠে, এবং পর্ব্বতের চূড়া হইতেও ভীষণ শব্দ হইতে থাকে। শেষে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মেঘের মত রাশি রাশি বাষ্প উঠিয়া আকাশ অন্ধকার করিয়া ফেলে। ভলকে ভলকে তেজের সহিত বাষ্প সকল খুব দূর পর্য্যন্ত উপরে উঠিতে থাকে। তাহাতে কখন কখন অবিরল বৃষ্টি পতিত হইতেও দেখা যায়। এই সঙ্গে সঙ্গে নানা প্রকার আকারের প্রস্তর খণ্ড সমূহ প্রচণ্ড বেগে আকাশে উঠিতে থাকে। শুনা যায় যে পূর্ব্বোক্ত কটোপাক্সী পর্ব্বত হইতে ৫,৪০০ মণ ওজনের একটা প্রকাণ্ড পাথরের চাঁই (শুনিলে অবাক্ হইবে) ৯ নয় মাইল অর্থাৎ ৪॥০ সাড়ে চারি ক্রোশ দূরে গিয়া পড়িয়াছিল!! তোমরা পাঁচ সের গোলা একটা তুলিয়া দশ হাত দূরে ছুড়িয়া দিতে পার না, আর ৫,৪০০ পাঁচ হাজার চারি শত মণ ভারী একটা পাথর কি না, সাড়ে চারি ক্রোশ দূরে ছুড়িয়া দিল! (সকলেই খুব আশ্চর্য্য হইয়া শিহরিয়া উঠিল।

"এই সময়ে এত ভস্মরাশি গহ্বরের মুখ দিয়া আকাশে উঠিতে থাকে যে একেবারে সূর্য্যকে ঢাকিয়া দশদিক অন্ধকার করিয়া ফেলে। এমন কি ৭।৮ ক্রোশ দূর পর্য্যন্ত চারিদিকে অমাবশ্যার রাত্রির মত অন্ধকার করিয়া ঐ সকল আগ্নেয় ধূলি রাশি (ইংরাজিতে volcanic dust বা sand বলে) আকাশকে ছাইয়া ফেলে এবং কখন কখন ১০০।১৫০ ক্রোশ দূরে পর্য্যন্ত গিয়া অবিরল বৃষ্টিপাতের ন্যায় পতিত হইতে দেখা যায়। ইহা কিন্তু ধূলি বা ভস্ম কিছুই নয়। ভিতরে যে দ্রব (অর্থাৎ গলা) প্রস্তর ও ধাতু সকল রহিয়াছিল, তাহাই বেগে উপর দিকে উঠিয়া বায়ুতে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া অতি সূক্ষ্ম গুঁড়ি গুঁড়ি ছাইয়ের কণার মত পড়ে, এই জন্য ইহাকে কখন ভস্ম কখন বা আগ্নেয় ধূলি বলা হয়। ইহা দ্বারা ভয়ানক অনিষ্ট হয়। সমুদ্রের ধারেই প্রায় আগ্নেয় গিরিরা থাকে; কাজেই ঐ ধূলি সব সমুদ্রে পড়িয়া এত জমা হয় যে জাহাজ চলাচল বন্ধ হইয়া যায়।

"আর তোমরা বোধ হয় অনেকেই জান নেপল্‌স্ দেশীয় হার্কিউলেনীয়াম, পম্পীয়াই ও ষ্টাবী নামক তিনটী নগর এই আগ্নেয় ধূলিরাশির মধ্যে একেবারে পুতিয়া অদৃশ্য হইয়া গিয়াছিল।"

কিশোরী—"আমি পড়িয়াছি।"

মন্মথ—"আমিও শুনিয়াছি।"

নলিন—"আমি ত জানিনা?"

নবীন বাবু—"প্রায় দুই হাজার বছর পূর্ব্বে ভিসুভিয়স পর্ব্বত এখনকার মত ছিল না, তখন উহা শান্তভাবে ছিল, কোনও উৎপাতের চিহ্ন মাত্র ছিল না। হঠাৎ ৬৩ খ্রীষ্টাব্দে একবার ভূমিকম্প দেখা দিল, ও তার পর ১৬ বছর ক্রমাগত মাঝে মাঝে ঐ রকম ভূমিকম্পই হইত। শেষে ৭৯ খ্রীষ্টাব্দে (অর্থাৎ প্রায় ১৮০০ বছর গত হইল) ভয়ানক অগ্ন্যুৎপাত হয়। সেই ঘটনার সময়ে এত ভস্ম বাহির হইয়াছিল যে পর্ব্বতের চারিদিকের দেশ সমূহে প্রায় ২০ হাত উচ্চ হইয়া উহা চাপা দিয়াছিল। এই ভয়ানক ভস্ম পাতেই পূর্ব্বোক্ত তিনটি নগর একেবারে চাপা পড়িয়া বহুকালের মত পুতিয়া গিয়াছিল এবং প্রায় ১৬০০ ষোল শত বছর এই ভস্মস্তূপের ভিতরে লুকাইয়া ছিল। সেদিন তাহাদের কোন কোন স্থানের খানিক খানিক অংশ উপরের চাপ খুঁড়িয়া বাহির করা হইয়াছে।

"তাছাড়া আরও ভয়ানক কাণ্ড সকল ঘটিয়া থাকে। হঠাৎ হয়ত সমুদ্রের জল খুব খানিক দূর সরিয়া গেল, তারই পরে আবার ভীষণ বেগে পর্ব্বতের মত উচ্চ হইয়া দেশ নগর, ঘর বাড়ী, —সব ডুবাইয়া বন্যা করিয়া ফেলিল। এইরূপে নানা প্রকার ভয়াবহ উৎপাত হইয়া থাকে।"

গণেন্দ্র—"ওঃ! আমার গা কাঁপ্‌ছে, বোধ হচ্ছে যেন প্রলয়কাল উপস্থিত, আর সব সৃষ্টি যেন ধ্বংস হতে বসেছে!"

নবীন বাবু—"ঠিক্ সেই রকমই বটে। আমি তোমাদের কি বা বলিলাম? বড় হয়ে যখন এ বিষয়ের ভাল বর্ণনা পড়িবে তখন ভয়ে আর বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া ভাবিবে এ কি কাণ্ড!! যথার্থই যেন মহাপ্রলয়কাল উপস্থিত হইয়াছে। জগতে এমন ভয়ানক ব্যাপার আর কিছুই নাই। পৃথিবীর যেন স্নেহ মমতা কিছুই নাই, ঘোর নিষ্ঠুর, ঘোর উন্মত্ত, জ্ঞানশূন্য! কত যত্নে যে সব গাছ লতা গুলিকে রস দিয়ে এতদিন বাঁচাইতে ছিল ও বড় করিতে ছিল, তাদের কোথায় যে কে গেল তার সন্ধান নাই! এক একটা দুরন্ত ছেলে যেমন রাগ করে ঘর দোর, ঘটী বাটী, শ্লেট, বই,

ছবি গহনা, যা সুমুখে পায় ভেঙ্গে চুরে লণ্ড ভণ্ড করে, আর চীৎকারে বাড়ী ফাটাইতে থাকে, এ সময়ে পৃথিবী যেন সেই রকম করে। ওঃ! কি ভয়ানক! এদিকে ভূমিকম্প হচ্ছে, তাহাতে আবার বজ্রাঘাতের মত শব্দে আকাশ যেন ফেটে যাচ্ছে, সমুদ্র উথলে উঠছে, ওদিকে আকাশে ঘোর অন্ধকার, ভস্মে একেবারে আকাশ ঢেকে ফেলেছে, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথরের চাঁই গুলা হুড় মুড় ক'রে এখানে ওখানে পড়্‌ছে, ক্রমে ভস্মরাশি ঘর বাড়ী, গাছপালা, পথ ঘাট, জল স্থল, দেশ নগর—সব ছেয়ে ফেল্‌ছে, পাহাড় কোথাও পৃথিবী কাঁপাইয়া ফেটে যাচ্ছে, কোথাও ভিতরের তেজে খানিকটা উড়ে যাচ্ছে!! পশু পক্ষী কে কোথায় পড়িয়া মরিতেছে তাহার ত সন্ধান নাই, থাকিতে পারেই না—মানুষই যে কে কোথায় পলাইল, কোথায় মরিল, কি কাণ্ড কিছুরই ঠিক নাই! কেবলই অন্ধকার আর বজ্রধ্বনি আর ধ্বংস!—এইত প্রলয়!

ক্রমশঃ

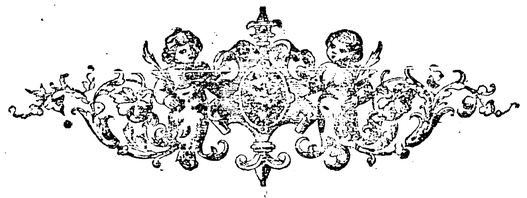

সাধুদিগকে কিসে চেনা যায়?

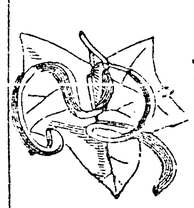

সকলে বুড়ো, স্ত্রী পুরুষ, কার না ইচ্ছা করে খুব ভাল হইয়া জীবন কাটায়? ভাল হইবার আকাঙ্ক্ষা সকলের মধ্যেই আছে, কিন্তু নানা কারণে উহা কাহারো ভিতরে বেশী, কাহারো ভিতরে খুব কমই দেখিতে পাওয়া যায়। বাল্যকাল হইতেই যাঁহারা সাধু লোকের গল্প শোনেন, সাধু লোকের কাজ সব মনোযোগ দিয়ে দেখেন, ভাল ভাল লোকের জীবন-চরিত পড়েন, সচ্চরিত্র বালক বালিকাদের সঙ্গে ফেরেন এবং পিতা মাতার অনুগত হইয়া চলেন, তাঁহাদের ভাল হইবার আকাঙ্ক্ষা ক্রমেই বাড়িতে থাকে। আর যাহারা ছেলে বেলা হইতেই দুষ্ট ছেলেদের সঙ্গে মিশিয়া গুরুজন এবং মান্যগণ্য লোকদিগকে নিন্দা করিতে শেখে, খারাপ খারাপ বিষয় লইয়া আমোদ করিতে অভ্যাস করে এবং সব ইয়ার ছেলে গুলোর মত মোটামুটি একটু লেখাপড়া শিখিয়া সকল বিষয়ের উপরে ভাসিয়া বেড়ায়, কোনকালেই তাহাদের ভাল হইবার ইচ্ছা প্রবল হইয়া উঠিবে না। ভাল হইবার অর্থ টা তোমরা গোল করিও না। আমি যদি বড় হইবার কথা বলিতাম তবে গোলেরই কথা ছিল বটে, কারণ তুমি যাঁহাকে বড় লোক বলিবে হয়ত আমার চোখে আমি তাঁহাকে এক সাধারণ লোক বলিয়া জ্ঞান করিব। এক হাজার লোকের মধ্যে আমায় ছাড়িয়া দেও আমি তাহার মধ্য হইতে যিনি যিনি সাধু লোক আছেন তাঁহাদিগকে বাছিয়া বাহির করিতে পারিব। একবাড়ী নিমন্ত্রণে এক শত লোক একস্থানে বসিয়া আহার করিতেছেন আমি তাহার মধ্যে যিনি সাধু তাঁহাকে চিনিয়া ফেলেছি।

সাধু লোকের চাল চলন কথা বার্ত্তা, মুখের হাসি এবং চোখের চাউনি, সকলই একটু ভিন্ন রকম। কতকগুলি লক্ষণ আছে যাহা সকল দেশের সকল কালের সাধুগণের মধ্যেই সমান। সাধুদের অনেক লক্ষণ আছে, তন্মধ্যে যে গুলি

আমরা সাধু চরিত্র হইতে গ্রহণ করিতে পারিয়াছি তাহাই তোমাদিগকে বলিতেছি। পৃথিবীতে যত সাধু জন্মিয়াছেন তাঁহাদের সকলের জীবনের ভিতরে ঢুকিয়া দেখ **বিশ্বাসই** তাঁহাদের সকল কাজের মূল। তুমি যদি একটী কাজ করিতে ইচ্ছা কর তবে আগেই ভাবিবে একাজ করিলে তোমায় কে কি বলিবে। হয়ত যদি সেই কাজ করিলে একটু ক্লেশ সহ্য করিতে হয় কিম্বা কেহ গালি দেয় কি মারিতে আইসে তবে আর তোমার পা চলিবে না। অথবা একবার যদি সেই রকমের একটী কাজ তোমার সমবয়স্ক আর কেহ চেষ্টা করিয়া না পারিয়া থাকে তবে তোমার আশা হইবে না, নিজের উপরে বিশ্বাস রাখিতে পারিবে না। বাল্যকাল হইতেই প্রত্যেক সাধুর জীবনে খুব বিশ্বাসের ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। তোমরা অনেকেই মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের নাম শুনিয়াছ। আমাদের দেশে কুরীতি সকল যাহাতে সংশোধন হয় তাহার জন্য তিনি ১৬ বৎসর বয়সের সময় হইতেই বিশ্বাস করিয়া চেষ্টা করিতে আরম্ভ করেন। অনেক বৎসর পরে যখন চারিদিকেই ধর্ম্মের গোলযোগ উপস্থিত হইতে লাগিল, যখন শিক্ষিত লোকেরা রাজা রামমোহনের প্রচারিত মত সকল গ্রহণ করিতে লাগিলেন, তখন পুরাতন দলের লোকেরা চারিদিক হইতে রাজাকে উৎপীড়ন করিতে ছাড়িলেন না, রাজা কত অত্যাচার ও যন্ত্রণা সহ্য করিয়া বিশ্বাসের সহিত নিজের ঠিক্‌মত প্রচার করিতে লাগিলেন। রাজা রামমোহন রায় তখন বলিয়াছিলেন—"আজ যাঁহারা আমাকে শত্রু ভাবিয়া অত্যাচার করিতেছেন **এমন একদিন** আসিবে যখন তাঁহাদেরই পুত্র পৌত্রেরা যথার্থ বান্ধব বলিয়া আমায় স্মরণ করিবে।" সেই **এমন এক দিনের** আগমনের উপরে তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল বলিয়াই তিনি অত অত্যাচার সহ্য করিয়াও ভয়ে পেছন নাই। সত্য সত্যই সেই **এমন এক দিন** আসিয়াছে। এখন বুড়ো বুড়ীদের কথা দূরে থাকুক, তোমাদের ন্যায় ছেলে মেয়েরাও রামমোহন রায়ের গল্প শুনিতে কত ভাল বাসেন। এখন শিক্ষিত লোকেরা প্রতিবৎসরই সভা করিয়া রামমোহন রায়কে স্মরণ করিয়া থাকেন। এইখানেই দেখ সাধুতার লক্ষণ বিশ্বাস, এবং বিশ্বাসের পুরস্কার জয়।

সত্যের প্রতি খুব আন্তরিক শ্রদ্ধা সাধুতার আর একটী লক্ষণ। মিথ্যা কথা ত সাধুরা প্রাণ গেলেও কহিবেন না, সত্যের যেখানে অপলাপ হইতেছে অর্থাৎ খাঁটি ভাব, খাঁটি মত প্রকাশ না পাইয়া মিথ্যা ভাব, অসত্য মত প্রকাশিত হইতেছে সেখানে সাধুলোকেরা চুপ করিয়া থাকিতে পারেন না। এই বিষয়ে একটী দৃষ্টান্ত দেওয়া যাউক। তোমরা তোমাদের সখাতেই শ্রীযুক্ত রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের বিষয় শুনিয়াছ। একবার রামতনু বাবুর বন্ধু মৃত রামগোপাল ঘোষ মহাশয়ের চেষ্টায় রামতনু বাবু বাঙ্গালার শ্রীযুক্ত ছোট লাট সাহেবের দরবারে যাইতে পারিয়াছিলেন। সেই দরবারে অনেক বড় বড় বাঙ্গালী বাবুদের নিমন্ত্রণ হইয়াছিল। রামতনু বাবু তখন একজন সামান্য স্কুলের মাষ্টার বই ত নন? সুতরাং সেখানে রামতনু বাবুই বোধ হয় আর আর সকলের চেয়ে মান সম্ভ্রমে এবং পদমর্য্যাদায় অনেক নীচু ছিলেন। বাঙ্গালীদের মধ্যে যাঁহারা রাজা মহারাজা ও খুব বড় বড় লোক তাঁহাদের সঙ্গেই ছোট লাটের আমাদের দেশ সম্বন্ধে নানা কথা

হইতেছিল; তখন কথা বার্ত্তার সঙ্গে সঙ্গে আহারাদিও চলিতেছিল। এই কথাবার্ত্তার মধ্যে ছোট লাট বাহাদুর কোন এক বিষয়ে এমন একটী মত প্রকাশ করিয়া ফেলিলেন যাহা রামতনু বাবুর নিকটে খুব অসঙ্গত বোধ হইল। রামতনু বাবু আশা করিয়াছিলেন যে বড় লোকদের মধ্য হইতেই কেহ লাট সাহেবের ভুল দেখাইয়া দিবেন। কিন্তু যখন দেখিলেন সকলেই চুপ করিয়া সাহেবের কথা শুনিতে লাগিলেন, তখন আর রামতনু বাবু চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি সাহসের সহিত লাট সাহেবকে তাঁহার ভুল দেখাইয়া দিলেন। লাট সাহেব খাইতেছিলেন, হাতের চাম্‌চে কাঁটা মেজের উপরে রাখিয়া রামতনু বাবুর কথা শুনিতে লাগিলেন। রামতনু বাবুর কথা শেষ হইলে পরে যথেষ্ট সম্মান দেখাইয়া খুব আগ্রহের সহিত ছোট লাট রামতনু বাবুকে কাছে লইয়া আবার আহার করিতে লাগিলেন এবং রামতনু বাবুও আহার করিতে বসিলেন। তৎপরেও ছোট লাট রামতনু বাবুর বন্ধু সুবিখ্যাত রামগোপাল ঘোষ মহাশয়ের নিকটে রামতনু বাবুকে যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছিলেন। এই খানেই দেখ সত্যের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও তাহার আশ্চর্য্য পুরস্কার। ছোট লাটের মুখেমুখে তাঁহার মতবিরুদ্ধে কথা কহা কি যার তার কাজ? তাই সকলেই চুপ করিয়াছিলেন, কিন্তু সত্যের অনুরোধে যিনি বলিতে সাহস করিয়াছিলেন, তিনিই তাঁহার সাধুতার পুরস্কার পাইলেন।

কৃতজ্ঞতা সাধুদের জীবনের একটী ভূষণ। তুমি সাধুদের মধ্যে যেমন কৃতজ্ঞতার ভাব দেখিতে পাইবে এমন আর কোথাও দেখিতে পাইবে না। তাঁহারা মরিবেন তাহাও স্বীকার, তবু উপকারী ব্যক্তির মনে ক্লেশ দিবেন না, উপকারীর প্রতি অবিশ্বাস করিয়া আপনার সুবিধা খুঁজিবেন না। এ বিষয়ে তোমাদিগকে আর একজন বড়লোকের জীবনের একটা ঘটনা বলিতেছি। আমাদের দেশের একজন সুবিখ্যাত ডাক্তার যখন পৃষ্ঠাঘাত রোগে মৃত্যু-শয্যায়, তখন ইহাঁর পরম বন্ধু আর একজন সুবিজ্ঞ ডাক্তার ইহাঁকে চিকিৎসা করিতেছিলেন। সেই ডাক্তার তাঁহার ব্যারামের খুব খারাপ অবস্থায়, এমন কি যখন অন্যান্য ডাক্তারেরা পরিত্যাগ করিয়া গেলেন তখনও প্রাণপণে চিকিৎসা করিতেছিলেন। কিন্তু একটু ভাল দেখিয়া মনে করিলেন হয়ত অন্য ডাক্তার কবিরাজ দ্বারা চিকিৎসা করাইলে আরোগ্য হইবেন। কিন্তু যখন রোগীর বন্ধুরা তাঁহাকে এবিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন তখন তিনি এই মতে উত্তর করিলেন—"যিনি আমার চিকিৎসা করিতেছেন তিনি আমার অতি দুঃসময়ের বন্ধু আমি তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া আর কাহারো হাতে প্রাণ দিতে পারিব না!" সেই রোগেই তাঁহার মৃত্যু হইল বটে কিন্তু তবু তিনি তাঁহার উপকারী সুবিজ্ঞ ডাক্তার বন্ধুকে পরিত্যাগ করিলেন না।

সাধুলোকের বুঝি **ভালবাসা** মরিলেও যায় না। তুমি আজ সতীশকে অথবা তোমার ছোট বোন স্বর্ণকে কত ভাল বাসিতেছ, কত প্রাণের কথা কহিতেছ, একত্রে খাইয়া শুইয়া, বেড়াইয়া চেড়াইয়া কত সুখ পাইতেছ, দুই বছর বাদে হয়ত সতীশ তোমার চেয়ে আর একজনকে বেশী ভাল বাসিতে পারে, স্বর্ণ হয়ত তোমার সঙ্গে আর খাইতে শুইতে, চলিতে ফিরিতে ভালবাসে না, অত গোলে কাজ কি, তোমাকে দেখিতেও চায় না। তুমি কি বলিতে পার আজও তুমি তাহাদিগকে যেমন ভাল বাসিতেছ তখনও তেমনি

বাসিবে? সাধুলোকেরা কিন্তু ছোট বেলা থেকে তাহাই করেন। তাঁহারা এক দিন যাঁহাকে ভালবাসিয়াছেন চিরদিনই তাঁহাকে ভাল বাসিবেন। তাঁহাদের বন্ধু যদি দুশ্চরিত্র হন তবুও তাঁহারা তাঁহাকে ঘৃণা করিবেন না; বরং যাহাতে বন্ধুকে ভাল করিতে পারেন তাহার জন্যই সর্ব্বদা বন্ধুর হাতে পায় ধরিয়া চেষ্টা করিয়া থাকেন। যাহাকে লোকেরা খারাপ বলিয়া জানে এমন লোককেও শুধরাইবার জন্য তাঁহারা কত চেষ্টা করেন, মানুষকে ভাল না বাসিলে কখনও তাহাকে শুধরাইবার জন্য আন্তরিক চেষ্টা হয় না।

ক্ষমাগুণ সাধুতার একটী প্রধান লক্ষণ। এই ক্ষমাগুণ আছে বলিয়াই সাধুলোকের সহিত মন খুলিয়া কথা কহিতে পারা যায়। অন্য লোকের সঙ্গে যখন কথা কহিতে হয় তখন যেন কেমন ভয়ে কথা বাহির হয় না, প্রাণ খোলে না, মুখও ভাল ফুটে না। পাছে এমন কিছু বলিয়া ফেলি যাহাতে তিনি চটিয়া বসেন, আমায় গালি দেন, বা মারিতে পারেন এই ভয়েই প্রাণ কাঁপিতে থাকে। কিন্তু ভাই সাধুলোককে দেখিতেও যেমন ভয় করে না তাঁহার সঙ্গে কথা কহিতেও তেমন কোন সঙ্কোচ হয় না—মনে যাহা আইসে তাহাই বলিয়া ফেলি। কেন না মনে বিশ্বাস থাকে তিনি হাজার দোষ দেখিলেও ক্ষমা করিবেন।

যে লক্ষণটী দেখিলে নিশ্চয়ই সাধু বলিয়া মানিতে হইবে এখন সেই লক্ষণটী দেখাইয়া শেষ করিব। প্রকৃত সাধুতায় লোককে এমনই বিনয়ী করে যে পঞ্চাশ বছরের বুড়োকেও ঠিক দশ বছরের ছেলের ন্যায় করিয়া দেয়। তুমি বার বছরের ছেলে যাইয়া একজন সাধু লোককে দুটো ভাল কথা কও, তিনি তোমার কথাও যেমন আগ্রহের সহিত শুনিবেন একজন গণ্য মান্য পণ্ডিতের কথাও ঠিক সেইরূপ ভাবেই শুনিবেন। সাধুদের শ্রদ্ধা ছোট বড় সকলের প্রতিই সমান এবং ছোট বড় সকলের নিকটেই যে বিনীত হইলে সত্য শিক্ষা করা যায় এই বিশ্বাস আছে বলিয়াই তাঁহারা বড়। সাধুদের মহৎগুণ যে, তাঁহারা বড় হইয়াও সকলের নিকটে ছোট হইতে চান, অনেক জানিয়া শুনিয়াও নিজেরা বিশ্বাস করেন যে কিছুই জানেন না, স্বাধীন হইয়াও পরের অনুগত হইয়া চলিতে চান, নিজে উঁচু হইয়াও নীচু লোকের সেবা করিতে চান এবং নিজে অবমানিত হইয়াও পরকে মানী করিতে ভাল বাসেন। পাঠক পাঠিকাগণ! এ সংসারে টাকা কড়ি উপার্জ্জন করিয়া ধনী হওয়া বা গাড়ীঘোড়া চড়িয়া সুখ ভোগ করা সহজ; একটু চেষ্টা করিলে অনেকেই তাহা করিতে পারেন। বিএ, এমএ, পাশ করিয়া বড় বড় চাকুরী করাও সহজেই হইতে পারে, কিন্তু নিজের প্রভু হইয়া এবং পরের উপকার করিয়া যাঁহারা জীবন কাটাইতে পারেন তাঁহারই ধন্য! মানুষের যদি বাল্যকাল হইতেই কিছুর জন্য বেশী ভাবিতে হয় তবে সে সাধুতারই জন্য।

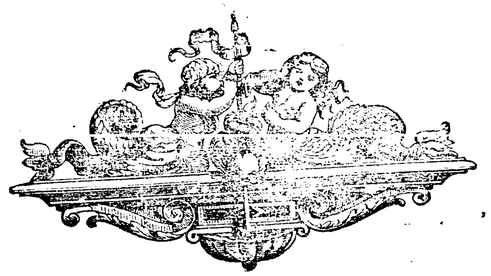

৺ ডাক্তার কৃষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায়।

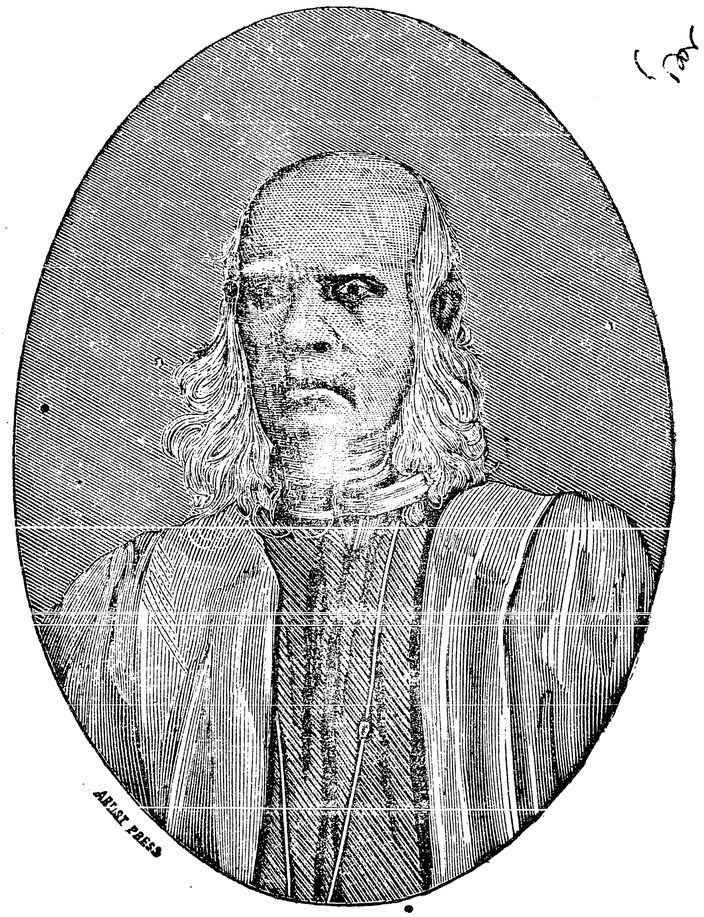

পাঠিকাগণ আজ আবার তোমাদের নিকট একটী দুঃখের সংবাদ লইয়া উপস্থিত হইতেছি। আমাদের জন্মভূমি বঙ্গদেশের আর একটী রত্ন খসিয়াছে। আমাদের দেশের আর একটী বড় লোক ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন।

তোমরা কি ডাক্তার কৃষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায়ের নাম শুনিয়াছ? অবশ্যই শুনিয়া থাকিবে। যিনি দেশে এত বড় বিখ্যাত লোক ছিলেন তাঁহার নাম অবশ্যই তোমাদের কাণে গিয়া থাকিবে। তবে ইহাঁর বিশেষ ইতিহাস বোধ হয় জান না। সেই ইতিহাস একটু বলি শুন।

১৮১৩ সালে অর্থাৎ ৭২ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতার ঝামাপুকুর কালীতলার সন্নিকটে মাতামহের বাটীতে ডাক্তার কৃষ্ণমোহনের জন্ম হয়। সেই সময়ে এ দেশের লোককে ইংরাজী শিখান

উচিত কি না এই বিষয় লইয়া দেশ মধ্যে হুল স্থূল পড়িয়া গিয়াছিল। কতকগুলি লোকের এইমত ছিল যে এ দেশবাসিদিগকে ইংরাজী শিখান হইবে না; আবার আর এক দিকে রামমোহন রায়, রাজা রাধাকান্ত দেব, ডেভিড হেয়ার প্রভৃতি আর এক দল লোকের মত ছিল যে এ দেশের লোককে ইংরাজী না শিখাইলে প্রকৃত উন্নতি হইবে না। একে এই গোলযোগ তাহাতে আবার রাজা রামমোহন রায় প্রচলিত পৌত্তলিক ধর্ম্মের ভ্রম দেখাইয়া নানা গ্রন্থ প্রকাশ করিতে ছিলেন, দেশের বড় বড় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ তাঁহার পুস্তকের যুক্তি সকল খণ্ডন করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, এই সকল বাদানুবাদে তখন দেশের লোকের মন, বিশেষতঃ কলিকাতা সহরের লোকের মন নিতান্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল। সকল ঘরেই এই কথা, দশজনে একত্র হইলেই এই গোলযোগ; সর্ব্বত্রই প্রচলিত ধর্ম্ম সত্য কি না এই আলোচনা। এই তর্ক যুদ্ধের মধ্যে কৃষ্ণমোহনের জন্ম হইল। তিনি পিতার দ্বিতীয় পুত্র, তাঁহার আর দুই ভাই ও দুই ভগিনী ছিলেন। তাঁহার যখন পাঁচ বৎসর বয়স, তখন মহাত্মা ডেভিড হেয়ার, রাধাকান্ত দেব, রামমোহন রায় প্রভৃতি ইংরাজী শিক্ষার পক্ষীয় লোকেরা একত্র হইয়া "স্কুল সোসাইটী" নামে একটী সভা স্থাপন করিলেন। তাহার দুই উদ্দেশ্য ছিল;—(১ম) সে সময়ে কলিকাতা সহরে যে পাঠশালাগুলি ছিল, তাহার উন্নতি করা (২য়) দেশে ইংরাজী স্কুল স্থাপন করা। কৃষ্ণমোহন যে বাড়ীতে জন্মিয়াছিলেন, তাহার নিকটের একটী পাঠশালা ঐ সভার লোকেরা হাতে লইলেন। স্বয়ং হেয়ার সাহেব তাহার তত্ত্বাবধান করিতেন। ইহা ভিন্ন "স্কুল সোসাইটী" একটী ইংরাজী স্কুল খুলিয়াছিলেন। এখন তাহার নাম হেয়ার স্কুল হইয়াছে। পাঠশালার ভাল ভাল ছেলেদিগকে, হেয়ার সাহেবের স্কুলে লইয়া যাওয়া হইত, সেখানকার ভাল ছেলেদিগকে আবার বিনা বেতনে হিন্দুকালেজে পাঠান হইত। কৃষ্ণমোহন সর্ব্ব প্রথমে হেয়ার সাহেবের পাঠশালায় ভর্ত্তি হইলেন। তাঁহার স্বাভাবিক বুদ্ধি এমন আশ্চর্য্য ছিল যে অল্পদিনের মধ্যে তাঁহার উপর হেয়ার সাহেবের চক্ষু পড়িল। তিনি কৃষ্ণমোহনকে ছেলের ন্যায় ভাল বাসিতেন। পাঠশালা হইতে কৃষ্ণমোহন হেয়ার স্কুলে গেলেন এবং সেখান হইতে ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দুকালেজে ভর্ত্তি হইয়া মনোযোগ সহকারে বিদ্যাভ্যাস করিতে লাগিলেন। হিন্দু কালেজে পাঠের সময় ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার পিতার পরলোক হইল।

কৃষ্ণমোহন যখন হিন্দু কালেজের প্রথম শ্রেণীতে পড়েন তখন সেই কালেজের চতুর্থ শ্রেণীতে একজন অসাধারণ ব্যক্তি শিক্ষক ছিলেন। ইহাঁর নাম হেন্‌রি ভিভিয়ান ডিরোজিও। ইহাঁর নাম বোধ হয় তোমরা শুনিয়াছ। ভক্তিভাজন রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের জীবনচরিত বলিবার সময় ইহাঁর নাম বোধ হয় করিয়াছি। ইনি জাতিতে ফিরিঙ্গী ও বয়সে বালক ছিলেন। তখন ইহাঁর বয়স ১৯।২০র অধিক হইবে না। কিন্তু বুদ্ধি, বিদ্যা, উৎসাহ, স্বাধীন-চিত্ততা, স্বদেশানুরাগ, সত্য-প্রিয়তা প্রভৃতি গুণে ইনি কালেজের ছাত্রদিগের অতিশয় প্রিয় ছিলেন। অল্প দিনের মধ্যে ছাত্রেরা ইহাঁর এত বশবর্ত্তী হইয়া পড়িল যে ইহাঁর মুখের দুইটা কথা শুনিবার জন্য দলে দলে ছেলে সর্ব্বদা ইহাঁকে ঘিরিয়া থাকিত। ইহাঁর একটা কথায় যে কাজ হইত,

কালেজের কর্ত্তৃপক্ষদিগের দশ ঘা বেতের ভয়ে তাহা হইত না। ইনি চাকুরীর দায়ে শিক্ষকের কাজ করিতেন না, কিন্তু কিসে ছেলেদের হৃদয় মনের উন্নতি হয় সেজন্য যেন প্রাণ মন সমর্পণ করিয়াছিলেন। সচরাচর স্কুল বসিবার এক ঘণ্টা কি দেড় ঘণ্টা আগে স্কুলে আসিতেন এবং স্কুল বন্ধ হওয়ার এক ঘণ্টা দেড় ঘণ্টা পরে বাড়ী যাইতেন। এই অতিরিক্ত সময়ে তাঁহার আর কোন কাজ ছিল না, কেবল ছেলেদিগকে লইয়া বসিয়া নানা বিষয়ে উপদেশ দিতেন। এই দলে কৃষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায়, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, রামগোপাল ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রাধানাথ শিকদার, হরচন্দ্র ঘোষ, শিবচন্দ্র দেব, রামতনু লাহিড়ী ও মহেশচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি ছিলেন। ইহাঁরা সকলেই দেশের বড় লোক হইয়াছিলেন। ডিরোজিও সাহেব কথা কহিবার সময় কোন বিষয় ছাড়িতেন না। ছেলেদিগকে দেশ প্রচলিত পৌত্তলিকতার ভ্রম দেখাইয়া দিতেন, অন্যান্য সামাজিক কুরীতির দোষ দেখাইতেন এবং তাহাদিগকে সাহসী ও সত্য-প্রিয় হইতে উৎসাহিত করিতেন। ক্রমে ছেলেদের মনে আগুণ জ্বলিয়া উঠিল। উপরের উল্লিখিত যুবকগণ সাহসের সহিত হিন্দু ধর্ম্মের বিরুদ্ধে কথা বলিতে লাগিলেন এবং হিন্দু ধর্ম্ম বিরুদ্ধ কাজ করিতে লাগিলেন। কলিকাতা সহরে বড় গোলমাল উপস্থিত হইল। সর্ব্বনাশ হইল, জাতি ধর্ম্ম গেল, হিন্দুয়ানি লোপ পাইল, বলিয়া যেখানে সেখানে লোকে শোক করিতে লাগিল। যে রাধাকান্ত দেব ইংরাজী স্কুল খুলিবার জন্য মহামতি হেয়ার সাহেবের সহায় হইয়াছিলেন তিনি আবার ঘুরিয়া বসিলেন। তিনি রামমোহন রায়ের ব্রহ্মসভার বিপক্ষতাচরণ করিবার জন্য এক ধর্ম্ম-সভা স্থাপন করিলেন। ধর্ম্ম-সভার সভ্যগণ দলবদ্ধ হইয়া ডিরোজিও সাহেবকে হিন্দু কালেজ হইতে তাড়াইবার জন্য কোমর বাঁধিলেন। তাঁহাদের ইচ্ছা পূর্ণ হইল। ডিরোজিও বাধ্য হইয়া কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেন। ওদিকে বাড়ীতে কৃষ্ণমোহন ও তাঁহার বন্ধুদের উপর ভয়ানক উপদ্রব আরম্ভ হইল। পাড়ার লোক ও আত্মীয় কুটুম্ব একত্র হইয়া কৃষ্ণমোহনের অভিভাবকদিগকে লওয়াইয়া কৃষ্ণমোহনকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিল। কৃষ্ণমোহন এই সময়ে হেয়ার সাহেবের স্কুলে দ্বিতীয় শিক্ষকের কাজ করিতেন। একবার পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বের কথা মনে কর। সে সময়ে একজনকে সমাজচ্যুত করিলে তাহাকে কি ভয়ানক কষ্ট পাইতে হইত একবার ভাবিয়া দেখ! কৃষ্ণমোহন সেই সমুদয় কষ্ট সহিয়া থাকিলেন তথাপি সমাজের লোকের ভয়ে বিশ্বাসের বিপরীত আচরণ করিতে পারিলেন না। এই সময়ে তিনি 'ইনকোয়ারার' নামে একখানি ইংরাজী কাগজ লিখিতেন। ঐ কাগজে স্বাধীন ভাবে সকল বিষয়ের সমালোচনা করিতেন, এবং যাহাতে দেশের কুসংস্কার দূর হয়, কুরীতি সকল সংশোধন হয়, নীতির উন্নতি হয়, সেই চেষ্টা করিতেন। এই সময়ে বিখ্যাত খ্রীষ্টীয় পাদরি ডাক্তার ডফের সহিত তাঁহার পরিচয় হইল। সাহেব তাঁহাকে ধর্ম্ম বিষয়ে উপদেশ দিতে লাগিলেন। অল্পদিনের মধ্যে তাঁহার বন্ধু মহেশচন্দ্র ঘোষ খ্রীষ্ট ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। দেশ মধ্যে গণ্ডগোল উপস্থিত হইল। দেখিতে দেখিতে কৃষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায়ও খ্রীষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন।

ইহার পরে তাঁহার জীবনে আর বিশেষ

আন্দোলন বা পরিবর্ত্তন দেখা যায় না। তিনি খ্রীষ্টান হওয়ার পর কিছু দিন খ্রীষ্টান পাদরিদিগের স্কুলে কর্ম্ম করেন; তৎপরে শিবপুরে বিশপস্ কালেজে গিয়া কিছুকাল খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম-শাস্ত্র ভাল করিয়া পাঠ করেন। এই সময়ে তিনি হিব্রু, গ্রীক, লাটিন ও সংস্কৃত ভাষা ভাল করিয়া শিখিয়াছিলেন। তাঁহার জন্য কলিকাতায় হেদুয়ার নিকটে একটী গির্জ্জাঘর নির্ম্মাণ করা হয়; উহাকে লোকে এখনও "কেষ্টো বন্দ্যোর গির্জ্জা" বলিয়া থাকে। তিনি ঐ ভজনালয়ে নিয়মিত-রূপে ধর্ম্মোপদেশ দিতেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি বাঙ্গলা ও ইংরাজিতে অনেক গ্রন্থ রচনা করেন; তন্মধ্যে "ষড় দর্শন সংবাদ" নামক গ্রন্থ প্রসিদ্ধ ও তাহাতে তাঁহার বিদ্যা ও বুদ্ধির বিশেষ পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। "এরিয়ান উইটনেস" নামক ইংরাজীতে এক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ রচনা করেন তাহাতেও তিনি জগতে যশস্বী হইয়াছেন। ১৮৭৬ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহার প্রতি সম্মান প্রকাশ করিবার জন্য তাঁহাকে ডাক্তার উপাধি প্রদান করেন।

শেষ দশায় লোকে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে, আর কোন কাজ করিতে পারে না, কিন্তু ডাক্তার কৃষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায় মৃত্যুর কয়েক দিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত দেশের উপকারের জন্য খাটিয়াছেন। তিনি জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত ভারত সভার সভাপতি ছিলেন। তিনি যে কাজ করিতেন তাহাতেই তাঁহার সাহস ও স্বাধীন-চিত্ততার পরিচয় পাওয়া যাইত। তিনি কখনই মনুষ্যকে ভয় করেন নাই; ও অন্যায় সহ্য করিতে পারিতেন না। দেশের লোকের হইয়া ইংরাজদের সহিত সর্ব্বদা ঝগড়া করিতেন; কলিকাতায় মিউনিসিপালিটীর কমিশনর ছিলেন সেখানে তিনি অকুতোভয়ে সত্য ও ন্যায়ের পক্ষ অবলম্বন করিতেন। আমরা কতদিন দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছি কোথায় বৃদ্ধ বয়সে একটু আরামে থাকিবেন, না, কেবল স্বদেশের উন্নতির জন্য পরিশ্রম করিতেছেন। তিনি এজন্য যেরূপ পরিশ্রম করিতেন, অনেক যুবা পুরুষকেও তাহা করিতে দেখা যায় না। এইরূপে স্বদেশের জন্য খাটিতে খাটিতে ও চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার বল শক্তি হ্রাস হইয়া আসিল; তাঁহার কি প্রকার রোগ জন্মিল, তাহা কেহ ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলেন না। অবশেষে বিগত ১১ইমে সোমবার ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার দুই কন্যা ও কয়েকটী দৌহিত্র ও দৌহিত্রী জীবিত আছেন। তাঁহার মৃত শরীর তাঁহারই ইচ্ছা ক্রমে শিবপুরের গোরস্থানে তাঁহার মৃত পত্নীর কবরের মধ্যে একত্র গোর দেওয়া হইয়াছে।

যে দিন তাঁহাকে গোর দেওয়া হয় সে দিন খ্রীষ্টান নন এমন অনেকেও শোক প্রকাশের জন্য তাহার মৃতদেহের সঙ্গে সঙ্গে গিয়াছিলেন। তৎপরে এক দিবস ভারত সভার সভ্যগণ দলবদ্ধ হইয়া তাঁহার গোরস্থান দেখিতে গিয়াছিলেন।

বালক বালিকাগণ! যাঁহার জীবনচরিত তোমাদিগকে শুনাইলাম, তিনি খ্রীষ্ট ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন বলিয়া কি তাঁহাকে ঘৃণা করিবে? এমন কাজ কখনই করিওনা। যে বিশ্বাসের মত কাজ না করে সে মানুষ মানুষই নয়। যদিও ভ্রমে পড়িয়াই হউক বা আর যেরূপেই হউক যখন তাঁহার খৃষ্ট ধর্ম্মে আস্থা হইল, তখন নিজের বিশ্বাস অনুসারে কাজ করাই তাঁহার পক্ষে উচিত হইয়াছিল। এরূপ না করিলে তাঁহাকে বড়লোক বলিতাম না। তিনি যদি

কাপুরুষের ন্যায়, অপদার্থ লোকদিগের ন্যায়, মনে এক প্রকার বিশ্বাস রাখিয়া কাজে আর এক প্রকার করিতেন, তাহা হইলে আর তাঁহার জীবন-চরিত লিখিবার জন্য কলম ধরিতাম না। তাঁহার সঙ্গে আমাদের মিল না হউক, তিনি যে সাহসী বীরের ন্যায় নিজ বিশ্বাসের মত কাজ করিতে পারিয়াছিলেম, এজন্য আমরা তাঁহার প্রশংসা করি।

এক দিকে যেমন তাঁহার নিজ বিশ্বাসের মত কাজ করিবার সাহস ছিল অপর দিকে আশ্চর্য্য প্রতিজ্ঞার বল ছিল। ৬০ বৎসর ধরিয়া একচিত্তে আপনার উন্নতি ও স্বদেশের মঙ্গল সাধনের চেষ্টা করিয়াছেন। ৬০ বৎসরের পরিশ্রমের কথা স্মরণ কর। কয়জন লোকে এমন দৃঢ় প্রতিজ্ঞতার সহিত নিজের ও অপরের কল্যাণসাধনের চেষ্টা করে? ইহা কি প্রশংসার বিষয় নয়? যে ব্যক্তি বৃদ্ধাবস্থা পর্য্যন্ত আমাদের জন্য এত খাটিলেন, আমরা কি এমনি কৃতঘ্ন পামর যে তিনি নিজ বিশ্বাস অনুসারে কাজ করিবার নিমিত্ত বিধর্ম্মী হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা দেখাইব না? ছি ছি! তাহা হইলে ঈশ্বরের চক্ষে অপরাধী হইব। তবে এস পাঠক পাঠিকা! সকলে মিলিয়া সর্ব্বান্তঃকরণে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি যে তিনি তাঁহার পরকালগত আত্মাকে চিরজীবনের পরিশ্রমের পুরস্কার প্রদান করুন।

আশ্চর্য্য উদ্ভিদ।

মনুষ্য কিম্বা পশুদিগের যেমন হাত পা, নাক মুখ চোক আছে; তাহারা যেমন শব্দ করিয়া চিৎকার করে, সেইরূপ সময়ে সময়ে উদ্ভিদের মধ্যেও দেখা যায়। এ বিষয়ে অনেক কথা শুনিতে পাওয়া যায়। এক রকম ছোট ছোট গাছ আছে, তাহাদিগকে ইংরাজিতে ম্যাণ্ড্রেক বলে। এক ম্যাণ্ড্রেক গাছের বিষয় কথিত আছে যে, তাহাকে মাটি হইতে তুলিলে সে চেঁচাইয়াছিল। মেজ নামক এক স্থান আছে, তথায় এক য়িহুদীর আর একটা ম্যাণ্ড্রেক ছিল; তাহার মানুষের মত মাথা ও বাকি সব মোরগের মত। সে লাভেণ্ডরের শস্য ও এক রকম মাটির পোকা খাইয়া পাঁচ সপ্তাহ বাঁচিয়াছিল। এই রকম কত ঘটনাই শুনিতে পাওয়া যায়।

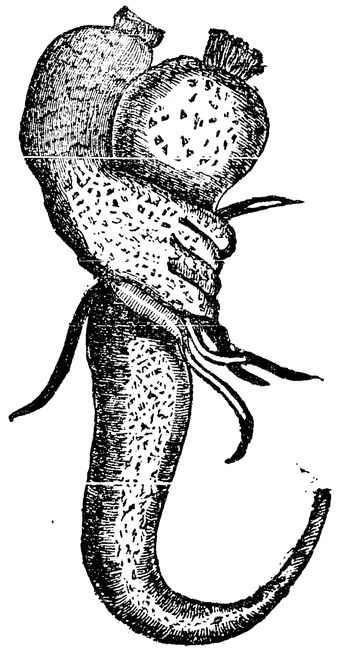

পূর্ব্ব পৃষ্ঠায় ছবিটী দেখ। একটী মূলা আর একটীকে জড়াইয়া আছে। যেমন একটা মানুষের হাত একটা মূলা ধরিয়াছে। কেমন আঙ্গুল গুলি স্পষ্ট স্পষ্ট। এই মূলা যোড়াটী এক-জন বাজারে বিক্রয় করিতে আনে। হঠাৎ এক চিত্রকর তাহা দেখিতে পাইয়া অবিকল চেহারা তুলিয়া লয়। তাহা হইতে এখন অনেক ছবি প্রস্তুত হইয়াছে। আর একটী মূলা দেখ :—

মূলাটী ঠিক আমাদের হাতের মত হইয়াছে। কেমন পাঁচটী আঙ্গুল! কেমন আমাদের আঙ্গুলের মত ভাগ করা। বুড়া আঙ্গুলের নখটী পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছে। উপরের মূলার শাক আঁকা না থাকিলে কাহার সাধ্য যে, ইহা কি ঠিক করে। এটী ইংরাজি ১৮০২ সালে বিলাতের বার্মিংহাম নগরের যাদুঘরে সকলের দেখিবার জন্য রাখা হয়। কত লোক কত টাকা দিতে চাহিয়া ছিল; তবু এমন আশ্চর্য্য জিনিষ বিক্রয় করা হয় নাই।

পাঠক পাঠিকাগণ! ভগবানের সকল কাজই আশ্চর্য্য। যে গুলির কথা পড়িলে ওগুলি খুব আশ্চর্য্যের। এখন আর একটীর কথা শুন।

আচ্ছা, এই যে ছবি দেখিতেছ ইহা দেখিয়া তোমাদের কি মনে হয়? কেহ মনে করিতেছ একটা মানুষ হাতে পায়ে শিকড় জড়াইয়া বসিয়া আছে; মাথায় কেহ কতকগুলা পাতা বসাইয়া দিয়াছে। আর কেহ হয়ত আর কত কি ভাবিতেছ। কিন্তু ইহা কি শুনিবে? একটা শালগম। জর্ম্মাণি দেশে উইডান নামে এক গ্রাম আছে। ইংরাজি ১৬২৮ সালে, সেখানে এক চাষার অনেক শালগমের চাষ হয়। সে প্রত্যহ কিছু কিছু উপড়াইয়া বাজারে বিক্রয় করিত। একদিন সকালে সে আস্তে আস্তে এক শালগম তুলিয়াছে। দেখে, শালগমের চেহারা অবিকল মানুষের মত। চোক, নাক, কান, মুখ সব আছে!

পায়ের উপর পা রাখিয়া, হাতের উপর হাত রাখিয়া, যেমন একটী মানুষ বসিয়া আছে। পা হইতে চারিদিকে সিকড় বাহির হইয়াছে। এ অদ্ভুত শালগম দেখিয়া সকলে অবাক্ হইল। চারি দিক হইতে তাহা দেখিবার জন্য দলে দলে লোক আসিতে লাগিল। যাহারা চিত্র করিতে জানিত তাহারা ছবি আঁকিয়া লইতে আরম্ভ করিল। কত লোক সৃষ্টিকর্ত্তা পরমেশ্বরের মহিমায় মোহিত হইয়া গেল। যাহাদের দেখিবার ক্ষমতা ছিল তাহারা দেখিল যে তাঁহার কি আশ্চর্য্য শক্তি!

কাক ও কোকিল।

দুই পাখী এক আম ডালে,
বসিয়াছে দুপহর কালে।
গম্ গম্ রৌদ্র যেন অগ্নিবৃষ্টি হয়!
নীরব সে গ্রাম যেন নিশুতি সময়!
দুই পাখী আসি হেন কালে,
বসিয়াছে পাতার আড়ালে।

কাক বলে;—"আমরা দুজন
এক বর্ণ—একই গঠন।
যেন দুটী ভাই করে গড়েছে বিধাতা;
এক রূপকান্তি যেন এক জন্মদাতা:
এক নীড়ে হয়েছি পালন,
ভাই ভাই আমরা দুজন।"

"তাই বটে"—বলিল কোকিল,
"লোকগুলা বড়ই কুটিল!
কি আছে প্রভেদ দেখ তোমায় আমায়,
আমারে খাঁচায় পোষে তোমারে খেদায়।"

শুনে কাক প্রফুল্ল হইল,
বাঃ বাঃ করে ডাকিয়া উঠিল।

কোথা ছিল একদল ছেলে,
উপস্থিত সেই তরুতলে।
দূর্ দূর্ মার্ মার্ করে ঢিল মারে;
কি বিপত্তি! কাক ভায়া বসিতে না পারে!
সরে সরে বসিছে আড়ালে,
ঢিল বৃষ্টি করে শিশুদলে।

শেষে কাক উড়িয়া পলায়;
যাঃ যাঃ করে ডেকে ডেকে যায়।
পাতা মাঝে লুকাইয়ে আছিল কোকিল,
সেথা না দেখিল শিশু না মারিল ঢিল।
বসি বসি—শেষে সাড়া দেয়,
শিশুগণ চারিদিকে চায়।

শুনি কুহু তারা কুহু করে,
কুহু-কুহু তাহার উত্তরে।
বালকে কোকিলে কুহু দেশ ছেয়ে যায়!
কুঞ্জে কুঞ্জে প্রতিধ্বনি সে বন জাগায়!
শুনে কাক মনে মনে করে,
গুণ দেখে, আদর সংসারে।

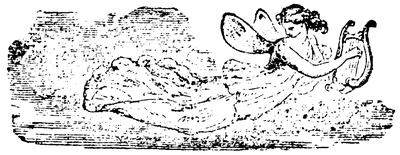

কলির কুম্ভকর্ণ।

নরা সকলেই বোধ হয় রাবণের ভাই কুম্ভকর্ণের কথা শুনিয়াছ। সে ছয় মাস ঘুমাইত আর ছয়মাস জাগিয়া থাকিত। এ কথাটা অনেকেই বড় বিশ্বাস

কল্লে না; বলেন ওটা গল্প বই আর কিছুই নয়। কিন্তু একটী ইংরাজ পণ্ডিত যে এক আশ্চর্য্য ঘটনার কথা বলিয়াছেন তাহা শুনিলে আর কুম্ভকর্ণের কথা গল্প বলিয়া বোধ হয় না।

ইংলণ্ডে বাথ্ নামে একটী স্থান আছে। তাহার নিকট এক গ্রামে ১৬৯৪ খৃঃ স্যামুয়েল চিল্‌টন্ নামে ২৫ বৎসর বয়স্ক এক শ্রমজীবী বাস করিত। সে খুব দৃঢ়কায় ও বলবান ছিল। ঐ বৎসরের ১৩ই মে তারিখে হঠাৎ সে অতিশয় ঘুমাইয়া পড়ে; তাহার ঘুম ভাঙ্গিবার জন্য অনেক চেষ্টা করা হইলেও এক মাসের পূর্ব্বে তাহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল না। একমাস পরে উঠিয়া পুনরায় সে পূর্ব্বের মত খাইতে ও চলিতে লাগিল কিন্তু আর এক মাসের মধ্যে একটীও কথা কহিল না।

দুবছর সে বেশ ভালই রহিল। ১৬৯৬ খৃঃ অব্দের এপ্রেল মাসে আবার সেই ঘুম উপস্থিত! এই বার একটী ডাক্তার বিলিষ্টার ও অন্যান্য অনেক উগ্র ঔষধ দ্বারা তাহার ঘুম ভাঙ্গিতে চেষ্টা করিলেন কিন্তু কিছু হইল না! তাহার বিছানার নিকট কতক খাবার সামগ্রী রাখা হইত সে সময়ে সময়ে আহার করিত ও মধ্যে মধ্যে বমী করিত কিন্তু কেহ তাহাকে এই সব করিতে দেখিতে পায় নাই। কখনও বা তাহার হাতে খাওয়ার থাকিত কখনও বা মুখে থাকিত কিন্তু সে ঘুমাইয়া পড়িত। এই রকমে প্রায় ১০ সপ্তাহ অতীত হইল তবুও সে ঘুমের হাত হইতে একেবারে নিস্তার পাইল না। এই সময়ের মধ্যে সে একবার মাত্র প্রস্রাব করিয়াছিল।

যে সাহেব এই গল্পটী বলিয়াছেন তিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন। তিনি যাইয়া চিম্‌টী কাটিলেন, নাক মলিলেন, নাক মুখ বন্ধ করিয়া ধরিলেন কিছুতেই কিছু হইল না। এই রূপে নবেম্বর মাস পর্য্যন্ত রহিল। ১৯শে নবেম্বর তারিখে তাহার মাতা একটা চীৎকারের শব্দ শুনিলেন; যাইয়া দেখেন যে তার ঘুম ভাঙ্গিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলেন "কেমন আছ?" সে ব্যক্তি বলিল "বেশ আছি কিঞ্চিৎ খাইতে দাও।" মা খাবার আনিতে এবং তাহার ভাইকে এই সংবাদ দিতে গেলেন; আসিয়া দেখেন আবার ঘুম!! এই ঘুম জানুয়ারির শেষ পর্য্যন্ত ছিল। কিন্তু এ সময়ে ঘুমটা তত পাকা হয় নাই; লোকটী সকলের কথা শুনিতে পাইত বটে কিন্তু উত্তর দিতে পারিত না।

ধাঁধা।

এপ্রিল মাসের ধাঁধার উত্তর।

১ম। কাগজ।

২য়। প্রত্যেক পুত্র ১১১ ১টী আম পাইবে।

১ম পুত্র, ১ম, ৭ম, ১৯শ, ২৩শ, ২৫শ, ৩৬শ,
২য় „ ২য়, ৬ষ্ঠ, ১২শ, ২৪শ, ৩৩শ, ৩৪শ,
৩য় „ ৩য়, ৫ম, ২০শ, ২১শ, ৩০শ, ৩২শ,
৪র্থ „ ৪র্থ, ৮ম, ১৬শ, ১৭শ, ৩১শ, ৩৫শ,
৫ম „ ৯ম, ১১শ, ১৫শ, ২২শ, ২৬শ, ২৮শ,
৬ষ্ঠ „ ১০ম, ১৩শ, ১৪শ, ১৮শ, ২৭শ, ২৯শ,

নূতন।

১ম। রাম এবং যদু দুইজনে তিনটী ভাঁড় লইয়া বাজারে তৈল ক্রয় করিতে গিয়াছিল। রামের নিকট দুইটী ভাঁড় ছিল; ১টী ৫ সেরী এবং অপরটী ৩ সেরী। যদুর নিকট কেবলমাত্র একটী ৮ সেরী। ভাঁড় ছিল। ৮ সেরী ভাঁড় পূর্ণ করিয়া তৈল ক্রয় করিয়া লইয়া আসিল; অর্দ্ধেক পথ একসঙ্গে আসিয়া তাহারা দুই জনে দুই পথে যাইবে, এখন তাহারা কি উপায়ে তৈল ভাগ করিয়া লইবে বল দেখি?

জুলাই, ১৮৮৫।

স্বর্গীয় প্রমদাচরণ সেন।

বিখার পাঠক পাঠিকাগণ! আজ তোমাদের কাছে কি কথা বলিতে যাইতেছি। কোথায় আমরা ভাবিতেছিলাম গঙ্গাধর কবিরাজের জীবনচরিত লিখিব;—না এ কি লিখিতে হইল! উপরে যাঁহার ছবি দেখিতেছ, উহাঁকে কি তোমরা চেন? উহাঁর নাম প্রমদাচরণ সেন। উনিই তোমাদের জন্য "সখা" বাহির করিয়াছিলেন। এই "সখা" যাহাতে ভাল হয়, ইহা পড়িয়া যাহাতে তোমাদের উপকার হয়, যাহাতে তোমরা আমোদ ও উপদেশ পাও সে জন্য উনি সারা মাস ভাবিতেন। এই "সখার" জন্য উনি কি খাটুনি খাটিয়াছেন তাহা তোমরা জান না। দেশ বিদেশ হইতে ভাল ভাল বই আনাইয়াছেন, ভাল ভাল ছবি সংগ্রহ করিয়াছেন, কত বই পড়িয়াছেন, সে পরিশ্রম তোমরা কেহ দেখ নাই। এত যে খাটিতেন কেবল এই জন্য যে দেশের বালক বালিকাদের পড়িয়া উপকার হইবে।

সেই প্রমদাচরণ সেন আর নাই। প্রায় এক বৎসর কঠিন রোগে কষ্ট পাইয়া, গত ২১এ জুন রবিবার পরলোকে গমন করিয়াছেন। ইনি সবে ২৬ বৎসর ছাড়াইয়া ২৭ বৎসরে পা দিয়াছিলেন। এত অল্প বয়সে মানুষ মারা পড়িলে কার না দুঃখ হয়? তাহাতে আবার প্রমদাচরণের মত লোক বেশী মেলে না; সুতরাং ইহাঁর মৃত্যুতে যে আমরা কি ব্যথা পাইয়াছি তাহা তোমাদিগকে বলিতে পারি না। এমন উৎসাহী, সত্যপরায়ণ, ধার্ম্মিক লোক কি আমরা আর পাইব? তাঁহার জীবনচরিত কিছু বলি শুন।—

১৮৫৯ সালে অর্থাৎ ২৬ বৎসর পূর্ব্বে কলিকা-

তার নিকটস্থ ইটালী নামক স্থানে ১৮ই মে তাঁহার জন্ম হয়। তখন তাঁহার পিতা সেখানে পুলিসে একটা কর্ম্ম করিতেন।

ছেলে বেলায় প্রমদাচরণ তাঁহার পৈতৃক বাসগ্রাম সেনহাটীতে গুরু মহাশয়ের পাঠশালায় লেখা পড়া শিখিতে আরম্ভ করেন। পড়া শুনায় তিনি বরাবর ভাল ছিলেন। পল্লীগ্রামে দুষ্ট ছেলেদের সঙ্গে পড়িয়া ছেলেরা অনেকে দুষ্টামি শিক্ষা করে। প্রমদাচরণও দুষ্ট বালকদের দেখাদেখি যদি কখনও কোন দুষ্টামি করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার পিতা ও জ্যেষ্ঠ সহোদর তাঁহাকে খুব শাস্তি দিতেন। ৭ বৎসর বয়সের সময় তাঁহার জননীর মৃত্যু হয়। যার সংসারে মা নাই তার কেহ নাই। মায়ের মৃত্যুর পর প্রমদাচরণের পিতা ও তাঁহার দাদা তাঁহাকে অত্যন্ত যত্ন করিতেন কিন্তু তবু তিনি বড় হইয়াও মা নাই বলিয়া কত দুঃখ করিতেন। বালককালে সৎসঙ্গ ও সদুপদেশ না পাওয়াতে ছেলেদের কত ক্ষতি হয়, তাহা তিনি বুঝিয়াছিলেন। বালককালে কত সময় বৃথা গিয়াছে, কত অন্যায় কাজ হইয়াছে, বড় হইলে তাহা স্মরণ করিয়া অনেক দুঃখ করিতেন। এই জন্যই বোধ হয়, তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, বালক বালিকাদিগের উন্নতির জন্য একটা কিছু করিবেন এবং সেই জন্যই বোধ হয় "সখা" বাহির করিয়াছিলেন।

পাঠশালা হইতে প্রমদাচরণ গ্রামের ইংরাজী স্কুলে ভর্ত্তি হন। এই স্কুলে কিছুকাল পড়িয়া যশোহরের গবর্ণমেণ্ট স্কুলে কয়েক বৎসর অধ্যয়ন করেন; তথা হইতে কোন কারণ বশতঃ পুনরায় নিজ গ্রামে আসিয়া বাঙ্গলা স্কুল হইতে ১৮৭২ সালে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা দেন। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতায় পড়িবার জন্য আসিলেন। তিনি কলিকাতায় আসিয়া খুব মনোযোগ দিয়া পড়িতে লাগিলেন। হেয়ার সাহেবের স্কুলে তিনি এক জন ভাল ছেলে ছিলেন।

হেয়ার সাহেবের স্কুলে প্রমদাচরণ যখন প্রথম ভর্ত্তি হন, তখন তাঁহার বয়স ১৩।১৪র অধিক হইবেনা; তখনই সকল ভাল বিষয়ে তাঁর অত্যন্ত উৎসাহ দেখা যাইত। একবার মান্দ্রাজ দেশে দুর্ভিক্ষ হয়, প্রমদাচরণ সে সময় হেয়ার স্কুলের ছেলেদের নিকট হইতে অনেক টাকা তুলিয়া দিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন ঐ স্কুলে ক্লাসের ছেলেদিগকে লইয়া একটী সভা করিয়াছিলেন, তাহাতে নানা ভাল বিষয়ের চর্চ্চা হইত। তিনি এই সময়েই বেশ বক্তৃতা করিতে পারিতেন; বক্তৃতা করিবার ক্ষমতা তাঁহার ছেলেবেলা হইতেই ছিল।

১৮৭৬ সালে এই স্কুল হইতে তিনি এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় একটী বৃত্তি পান। ইহার পর তিনি কিছুকাল প্রেসিডেন্সী কালেজে পড়েন। এই সময়ে তাঁহার 'গিলক্রাইষ্ট' পরীক্ষা দিয়া বিলাত যাইয়া পড়িবার ইচ্ছা বড়ই প্রবল হইল। 'গিলক্রাইষ্ট' পরীক্ষা দিতে হইলে চারি ভাষায় পরীক্ষা দিতে হয়; প্রেসিডেন্সী কালেজে পড়িলে সংস্কৃত ভিন্ন অন্য কোন ভাষা শিক্ষা করিতে পারিবেন না বলিয়া সেণ্টজেভিয়ার্স কালেজে ভর্ত্তি হন।

তাঁহার সংস্কৃত জানা ছিল, সুতরাং এল, এ পরীক্ষা দিবার জন্য তিনি সেণ্টজেভিয়ার্স কালেজে সংস্কৃতের পরিবর্ত্তে লাটিন এবং বাটীতে বসিয়া ফ্রেঞ্চ শিক্ষা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে এল, এ এবং 'গিলক্রাইষ্ট' পরীক্ষার জন্য পড়িতে লাগিলেন। এই দুই পরীক্ষার জন্য

এক সময়ে প্রস্তুত হওয়া কিরূপ কষ্টকর তাহা যাঁহারা দিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন।

১৮৭৮ সালে তিনি এল, এ পরীক্ষা দেন,—তাঁহার এক বিষয়ের লিখিত কাগজ দিতে একটু দেরী হইয়াছিল বলিয়া জনৈক সাহেব তাঁহার কাগজ ছিঁড়িয়া ফেলেন, এই জন্য তিনি সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলেন না।

১৮৭৯ সালে তিনি 'গিলক্রাইষ্ট' পরীক্ষায় তৃতীয় হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু বৃত্তি পান নাই। এই জন্য তিনি নিতান্ত হতাশ না হইয়া অন্য কি উপায়ে বিলাত যাইয়া পড়িতে পারেন তাহাই ভাবিতে আরম্ভ করিলেন। এই বৎসরে তিনি ক্যাথিড্র্যাল মিসন কালেজে এল, এ পড়িতেছিলেন কিন্তু তাঁহার পিতার সহিত কোন বিষয়ে মতান্তর হওয়াতে তিনি এত অল্প বয়সেই কালেজ ছাড়িয়া দিয়া কাজ কর্ম্মের চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

নকিপুর এণ্ট্রান্স স্কুলে তিনি কিছু দিন প্রধান শিক্ষকের কাজ করেন। এই স্কুল উঠিয়া গেলে কিছু দিন পরে তিনি কলিকাতার সিটি স্কুলে এক শিক্ষক হন।

তিনি কেবল পরীক্ষার বইগুলি পড়িয়া সন্তুষ্ট হইতেন না; ভাল বই দেখিলেই কিনিতেন ও পড়িয়া ফেলিতেন। বাড়ী হইতে যে টাকা পাইতেন, তাহাতে বই কেনার ব্যয় কুলাইতনা বলিয়া নিজে 'প্রাইভেট' পড়াইয়া সেই টাকাতে বই কিনিতেন। তিনি অল্প বয়সেই কালেজ ছাড়িয়া কর্ম্মকাজে লাগিয়াছিলেন অথচ নিজে ঘরে বসিয়া এত ভাষা শিখিয়াছিলেন ও এত বিষয় জানিয়াছিলেন যাহা তাঁহা অপেক্ষা অনেক বড় বয়সের লোকে জানে না।

কালেজ ছাড়িয়া যখন কর্ম্ম করিতে লাগিলেন, তখন মনে দেশের কিছু ভাল কাজ করিবার ইচ্ছা প্রবল হইল। তিনি ছোট ছোট ছেলেদিগকে বড় ভাল বাসিতেন। ভাবিতে লাগিলেন তাঁহাদের উন্নতির জন্য কি করা যায়। তিনি সিটি স্কুলের মাষ্টার ছিলেন, কিন্তু ছেলেদিগকে একটু পড়াইয়াই তাঁহার মন সন্তুষ্ট হইত না। তাহাদের চরিত্র কিসে ভাল হয় এই চিন্তা সর্ব্বদা করিতেন। ছেলেদের সঙ্গে সর্ব্বদা মিশিতেন, খেলিতেন, গল্প করিতেন। ক্রমে 'সখার' ভাব তাঁহার মনে আসিল এবং অনেক দিনের পরিশ্রমের পর ১৮৮৩ সালের জানুয়ারি মাসে 'সখা' প্রকাশ করিলেন।

এই 'সখা'র জন্য তিনি কত খাটিয়াছেন আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি। না খাইয়াও ইহার জন্য টাকা জমান, রাত্রি জাগিয়া পড়া, ইহার ছবি যোগাড় করিবার জন্য ঘুরিয়া বেড়ান, এই করিতে করিতে তাঁহার শরীর শীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। এই 'সখা' তিনি যখন বাহির করিলেন তখন অনেকে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, এ কাগজ টেকিবে না, ইহা চালাইলে ক্ষতি হইবে, এ কাগজ ভাল হইবে না; এমন কি তাঁহার অনেক বন্ধু বান্ধবে তাঁহাকে নিরাশ করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি যে কাজ ভাল বলিয়া বুঝিলেন তাহা সহজে ছাড়িতেন না। তিনি কাহারও কথায় ভয় না পাইয়া ইহার উন্নতির জন্য মন প্রাণ সমর্পণ করিলেন এবং অবশেষে উন্নতি করিয়া তুলিলেন।

তিনি যেমন সহজে দমিতেন না, তেমনি নিজের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহার বড় হইবার প্রতিজ্ঞা ছিল। 'সখা'র যে এত উন্নতি করিয়াছিলেন, এ বিষয়ে কোন বড় লোকের দ্বারস্থ হন নাই। পরিচিত অনেক বড় লোক ছিলেন 'সখা'র জন্য কখনও কাহার নিকট উপযাচক হন নাই। নিজের

উপর নির্ভর করিয়া নিজে দাঁড়াইব, এই তাঁর মনের আকাঙ্ক্ষা ছিল।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে,তাঁহার ইংলণ্ডে যাইয়া লেখা পড়া শিখিবার ও নিজের উন্নতি করিবার ইচ্ছা বড় প্রবল ছিল; তাঁহার ইচ্ছা ছিল যে, 'গিল-ক্রাইষ্ট' পরীক্ষা দিয়া বৃত্তি পাইলে ইংলণ্ডে যান। কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য না হইয়া এখানে বসিয়া বিলাতের বি, এ পরীক্ষা দিবার চেষ্টা করেন। বিলাতের ইউনিভার্সিটির রেজিষ্ট্রার এক রকম স্বীকার করিয়াছিলেন কিন্তু কলিকাতার ইউনিভার্সিটির অধিকাংশ সভ্যের মত হইল না। এখানে থাকিয়া বিলাতের পরীক্ষা দেওয়া যাইতে পারে কি না এ বিষয়ে বিলক্ষণ আন্দোলন হইয়াছিল, কিন্তু তিনি পরীক্ষা দিবার অনুমতি প্রাপ্ত হইলেন না। অবশেষে বিলাত যাইবার জন্য টাকা সংগ্রহের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এ বিষয়েও অনেকে তাঁহাকে নিরুৎসাহ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; এমন কি যাঁহাদিগকে তিনি পিতৃতুল্য ভক্তি করিতেন সেই সকল গুরুজনও তাঁহার ইংলণ্ডে যাওয়ার বিরোধী ছিলেন কিন্তু তিনি কিছুতেই দমিতেন না। অনেক চেষ্টার পর তাঁহার বিলাত যাওয়া ঠিক হইয়াছিল; তাঁহার দাদা এবং তাঁহার কয়েক জন বন্ধু তাঁহাকে পড়িবার খরচ দিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। সমুদায় স্থির হইল। বিলাত যাইবার জন্য বাটী হইতেও বিদায় লইয়া আসিলেন। কিন্তু বাটী হইতে আসার কিছু দিন পরেই এই কঠিন ব্যারাম হওয়াতে তাঁহার আর ইংলণ্ডে যাওয়া হইল না।

তিনি ভাল ভাল লোকের জীবনচরিত পড়িতে বড় ভাল বাসিতেন এবং "মহৎ জীবনের আখ্যায়িকাবলী" "চিন্তাশতক" এবং "সাথী" নামে তিনখানি বই লিখিয়াছিলেন। তোমাদের অনেকে তাহা পড়িয়া থাকিবে।

এইরূপে খাটিতে খাটিতে তাঁহার শরীর দুর্ব্বল হইয়া আসিল। সেই দুর্ব্বল অবস্থাতেও খাটিতে ছাড়িতেন না। গত বৎসর এই সময় একদিন সিটিস্কুলের ছোট ছোট ছেলেরা তাহাদের সভাতে বক্তৃতা করিবার জন্য তাঁহাকে ধরিল; তিনি ছেলেদের অনুরোধ ছাড়াইতে পারিতেন না, বক্তৃতা করিতে গেলেন। এত জোরে বক্তৃতা করিয়াছিলেন যে, অতিশয় ক্লান্ত হইয়া বাসাতে ফিরিয়া আসিলেন। সেই রাত্রেই তাঁহার মুখ দিয়া অনেক রক্ত উঠিল। তার পরদিন হইতে চিকিৎসা আরম্ভ হইল। এক সময়ে বোধ হইল বুঝি সারিয়া উঠিতেছেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। প্রথমে ডাক্তারি, তৎপরে কবিরাজী, তৎপরে হোমিওপেথি, তৎপরে আবার কবিরাজী, কত রকম দেখা হইল কিছুতেই কিছু হইল না। প্রায় এক বৎসর কাল ক্ষয়-কাশ রোগে ভুগিয়া বিগত ২১ এ জুন রবিবার, খুলনায় মানব লীলা সম্বরণ করিলেন।

তিনি রোগ-শয্যায় পড়িয়াও সর্ব্বদা পরের জন্য ভাবিতেন। তাঁহার অন্যায়ের প্রতি বড় বিদ্বেষ ছিল, একবার তাঁহার একজন আত্মীয় কোন আপীষে কর্ম্ম পাইবার জন্য পরীক্ষা দিলেন। পরীক্ষাতে তিনি সর্ব্ব প্রথম হইলেন তথাপি আপীষের কর্ত্তা ইংরাজ, একটা সামান্য ছল করিয়া তাহাকে কর্ম্ম না দিয়া সে কাজ অন্যকে দিলেন। তিনি তখন বড় পীড়িত; শুনিয়া তাঁহার এত ক্রোধ হইল যে তিনি বলিতে লাগিলেন ;—"কি বলিব আর বল শক্তি নাই, তাহা না হইলে একবার ইহাদের অন্যায় বিচারের কথা কাগজে লিখিতাম।"

তাঁহার যখন অত্যন্ত পীড়া তখন একদিন শুনিলেন যে তাঁহার পরিচিত একটী বালিকাকে লোকে বলপূর্ব্বক একটী বৃদ্ধের সঙ্গে বিবাহ দিতেছে। ঐ বালিকার মাতা অনাথা বিধবা, তাঁহার ইচ্ছা নাই ; তথাপি দেশের লোকে তাঁহাকে জোর জবর করিয়া ঐ কাজ করাইতেছে। ইহা শুনিবা মাত্র তিনি ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন; তাঁহাদের জন্য কতই ভাবিতে লাগিলেন, নিজের টাকা দিয়া তাহাদিগকে কলিকাতায় আনিবার জন্য লোক পাঠাইলেন, কিন্তু তাঁহারা আসিতে পারিলেন না। এজন্য প্রাণে বড় দুঃখ রহিল।

একদিন রোগ-শয্যায় পড়িয়া শুনিলেন যে তাঁহার ভবানীপুরস্থ একজন ব্রাহ্ম বন্ধুও তাঁহার মত ক্ষয়-কাশ রোগে কষ্ট পাইতেছেন, সে বন্ধুটী অতি দরিদ্র। তিনি একজন লোকের হাতে ৫৲টী টাকা দিয়া বলিয়া দিলেন—"তাঁহাকে বলিবেন, ইহা অতি যৎসামান্য হইল, আমি নিজে পীড়িত তাহা না হইলে আমি স্বয়ং গিয়া তাঁহার সেবা করিতাম।"

পিতৃ মাতৃ হীন ছোট ছোট গরিবের ছেলেদিগকে রাস্তা হইতে কুড়াইয়া তাহাদিগের জন্য একটা "আশ্রয়-বাটিকা" নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে রাখিয়া মানুষ করিতে হইবে, এই ইচ্ছা তাঁহার মনে অত্যন্ত প্রবল ছিল। কিছু টাকা হইলে ঐ কাজ করিবেন এই প্রতিজ্ঞা ছিল ; রোগে পড়িয়াও সেই ভাবনা ভাবিতেন; এবং মধ্যে মধ্যে এইরূপ প্রলাপ বকিতেন। তিনি ছোট ছোট ছেলে এত ভাল বাসিতেন যে, এই ত রোগ যাতনা, কথা কহিতে কষ্ট হয় ; তথনও একটী ছোট ছেলে আসিলে তাহার সঙ্গে কত কথা কহিতেন, কত উপদেশ দিতেন, কত উৎসাহ দিতেন

ঈশ্বরের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় বিশ্বাস ও অনুরাগ ছিল। রোগ শয্যায় সর্ব্বদা একখানি ব্রহ্ম-সংগীত তাঁহার বালিশের কাছে থাকিত। গাইতে জানেন এমন কোন লোক দেখিতে পাইলেই ঈশ্বরের নাম গাইতে অনুরোধ করিতেন। নিজের পীড়ার বিষয়ে কৌতুক করিয়া বলিতেন—"আমি পিতার দুষ্টু ছেলে, তাঁর কথা শুনি নাই, স্বাস্থ্যের নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছি, তাই পিতা আমাকে সাজা দিয়াছেন, এত মাস বিছানায় ফেলিয়া কয়েদ করিয়া রাখিয়াছেন।" এই ভাবিয়া রোগ যাতনা সহ্য করিতেন। যেদিন তাঁহার মৃত্যু হয়, সেদিন কিছুক্ষণ পূর্ব্বে তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর প্রভৃতি যখন কাঁদিতে লাগিলেন তখন তিনি বলিলেন "তোমরা কাঁদ কেন, ঈশ্বর আমাকে টানিয়া লইতেছেন।"

তিনি প্রতিদিন যে যে কাজ করিতেন, দৈনন্দিন লিপিতে তাহা লিখিয়া রাখিতেন। সেই দৈনিক বিবরণগুলি পড়িলে দেখা যায় যে, এমন দিন যায় নাই যে দিন তিনি ভাল হইবার জন্য একান্ত মনে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করেন নাই।

গরিবের প্রতি তাঁহার বড়ই দয়া ছিল। এক দিন রাস্তায় এক খোঁড়ার সহিত তাঁহার দেখা হয়, তথায় সে তাঁহাকে নিজের দুঃখ সমুদায় বর্ণনা করিয়া বলে; তিনি এই খোঁড়ার দুঃখ কাহিনী শুনিয়া বড়ই ব্যথিত হইলেন। তাহাকে তাঁহার নিজ বাসায় গাড়ী করিয়া আনিয়া কিছু খাওয়াইয়া সুস্থ করিলেন এবং পরে তাহার দুঃখের কারণ সমুদায় শুনিলেন। তিনি তাহাকে একটী ক্ষুদ্র দোকান করিবার জন্য কিছু টাকা দিলেন এবং মধ্যে মধ্যে খবর লইতে লাগিলেন। দোকান চলিল না দেখিয়া তিনি নিজের ব্যয়ে তাহাকে তাহার বাটীতে পাঠাইয়া দেন।

এইরূপে পরের জন্য ভাবিতে ভাবিতে ও খাটিতে খাটিতে প্রমদাচরণের জীবন শেষ হইয়া গেল। এইরূপে জীবন গেলেইত জীবন ধন্য হয়। ইনি বাঁচিয়া থাকিলে যে দেশের একটা বড় লোক হইতেন তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু অসময়ে আমরা ইহাঁকে হারাইলাম। যাহা হউক জগদীশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ হউক। এস পাঠক পাঠিকাগণ! আমরা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি যে, তিনি তাঁহার পরকালগত আত্মাকে সুখ শান্তিতে রক্ষা করুন।

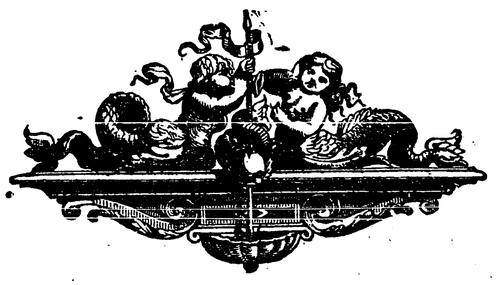

ঈশ্বরের দয়া।

জগদীশ!

১
এ ভব ভবন মাঝে
যে দিকে যখন চাই,
তোমার করুণা আহা!
কেবলি দেখিতে পাই।

২
তোমার আদেশে রবি
উজ্জ্বল কিরণ ময়,
তোমার আদেশে বায়ু
ভুবন ব্যপিয়া রয়।

৩
চাঁদের মধুর আলো
যখন জগতে ভাসে,
তোমার করুণা যেন
উছলি উছলি হাসে।

৪
আঁধার গগণে যবে
কোটী তারা দেয় দেখা;
তোমার মহিমা তাহে
জলন্ত অক্ষরে লেখা।

৫
পাখীরে ললিত গীতি
শিখায়েছ ভালবাসি;
ঢেলেছ ফুলের দলে
স্বরগের শোভারাশি।

৬
ভূধর, সাগর, মেঘ,
বিজলী, বরিষা-ধারা,
বিচিত্র কৌশল তব
মরমে জাগায় তারা!

৭
নগরের কোলাহল
বিজনের নীরবতা,
না সুধিতে বলে মরি!
তোমার স্নেহের কথা।

৮
যখন যা প্রয়োজন
তখনি দিতেছ তাই,
কত যে বাসিছ ভাল
কিছু না জানিতে পাই।

৯
ভাঙিলে ভবের খেলা
কোলেতে দিতেছ স্থান,
ভাবি নে ডাকি নে তবু
নাহি ভাব "কুসন্তান"!

১০
নাহি চাও প্রতি দান
নাহি রাখ কোন আশা,
নীরবে বাসিছ ভাল
ধন্য বটে ভাল বাসা!

১১
কিছুই চাহিনে আর
তোমার চরণ তলে,—
তুমি যার, সে আবার
কি চাহিবে ভূমণ্ডলে?

১২
এই মাত্র মাগি ভিক্ষা
যে ভাবে যখন থাকি,
তুমি যে আমার, ইহা
সদা যেন মনে রাখি।

১৩
যে জ্ঞানেতে তুমি নাই,
নাহি চাই সেই জ্ঞান।
সাধিতে তোমার কাজ
যায় যেন মম প্রাণ।

১৪
অন্তিমে তোমার পায়
ঠাঁই যেন পাই হরি!
ধর ধর প্রাণ ভ'রে
ও পদে প্রণাম করি।

মাছের কথা।

মাছ অনেক রকমের আছে, আমরা সচরাচর যে কয়েক রকমের মাছ খাই তাহা হইতে অনেক বিভিন্ন এবং অনেক আশ্চর্য্য রকমের মাছ কোন কোন স্থানে দেখা যায়।

বালক বালিকাগণ! নিম্নে এক আশ্চর্য্য মাছের

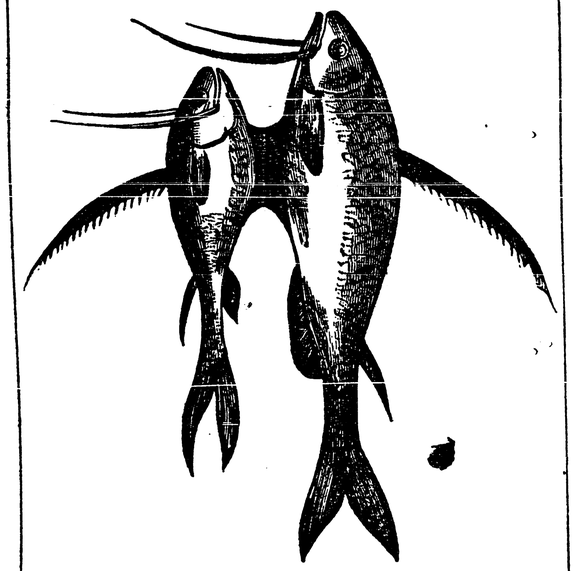

ছবি দেখ। দুইটী মাছ এক সঙ্গে যোড়া রহিয়াছে! একটী মাছ যেখানে যাইবে আর একটীকেও তথায় যাইতে হইবে। আজ ৩৮ বৎসর হইল সিলমান নামক একজন বিলাতের পণ্ডিত আমেরিকায় উত্তর কারোলিনা নদীর মোহানার নিকট এই যোড়া মাছটী পাইয়াছিলেন; তিনি তথা হইতে তাহাদিগকে আপনার দেশে লইয়া আইসেন।

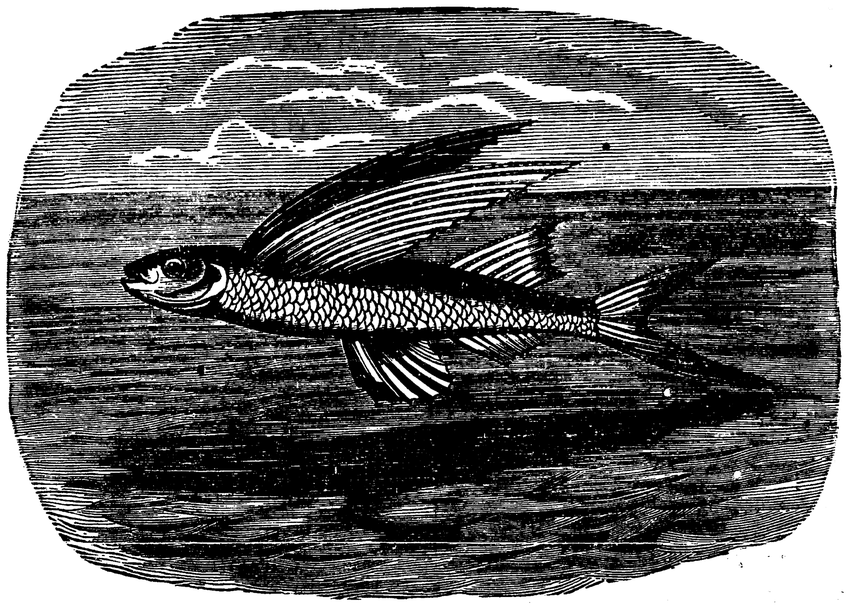

সমুদ্রে এক প্রকার মাছ আছে, তাহারা উড়িতে পারে। আমাদের নদীর কি পুকুরের মাছ কেবল-মাত্র সাঁতার কাটিতে পারে; কিন্তু যে মাছের কথা (ছবি দেখ) বলিতেছি, তাহারা সাঁতার কাটে আবার জলের উপরে বাতাসেও উড়িয়া বেড়ায়। কতবার তাহারা ঝাঁকে ঝাঁকে জাহাজের উপর আসিয়া পড়ে; প[illegible]। ক্লান্ত হইয়া যায়, আর উড়িতে পারে না এবং নাবিকগণ ধরিয়া ফেলে। এই মাছগুলি যখন রৌদ্রের সময় দল বাঁধিয়া জলের উপর দিয়া পাখা নাড়িতে নাড়িতে যাইতে থাকে, তখন তাহাদিগকে দেখিতে বেশ দেখায়। ইহাদের পিঠের উপরের রং ধূসর বর্ণ; পেটটা সাদা; ডানাগুলি গাঢ় নীল কেবল অগ্র-ভাগে পাকা কমলা লেবুর রঙ্গের মত একটা একটা ফোঁটা আছে। এইরকম নানা বর্ণের মাছ সূর্য্যের কিরণে উড়িতে দেখিলে কাহার না আনন্দ হয়?

এই মাছকে আমাদের দেশে "উড়ক্কু মাছ" বলে। ইহাদের কাহারও কাহারও চারিটী এবং কাহারও কাহারও দুইটী ডানা আছে। এই মাছ তিন চারি রকমের হয়; তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা যে গুলি দেখিতে সুন্দর তাহাদিগকে ভূমধ্য সাগরে এবং লোহিত সাগরেই দেখা যায়। ইহারা অনেকক্ষণ শূন্যে থাকিতে পারে না। অধিকদূর উড়িতে হইলে এক একবার ইহা-দিগকে জল ছুঁইতে হয়। জল না ছুঁইয়া প্রায় ১২০ হাত যাইতে পারে; তার পর একবার জলে একটু সময়ের জন্য আসিয়া ডানা ভিজাইয়া আরও ৪০ হাত পর্য্যন্ত উড়িতে পারে। উড়িবার সময়ে ইহারা জলের চারি হাতের অধিক উপরে উঠে না। তোমাদের মধ্যে কেহ যদি জাহাজে চড়িয়া মান্দ্রাজে যাও তবে এ রকম মাছ কত দেখিতে পাইবে। জাহাজের বাহিরে একটা আলো লইয়া বসিয়া থাকিও, দেখিবে তোমার কাছে কত উড়ুক্কু মাছ উড়িয়া আসিবে। আমেরিকার জেলেরা এই রকম করিয়া কত মাছ ধরে।

উপরে যে মাছের কথা বলা হইল উহা প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। রুই, বোয়াল যেমন এক এক রকম মাছের নাম, "উড়ক্কু"ও সেইরূপ।

ঠাকুরদাদার গল্প।

আগ্নেয় গিরি।

(অবশিষ্টাংশ।)

বীন বাবু বলিতে লাগিলেন—"এ সকল যে বর্ণনা করিলাম,—ভূমিকম্প, ধূম, অগ্নি-শিখা, ধূলি ও প্রস্তর নিক্ষেপ প্রভৃতি যাহার কথা পূর্ব্বে বলিলাম, সে সকল উৎপাত আগে দেখা যায়। কিন্তু এ সব অপেক্ষাও ভয়ানক একটা আছে। যেন আগে জন কতক ফৌজ পাঠাইয়া কিছু গোল-যোগ করিয়া তার পর সেনাপতি নিজে এসে হাজির হইলেন। এতক্ষণ ধরিয়া চারিদিকের গ্রাম সহর সমস্ত বিনষ্ট করিয়া, ঘর দ্বার সব ভাঙ্গিয়া দিয়া, জীবজন্তু ধ্বংশ করিয়া এবার যেন নূতন সৃষ্টি আরম্ভ হইবে। সব লণ্ডভণ্ড করিয়া এবার আবার নূতন মাটি দিয়া গড়িতে হইবে।

তুবড়ী ছোড়া শেষ হইয়া গেলে যখন সেটা আনিতে যাও, তখন তার গায়ে কি লাগিয়া থাকে?"

চন্দ্র—"হাঁ, আমি দেখেছি তার মুখের ছিঁদ থেকে কি যেন গলা গলা সব বাহির হ'য়ে তুবড়ী-টার গায়ে লাগে আর গড়িয়ে মাটিতেও গিয়া পড়ে, সে গুলা কি গা?"

দেবেন্দ্র—"হাঁ, আমিও দেখিতে পাই বটে।"

নবীন বাবু—"সত্য কথা, সকলেই প্রায় দেখে যে ছোড়া হয়ে গেলে তুবড়ীর গায় তার ভিতরের গন্ধক ও অন্য অন্য নানা জিনিষ গলিয়া লাগিয়া যায়। প্রকৃতির তুবড়ীর বিষ-য়েও ঠিক সেইরূপ। আগ্নেয় পর্ব্বতের যখন অগ্ন্যুৎপাত হয় তখনও ঐরূপ কাণ্ড সকল প্রথমে হইয়া থাকে,—এদিকে তাহার ভিতরে পৃথিবীর গর্ত্তে যে সব ধাতু, মাটি, পাথর, গন্ধক প্রভৃতি সামগ্রী আছে, সে সমস্ত গলিয়া এক রকম আগুণের সমুদ্রের মত হইয়া তেজে উপর দিকে ঠেলিয়া উঠিতে থাকে। তেজ অল্প [illegible]লে শুধু ভূমিকম্প হইয়াই থামিয়া যায়, আর একটু বেশী হইলে ধোঁয়া বাহির হয়, আর ঐ দ্রব (গলা) পদার্থ রাশির কিছু কিছু তেজে ঐ ধূমের সহিত পর্ব্বতের চূড়া দিয়া আকাশে বাহির হইয়া পড়ে। অনেক উপরে উঠে বলিয়া ঐ দ্রব পদার্থ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া ধূলি বা বালির মত চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। আসিবার সময়ে পথে যে সকল পাথরের চাঁই দেখিতে পায়, তাহারা উহার ভয়ানক তেজ থামান দূরে থাকুক, সেই তেজে উহারই সঙ্গে পর্ব্বত হইতে

আকাশে উঠিয়া কত দূরে গিয়া পড়িতে থাকে, তাহার কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কিন্তু তখনও সেই ভিতরকার সমুদ্রের দুই একটা ঢেউ দেখিতে পাওয়া যায় মাত্র। সমুদ্রকে তখনও দেখা যায় নাই। অবশেষে ওসকল উৎপাত কম হইয়া আইসে, আর পর্ব্বতের উপরিস্থ সেই কড়ার মত গহ্বরটী ভিতরের গলা পাথরাদিতে পরিপূর্ণ হয়। দ্রব পদার্থের সাগরে আর ঢেউ নাই, সাগর এখন স্বয়ং উথলিয়া উঠিয়াছে! পর্ব্বতের শিখর দেশের গহ্বর হইতে পৃথিবীর ভিতর পর্য্যন্ত যে নল আছে বলিয়াছি, ঐ নল দিয়া ক্রমে ক্রমে চূড়া পর্য্যন্ত দ্রব ধাতু, প্রস্তর প্রভৃতির সেই সমুদ্র উথলিয়া উঠে ও ঐ গহ্বরটী পরিপূর্ণ করে। সেটী কিন্তু বেশী বড় নয়, কাজেই তার মধ্যে কতক্ষণ সেই সাগরে গলা সামগ্রীর স্থান হ'বে বল? কাজেই উহার যে দিক নীচু, সেই দিক দিয়া গড়াইয়া অগ্নি-সমুদ্রের তরল পাথর পর্ব্বতের গা বহিয়া পড়িতে আরম্ভ হয়। ইহারই নাম (Lava) "লাভা"। প্রায়ই আগ্নেয়-গিরির গায়ে অনেকগুলি ছোট ছোট গহ্বর থাকে, সেই ছোট ছোট গহ্বরগুলি দিয়াও দ্রব পদার্থের স্রোত বহিতে দেখা যায়। কখন কখন পর্ব্বতের গা ফুঁড়িয়া বাহির হইয়া থাকে। কখন বা নূতন স্থান দিয়া প্রবাহিত হইয়া সেখানে নূতন আগ্নেয় পর্ব্বত উৎপন্ন করিতেও দেখা যায়। এই দ্রব-প্রবাহ বড় ভয়ানক। ইহাই ভূমিকম্প ও অগ্ন্যুৎপাতের মূল কারণ, এবং ইহাদ্বারাই আগ্নেয় পর্ব্বত সকল প্রস্তুত হইয়াছে, ইহাদ্বারা সমুদ্রের কত শত দ্বীপও নির্ম্মিত হইয়াছে। সার উইলিয়ম হ্যামিল্টন নামক একজন বিখ্যাত সাহেব আগ্নেয়গিরি ও অগ্ন্যুৎপাত সম্বন্ধে নিজে জ্ঞানলাভ করিয়া সাধারণ লোকদিগকে জানাইবার জন্য ভীষণ অগ্নিকুণ্ড সম ভিসুভিয়স্ পর্ব্বতের নিকট নেপলস্ দেশে ৩০ ত্রিশ বৎসর কাল বাস করেন। তিনি ঐ দীর্ঘকালের মধ্যে অনেকবার উহার ভয়ানক উৎপাত স্বচক্ষে দেখিয়া যেরূপ সুন্দর বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে আগ্নেয়-গিরির বিষয়ে বেশ্ জ্ঞান লাভ করা যায়। কিন্তু এ যে ভয়ানক ব্যাপার, তা না দেখিলে কিছুই অনুভব করা অসম্ভব। তথাপি তোমাদের জন্য আমার না-দেখা কথা অপেক্ষা তাঁহার এক বারের বর্ণনা হইতে কতকটা বলি শুন।

"১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দে উক্ত পর্ব্বতে যে ভয়ানক অগ্নিকাণ্ড হইয়াছিল, তাহার বর্ণনায় ইনি এইরূপ লিখিয়াছেন, সংক্ষেপে তোমাদিগকে বলিঃ-

'১৫ই জুন রবিবার রাত্রি দশটার সময়ে হঠাৎ একটা ভূমিকম্প হইল, বাহিরে গিয়া দেখি পর্ব্বতের চূড়ার উপর ও চারিদিকের ছোট চূড়ার (গতবারের ভিসুভিয়সের চূড়ার ছবি দেখ) উপর দিয়া ভয়ানক অগ্নিশিখা ও কাল ধোঁয়া বাহির হইতেছে। এইরূপ ভলকে ভলকে এমন কি ১৫টা স্থান দিয়া অগ্নি ও ধূম বাহির হইতে দেখিলাম। বজ্রের মত ভীষণ গর্জ্জনে কাণ ফাটিয়া যাইতে লাগিল! তার পর বোধ হইল যে দ্রব পদার্থের প্রবাহ সকল পর্ব্বতের চূড়া ও গায়ের নানা স্থান দিয়া বাহির হইয়া গা বহিয়া নীচে আসিতে আরম্ভ হইয়াছে।

'এদিকে ক্রমাগত যেন ঝড়ের সময় সমুদ্রের ডাকের মত হুঁ হুঁ শব্দ অনবরত হইতেছে, ওদিকে যেন শত সহস্র হাউই এক সঙ্গে ছুড়িলে যেমন ভয়ানক শব্দ হয়, তেমনি ভয়ানক শব্দে হাজার হাজার পাথরের চাঁই, আকাশে মহাতেজে শাঁশাঁ

করিয়া ছুটিতেছে ও কতদূরে গিয়া পড়িয়া গৃহদ্বার জানালা চুরমার করিয়া দিতেছে; আবার তার মধ্যে ঘনঘন লক্ষ লক্ষ কামান একত্রে আওয়াজ করিলে যেমন শব্দ হয় বা শত শত বজ্রাঘাত উপরি উপরি হইলে যেরূপ হয়, তেমনি শব্দে কানে তালা লাগিয়া যাইতেছে; আকাশ যেন ফাটিয়া যাইবে। পৃথিবী যেন বিদীর্ণ হইবে! পর্ব্বত যেন চূর্ণ হইবে!! সে দৃশ্য না দেখিলে বর্ণনার দ্বারা অনুভব করা অসম্ভব।

'পরদিন প্রাতে দেখা গেল যে পর্ব্বতের গা বহিয়া দ্রব পদার্থের স্রোত নীচে আসিয়াছে এবং পর্ব্বতের নিম্নের "টরিডেল্ গ্রেকো" (Torredel Greco) নামক নগরের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া তাহার অধিকাংশ স্থল দগ্ধ ও উচ্ছন্ন করিয়া শেষে সাগরে গিয়া পড়িয়াছে। যেখানে গিয়া সাগরে মিশিয়াছে তথায় ৮০০ হস্ত চওড়া, ৮ আট হাত জলের ভিতর ও ৮ আট হাত উচ্চ সর্ব্বশুদ্ধ ১৬ ষোল হস্ত পুরু একটী নূতন অন্তরীপ প্রস্তুত হইয়া গেল। জলের মধ্যেও প্রায় ৪২০ চারি শত কুড়ি হস্ত লম্বা হইয়া প্রবেশ করিয়াছিল। ঐ দ্রব-স্রোত যে কি ভয়ানক গরম তাহার কল্পনাই হয় না। এত পথ চলিয়াও যখন জলে পড়িয়াছে, দেখিলাম যে সে স্থলের জলরাশি টগ্ বগ্ করিয়া ফুটিতেছিল। এমন কি আমি প্রায় ২০০ দুই শত হস্ত দূরে ছিলাম আমার নিকটের জলেও প্রচুর ধূম উঠিতেছিল, ও উহাতে হাত দিবা মাত্র আমার হাত বাস্তবিকই পুড়িয়া গেল। আমাদের নৌকার তলায় যে পীচ দেওয়া ছিল মাঝি দেখিল তাহা ঐ উত্তাপে গলিয়া যাইতেছে ও নৌকায় জল উঠিতে আরম্ভ হইয়াছে। কাজেই আমরা তাড়াতাড়ী সেস্থান পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলাম।' এইরূপ কত ভয়ানক কথা এর পর শিখিবে, এখন সে সমস্ত কথা বলা অসম্ভব।"

অমূল্য—"দাদা বাবু! দ্রব-প্রবাহ কি রকম—ভাল করিয়া বলুন না, কতকটা বুঝিয়াছি বটে কিন্তু ওবিষয়ে আরও ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিন।"

নবীন বাবু—"যথার্থ, আমি বুঝিতে পারিতেছি না যে কিরূপে এমন কঠিন বিষয় তোমরা বেশ্ মনে ধারণা করিতে পারিবে। এ নিজে না দেখিলে তেমন উত্তমরূপে বুঝা কঠিন। তবু এস দেখি যতটুকু পার শুন। যখন ঐ স্রোত বহিতে থাকে তখন তাহার চেহারা বড় ভয়ানক। তোমরা মনে কল্পনা করিলেই বুঝিতে পারিবে প্রায় এক মাইল দূর পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ, ৮।১০।১২ হাত উচ্চ একটা গলা পাথরের নদী চলিয়াছে। তাহার উত্তাপে নিকটে যায় কার সাধ্য? জ্বলন্ত রক্তবর্ণ, উপরটা ধোঁয়ায় ঢাকা, ভিতরে যেন হাপর! তোমরা কখন লৌহ গলাইবার হাপর দেখ নাই তাহা হইলে বেশ্ বুঝিতে পারিতে। যাহা হউক এই অগ্নিময় পাথরের নদী চলিয়াছে, সম্মুখে যাহা পড়িতেছে, অল্পক্ষণ মধ্যেই ইহার ভয়ানক গরমে পুড়িয়া যাইতেছে। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাড়ী, বড় বড় মন্দির, যাহা কিছু সম্মুখে পড়িবে, সকলই ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নষ্ট হইয়া যাইবে। এইরূপে ধ্বংশ করিতে করিতে কতদূরই চলে তাহার ঠিক নাই। কখন কখন পর্ব্বত হইতে অল্প দূর গিয়াই থামিয়া যায়, কখন বা সাগরে গিয়া মিশে, কখন বা অনেক ক্রোশ পথ পর্য্যন্ত চলিয়া যায়। আইস্লণ্ড দ্বীপের "স্ক্যাপ্টার যোকুল" নামক আগ্নেয় পর্ব্বতের দ্রব-প্রবাহ বড় ভয়ানক। তথাকার ১৭৮৩ সালের অগ্নিকাণ্ড ১১ই জুন আরম্ভ হইয়া ক্রমাগত দুই বৎসর কাল চলিয়াছিল। পর্ব্বতের দুই পাশ দিয়া দুটী

প্রবাহ বাহির হইয়া একটী ৫০ পঞ্চাশ মাইল, অপরটী ৪০ চল্লিশ মাইল পথ গিয়াছিল। প্রথমটীর বিস্তার ১২ হইতে ১৫ মাইল; অপরটীর প্রায় ৭ মাইল। চলিতে চলিতে ২০টী গ্রাম উচ্ছন্ন দেয় এবং ৯,০০০ নয় হাজারেরও অধিক লোকের প্রাণ বিনাশ করে। তদ্ভিন্ন পশু ও অন্যান্য দ্রব্যাদি যে কত নষ্ট হইয়াছিল তাহার সীমা নাই। এমন কি সে ক্ষতি আইসলণ্ড বাসীরা আজও পূরণ করিয়া উঠিতে পারে নাই; "স্ক্যাপটা" নামক ১৩৫ হাত চওড়া, ৪০০ হাত গভীর একটী পার্ব্বতীয় নদী ঐ দ্বীপে ছিল। দ্রব পদার্থের স্রোত চলিতে চলিতে ঐ নদীতে গিয়া পড়ে এবং বহু দূর পর্য্যন্ত ঐ নদীর গর্ত্ত পূর্ণ করিয়া চলিয়া যায়। এখন ভাবিয়া দেখ যে কত দ্রব পদার্থই বাহির হইয়াছিল!!

"ক্রমে যত পুরাতন হয় এই প্রবাহের উপরিভাগের পাথরের চাঁইগুলি তত জমাট বাঁধিয়া কঠিন হয়; এমন কি তখন দেখিলে বোধ হয় যেন রাশি রাশি পাথর এক সঙ্গে জমাট করিয়া কোন দৈত্য সেই চাঁই পিছন থেকে ঠেলিয়া দিতেছে। উপরে কঠিন পাথর, তাহার উপর দিয়া চলিয়া যাওয়া যায়। আর বাস্তবিকও [illegible] লোক [illegible] দিন পলাইতে না পারিয়া কোন উচ্চ স্থানে লুকাইয়া থাকে, পরে শুকাইয়া গেলে ঐ কঠিন পাথরের উপর দিয়া পলাইয়া প্রাণ রক্ষা করে। উপরের ঐ কঠিন আবরণের ভিতরে কি ভয়ানক অগ্নিকুণ্ড তা বুঝিতেই পারিতেছ। সে আগুণ অনেক দিন পর্য্যন্ত নিবে না। ১০।১৫ দশ পনের বৎসর পর্য্যন্তও তাহার উপরের ফাটল দিয়া ভিতরের গরম ভাব উঠিতে দেখা যায়; তাহাতে হাত নিশ্চয় পুড়িয়া যাইবে।

সাগরের গর্ত্তেও আগ্নেয়গিরি থাকে। তাহাদের যখন অগ্ন্যুদ্গম হয়, তখন প্রায় ভয়ানক কাণ্ড হইয়া থাকে; অনেক স্থলে নূতন দ্বীপ উৎপন্ন হয়, তাহার সঙ্গে সঙ্গে প্রায় নূতন গহ্বর থাকে তাহা হইতে আবার উৎপাত হয়। এইরূপেই সিসিলী দ্বীপে এট্‌না, আইস্‌লাণ্ডের হেক্লা, কেনেরী পুঞ্জের টেনেরীফ্ প্রভৃতির উৎপত্তি হইয়া থাকিবে।"

অনেক রাত্রি হওয়ায় আজ এইখানেই গল্প শেষ হইল। সকলে আশ্চর্য্য হইয়া বাড়ী গেলেন!

ছেলেবেলায় নেলসন্।

কল জাতি অপেক্ষা ইংরাজেরা জলযুদ্ধে বড়। সমুদ্রের মধ্যে জাহাজে জাহাজে লড়াই হইলে আজ কাল কোন দেশের লোকই ইংরাজকে পরাজয় করিতে পারে না। এই জন্য তাহাদিগকে জলের রাজা বলে। কাহার জন্য তাঁহারা এত বড় হইলেন জান? তিনি হোরেসিও নেলসন্। ফরাসীদের সহিত ইংরাজদের মহা যুদ্ধ হয়। তাহাতে তিনি আপনার বিদ্যা বুদ্ধি ও সাহসের গুণে জয় লাভ করেন। নেলসনের সমস্ত জীবন চরিত

আজ তোমাদিগকে বলিব না। তিনি যখন তোমাদের মত ছেলেমানুষ ছিলেন সেই সময়ের দুই একটী কথা শোন। দেখিতে পাইবে যাঁহারা বড় লোক হন ছেলেবেলা হইতেই তাঁহাদের বড় লোক হইবার চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়।

নেলসন্ যাহা করিব বলিতেন তাহা না করিয়া ছাড়িতেন না। তাঁর সাহসের কথা শুনিলে গল্প বলিয়া বোধ হয়। ১২ বৎসর বয়সের সময় তিনি একদিন একটা খবরের কাগজ পড়িতে পড়িতে জানিতে পারিলেন যে তাঁহার কাকা কোন জাহাজের কর্ত্তা হইয়া এক যুদ্ধে যাইতেছেন। তাঁহার দেড় বৎসরের বড় এক দাদা তখন তাঁহার নিকটে ছিলেন। তিনি তাড়াতাড়ি তাঁহাকে বলিলেন "দাদা, শীঘ্র বাবাকে পত্র লেখ; আমি কাকার সঙ্গে লড়ায়ে যাব।" কত লোক তাঁকে কত বুঝাইল; কত লোক কত ভয় দেখাইল; কেহ বলিল এক গোলার চোটে তোমার মাথা চূর্ণ হইয়া যাইবে; কেহ বলিল সেখান হইতে আর ফিরিয়া আসিতে হইবে না; কিন্তু তিনি শুনিলেন না। একবার যাহা বলিয়াছেন তাহা ফিরাইলেন না। তাঁহার পিতা তাঁহার স্বভাব জানিতেন; তিনি বড় অধিক আপত্তি করিলেন না; হোরেসিও হাসিতে হাসিতে কাকার সঙ্গে যুদ্ধে চলিয়া গেলেন। সে যুদ্ধে তাঁহার নাম বাহির হয়।

ইউরোপের উত্তরে কোথায় কি দেশ আছে তাহা তখনো সকল আবিষ্কার করা হয় নাই। কতবার কত লোক জাহাজে চড়িয়া দেশ আবিষ্কার করিতে গিয়াছিলেন; কেহই বড় একটা কিছুই করিতে পারেন নাই। সে দেশে বড় শীত। জল পর্য্যন্ত জমিয়া যায়। কত লোক তথায় যায়, আর ফিরিয়া আসিতে পারে না। যাহা হউক এই সময়ে আর একজন কাপ্তেন এক জাহাজ লইয়া এ অঞ্চলের দেশ আবিষ্কার করিতে যাত্রা করেন। নেলসন্ তাঁহাদের সঙ্গে যান। এখন তিনি ছেলেমানুষ হইলেও অনেকের জানিত লোক। তিনি কয়েক জন গোরার কর্ত্তা হইলেন।

তাহার পর কি হইল শোন। এক জায়গায় জাহাজ বাধিয়াছে; চারিদিকে বরফ, রাত্রি দুই প্রহর, অত্যন্ত কুয়াসা দিয়াছে। কাজে কাজেই বড় নজর চলে না। এমন সময় নেলসন্ এক জন বন্ধুর সহিত জাহাজ হইতে কাপ্তেনের অনুমতি না লইয়া নামিলেন; তাঁহারা ভল্লুক শিকার করিবেন। কিছুদূর যাইতে না যাইতেই এক প্রকাণ্ড ভল্লুক দেখিতে পাইলেন। উহা সর্ব্বদা বরফের মধ্যে থাকে বলিয়া ঠিক আমাদের দেশের ভালুকের মত নয়; কিন্তু খুব ভয়ানক। উভয়ে গুলি চালাইলেন, কিছুই হইল না। একটা দুটা করিয়া চারিবার বন্দুকে আওয়াজ করা হইল, ভালুকের কিছুই হইল না। এদিকে বারুদ ক্যাপ ফুরাইয়া গিয়াছে; তখন সঙ্গী বলিলেন "হোরেসিও, চল জাহাজে পলাইয়া যাই"। কিন্তু তিনি তাহা শুনিলেন না, বলিলেন "পালাব না, বন্দুকের ঘা মারিয়া ভালুকের মাথা ভাঙ্গিব।"

এমন সময় কুয়াসা ফুরাইয়া গিয়াছে। জাহাজের লোকে সকলে উঠিয়াছেন। নেলসনের বন্ধুগণ তাঁহাকে খুঁজিতেছেন। সকলে দেখিলেন যে তিনি বন্দুকের বাঁটের আঘাতে এক ভয়ানক ভালুক মারিতেছেন। জানোয়ারটা তাঁহাকে খাইতে আসিতেছে। জাহাজ হইতে কত লোক তাঁহাকে ফিরিয়া আসিতে বলিলেন। জাহাজের অধ্যক্ষ বিউগিল বাজাইয়া আসিতে বলিলেন। তিনি

নিলেন না। ভালুক মারিয়া তবে ফিরিলেন। অধ্যক্ষ জিজ্ঞাসা করিলেন "ভালুক মারিয়া কি আনিবে?" নেলসন্ উত্তর করিলেন "উহার চামড়া লইয়া যাইয়া বাবাকে দিব।"

বাস্তবিক, ভয় কাহাকে বলে নেলসন্ তাহা জানিতেন না। যখন তিনি খুব ছেলে মানুষ তখন এক রাখালের সহিত একদিন পাখী ধরিতে যান। খাবার সময় চলিয়া গেল। তবু তিনি ফিরিলেন না। সকলে খুঁজিতে লাগিলেন; অবশেষে দেখেন যে বালক এক নদীর তীরে একেলা বসিয়া আছে। তাঁহার ঠাকুরমা জিজ্ঞাসা করিলেন "একেলা বসিয়াছিলে, ভয় পাও নাই?" বালক সরলভাবে উত্তর করিল "ভয় কাকে বলে ঠাকুরমা; ভয় কেমন জিনিস?"

আর একটী তাঁহার বিশেষ গুণ ছিল। তাহা এখনো তোমাদিগকে বলা হয় নাই। তিনি

মিথ্যার দিক্ দিয়ে যাইতেন না। একদিন খুব বরফ পড়ে। আমাদের দেশে যেমন জল হয় শীতপ্রধান দেশে সেইরূপ বরফও পড়িয়া থাকে। হোরেসিও ও তাঁহার ভ্রাতাদের স্কুলে যাইবার সময় হইয়াছে। কেহ কেহ বলিলেন আজ আর স্কুলে যাওয়া যাবে না। বরফে পথ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। পিতা উত্তর করিলেন, আচ্ছা বই লইয়া রাস্তায় বাহির হও, যদি না পার ফিরিয়া আসিবে। কয়েক ভাই পড়িতে যাইতে বাহির হইলেন, বড় ভাই বলিলেন "এত বরফে যাওয়া যাবে না।" কিন্তু হোরেসিও বলিলেন "তাহা হ'বে না; বাবা আমাদিগকে বিশ্বাস করিয়া পাঠাইয়া দিয়াছেন, যেমন ক'রে পারি স্কুলে যা'ব" এই বলিয়া তিনি স্কুলে চলিয়া গেলেন।

বালক বালিকাগণ! তোমাদিগকে অধিক কিছু বলিব না। তোমরা বোধ হয় নিজেই বুঝিতে পারিতেছ যে, বড় লোক হইতে হইলে ছেলেবেলা হইতেই তাহার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। "ছেলে মানুষ বই ত নই; এখন শুধু খেলে দেলে বেড়াই, পরে ভাল ভাল কাজ করিব," এমন ভাবিলে কিছুই হইবে না। যে যে বিষয়ে বড় হইতে ইচ্ছা কর এই ছেলেবেলা হইতেই চেষ্টা কর। নহিলে আর হইবে না।

নূতন গল্প।

এক রাজা, তার তিন ছেলে। বড় ছেলে গাঁজা খায়, মেজ ছেলে লাঠি হাতে ঘুরিয়া বেড়ায়, ছোট ছেলে বাপের কাছে বসিয়া রাজ্যের কাজ-কর্ম্ম দেখে। বড় দুটো ছোটটীকে দেখিতে পারে না।

"সোণার গাছ, রূপোর পাতা; শ্বেত কাকের বাসা তাতে!" রাজার বড় ইচ্ছা এই গাছ ছেলেরা আনিয়া দেয়। তিন ছেলে কত জায়গায় ঘুরিল। বড় দুটীর কি হইল জানা গেল না; ছোটটী ঘুরিয়া ঘুরিয়া এক রাজার বাড়ীতে যাইয়া উপস্থিত। সেখানে জন প্রাণী কিছুই নাই; সব খালি। এক ঘরে একটী মেয়ে ঘুমাইয়া আছে; তার মাথার কাছে রূপোর কাঠি, পায়ের কাছে সোণার কাঠি। সে পায়ের কাঠিটী মাথায় আনিল আর মাথার কাঠিটী পায়ের দিকে লইল; অমনি মেয়েটী জাগিয়া উঠিয়া তাহাকে বলিতে লাগিল, "হায়! মানুষের ছেলে তুই এখানে কেন এলি? তোকে এখনি খেয়ে ফেল্‌বে। এ বাড়ীতে রাক্ষস থাকে। আমার বাবাকে খাইয়াছে, মাকে খাইয়াছে, বাড়ীর সকলকে খাইয়াছে, সে দিন দুটী রাজার ছেলে 'সোণার গাছ রূপোর পাতা, শ্বেত কাকের বাসা তাতে' এই গাছ নিতে এসেছিল, তাদেরও খেয়েছে। আমাকে যে কেন খায় নি জানিনে।" সে বুঝিতে পারিল যে মেয়ে তাহার দুই দাদার কথাই কহিতেছে। তাহার সঙ্গে আলাপ করিয়া কত কথাই জানিয়া লইল;—রাক্ষস সহজে মরিবে না, তবে যদি কেহ ঐ পুকুরের তলায় যে স্ফটিকের স্তম্ভ আছে, সেটাকে এক নিঃশ্বাসে ডুব দিয়া তুলিতে পারে; তার পর তাহাকে ভাঙ্গিয়া তাহার ভিতরে যে ভ্রমরটী আছে, তাহাকে মারিয়া ফেলিতে পারে তবে ঐগুলি মরিবে। রাক্ষসেরা যত লোককে খাইয়াছে, তাহাদের হাড়গুলি সবই রাখিয়া দিয়াছে। যদি কেহ রাক্ষসগুলিকে মারিয়া তারপর ঐ হাড়-গুলিতে এই সোণার কাঠি এবং রূপার কাঠি ধোওয়া জল ছড়াইয়া দিতে পারে, তবে ঐ সকল

লোক বাঁচিয়া উঠিবে। রাজার ছেলে এই কথা শুনিয়া একদিন রাক্ষসদের অনুপস্থিতিতে এই সকল কার্য্য সাধন করিল। রাক্ষসও মারিল, ভাইদেরও বাঁচাইল।

আরও এক গল্প শুনিয়াছি। রাজার মেয়ে মরিয়া গেল, মুনি ঠাকুর আসিয়া রাজার নিকট বলিলেন, "রাজা, তোমার মেয়েকে আমি বাঁচা-ইয়া দিতেছি। আমাকে একটা বড় কড়া দাও, একটা টেবিল দাও, একটা ছুরি দাও, আর জল ও আগুন দাও। রাজা সকলই দিলেন। মুনি ঠাকুর সেই মড়াটাকে কড়াতে সিদ্ধ করিয়া তার মাংসগুলি ফেলিয়া দিলেন। পরে হাড়-গুলি পরিস্কার করিয়া টেবিলে রাখিয়া তাহাতে মন্ত্রপূর্ব্বক জল ছড়াইয়া দিলেন. আর অমনি যে মেয়ে ছিল সেই মেয়ে হইয়া উঠিল।

এ সব তো গেল গল্প। সত্যি সত্যি মড়া বাঁচাইতে দেখিয়াছ? আমি দেখি নাই, কিন্তু শুনিয়াছি। চোরা-সান্নিপাত রোগে যাহারা মরে, তাহাদের অনেককে দেশীয় শাস্ত্রীয় কবিরাজেরা বাঁচাইয়াছেন; এরূপ গল্প অনেকের মুখে আমি শুনিয়াছি।

একখানি ইংরাজি কাগজে নিম্ন লিখিত গল্পটী পড়িয়াছি।—

"বিলাতের একজন ডাক্তার একটী ছোট কুকুরের গলার শিরা কাটিয়া দিলেন; কুকুরটী [illegible] রক্ত পড়িয়া মরিয়া গেল। [illegible] পর তিন ঘণ্টা কাল একটী ঘরে কুকুরটীকে [illegible] রাখিয়া দেওয়া হইল। কুকুরটী [illegible] হইয়া গেল। তার পর তাহাকে গরম জলে ফেলিয়া ক্রমাগত মাজিয়া দেওয়া হইল। [illegible] অনেকক্ষণ নাড়িয়া চাড়িয়া দিলে [illegible] বেশ নরম হইল। তার পর [illegible] রবারের নল দিয়া তাহার পেটে [illegible] রক্ত পূরিয়া দিলেন। একটা কল দিয়া কৃত্রিম নিঃশ্বাস প্রশ্বাস করান হইতে লাগিল; এবং একটা বড় কুকুরের রক্ত ঐ ছোট কুকুরটীর গায়ে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হইল। এই সকল কার্য্য একবারে হইতে লাগিল। অর্থাৎ একজন সাহেব নিঃশ্বাস প্রশ্বাস করাইতে লাগি-লেন, একজন রক্ত দিতে লাগিলেন আর এক জন ক্রমাগত তাহার শরীরটা মাজিতে লাগি-লেন। ক্রমে কুকুরটীর চক্ষু সতেজ হইল, আর কয়েক মুহূর্ত্ত পরে শরীরটী একটু একটু কাঁপিতে লাগিল। তার পর কুকুরটী হাঁপাইতে লাগিল, চক্ষু উজ্জ্বল হইল; শেষে ফিট হইলে যেমন হয়, সেইরূপ করিতে লাগিল। তার পর ক্রমেই শান্ত হইয়া আসিতে লাগিল, একটু একটু কোঁকাইতেও লাগিল। প্রথম রক্ত দেওয়ার কুড়ি মিনিটের মধ্যে কুকুরটী উঠিয়া বসিল। শীঘ্রই দাঁড়াইয়া তার পর হাঁটিতে লাগিল। দুই দিনের মধ্যে সে রাস্তায় দৌড়িয়া বেড়াইতে লাগিল।

"সাহেবদের গরু বাছুর মারিতে আপত্তি নাই, সুতরাং ডাক্তার মহাশয় একটী বাছুরকেও ঐরূপ করিয়া দেখিলেন। সেও বাঁচিল। আর একটী ছোট কুকুরকে জলে ডুবাইয়া মারিয়া আবার ঐ প্রণালীতে বাঁচাইয়া দিলেন।"

আমরা ছোট খাট রকমে এক প্রকার মরা জানোয়ার বাঁচাইয়াছি। সে হয়ত পাঠকগণের মধ্যে সকলেই এক এক বার করিয়া থাকিবেন। মাছি গুলিকে দু একটা চড় চাপড় মারিলেই তাহারা মরিয়া যাইতে রাজি হয়। একটা মাছিকে ঐরূপ করিয়া তাহাকে সহজেই পুন-রায় বাঁচান যাইতে পারে। মাছিটীকে এক হাতে রাখিয়া আর এক হাত দিয়া তাহার উপর একটী ঘর নির্ম্মাণ করিয়া দেও। ঘরের একটী ছোট দরজা রাখিয়া তাহার মধ্য দিয়া খুব ফুঁ দিতে থাক। দেখিবে, শীঘ্রই মাছিটী বাঁচিয়া উঠিবে।

আমাদের দেশের কথা শুনিয়াছি, সর্পাঘাতে মরা লোকগুলিকে তিন দিন চারি দিন পরে ওঝা আসিয়া মন্ত্র পড়িয়া বাঁচাইয়া দিতে পারে। সত্য মিথ্যা শপথ করিতে পারি না।

সখা।
তৃতীয় ভাগ। অষ্টম সংখ্যা।
আগষ্ট, ১৮৮৫।

(প্রাপ্ত।)

শোক-সঙ্গীত।

১

কেমনে কহিব 'সখা'!—শুনে যে ঝরিছে আঁখি
"গিয়াছেন সম্পাদক আমাদের দিয়ে ফাঁকি"!
শত বজ্রাঘাত হেন, মরমে বাজিল যেন,
নাই সে "প্রমদা বাবু" এ জগতে নাই?
কেরে আজ কেড়ে নিলি আমাদের ভাই!

২

সন্ধ্যায় যে শশী ছিল তায় রাহু গরাসিল,
উজ্জ্বল জ্যোছনা, আহা না হ'তে প্রকাশ
পূর্ণিমায় অমাবস্যা একি সর্ব্বনাশ!

৩

এত যে উন্নতি আশা, স্বদেশের ভালবাসা
মঙ্গল কামনা এত, কিছুই হল না?
পাষাণ শমন তাঁরে সময় দিল না!

৪

অবোধ বালকগণে প্রাণপণে সযতনে
কে শিখাবে নবনীতি? প্রতিমাস এলে,
কে দিবে তোমাতে 'সখা'! এত মধু ঢেলে?

৫

'সখা'র উন্নতি তরে কে আজি যতন করে?
ভীষণ আষাঢ় মাস! কেন তুই এলি,
ভাঙিলি নবীন তরু না উঠিতে কলি!

৬

হায়রে দারুণ কাল, নাহি মানে কালাকাল,
অকালে এহেন জনে করিল হরণ,
এমন কঠিন মন তোরই শমন!

৭

প্রিয় শিশু ভাই বোন! তোদের কোমল মন
কতই ব্যথিত আজ! বলিতে না পারি,
(আমাদের বুক ফাটে, বলিব কি করি।)

৮

যে তোদের অবিরত, দিতে ছিল শিক্ষা কত
সে শিক্ষক সে বান্ধব আজ আর নাই।—
কাঁদে না পাষাণ কেবা মনে করি তাই?

৯

তিনটী বছর ধরে, তোদের কল্যাণ তরে
খেটেছেন, খাটিতেন আর (ও) [illegible] হায়
আজি তা ভাবিতে শুধু বুক ফে[illegible]য়!

১০

উৎসাহেতে পূর্ণ মন, ছিল আশা অগণন,
ধরিল নিদয় রোগ এমন সময়,
স্বদেশ বৎসল যুবা মাগিল বিদায়!

১১

কোথা সে উন্নতি তাঁ'র, মানবের উপকার,
কোথা র'ল চির সাধ ইংলণ্ড ভ্রমণ
কিছুই না হ'তে হল অকাল মরণ!!

১২

চলি গেছে মহামতি যথা সে অমরাবতী
অনন্ত শান্তির রসে হয়েছে মগন।
আঁধার এ বঙ্গভূমি বঙ্গবাসী মন।

১৩

তিন বছরের ছেলে তুমি সখা! পড়ে রলে,
এখন ভরসা যত অনাথ-পালকে
তাঁরাই নেবেন কোলে কাঙ্গাল বালকে!

১৪

দেশের রতন গুলি, কেবল পড়িছে খুলি
জ্ঞানী ধনী গুণী মানী মরিছে সবাই;
মরিলা "প্রমদা বাবু" আমাদের (ই) ভাই!

১৫

আয় আয় ভাই বোন, খুলিয়া পরাণ মন
আমরা চাহিরে ভিক্ষা বিভু পদ তলে,
রাখুন সে মহাত্মারে, স্নেহময় কোলে।

১৬

যা'ক দিন মাস বর্ষ, ভারত পাউক হর্ষ,
লভুক অভাগা 'সখা' পরম উন্নতি
ফুরাবে না আমাদের এ বিষাদ-গীতি।

অন্ধদিগকে দয়া কর।

সময় নাই, অসময় নাই, যখনই কোন সহরের বড় রাস্তায় বাহির হও তখনই দেখিতে পাও যে কত অন্ধ রাস্তার পার্শ্বে বসিয়া ধূলিতে গড়াগড়ি করিয়া ভিক্ষার জন্য কাতোরক্তি করিতেছে। সমস্ত দিন না খাইয়া সকালবেলা হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত রাস্তায় বসিয়া ভিক্ষা করে; পরে সন্ধ্যা হইলে যখন গাড়ী ঘোড়ার চলতি কমিয়া আইসে তখন যথা-সাধ্য বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া ভিক্ষা করে। এইরূপ করিয়া যৎসামান্য যাহা কিছু পায় তদ্দ্বারাই জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

গ্রীষ্মকালে যখন আমরা ছাতি লইয়াও রাস্তায় চলিতে ক্লেশ পাই, তখন বিনা ছাতিতে দুই প্রহরের সময়ে পথে বসিয়া থাকা, এবং শীতকালে রাত্রিতে যখন আমরা লেপের মধ্যে শুইয়া থাকিয়াও আরাম বোধ করি না, তখন প্রায় শুধু গায়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইয়া ভিক্ষা করা কি কষ্ট তাহা কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। কি শীত, কি গ্রীষ্ম, কোন কালেই তাহাদের কষ্টের বিরাম নাই।—নির্জ্জন রাত্রিতে যখন রাস্তায় লোকের চলাচলতি কমিয়া আসিয়াছে তখন "কানা অন্ধকে দয়া কর মা! অনাথ গরিবকে দয়া কর বাপ্!!" এই কাতোরক্তি শুনিলে কি কষ্ট হয় তাহা সহজেই বুঝিতে পার। শরীরের সুখ, অসুখ, রোগ, শোকের প্রতি দৃষ্টি নাই; সব সময়েই বৃদ্ধ যুবা, বালক বালিকা, স্ত্রী পুরুষ, সকলেই এইরূপ কষ্ট সহ্য করিয়া ভিক্ষা করিতেছে।

আবার যাহাদের ঘর দোর, আত্মীয় স্বজন নাই তাহাদের আরও কষ্ট। পরের বাড়ীতে থাকিয়া, পরের সাহায্যে পথ চলিয়া যাহা পায় তাহারও অংশ যাহারা আশ্রয় দেয় তাহাদিগকে দিতে হয়। এই কষ্টের রোজগারের যৎসামান্য অংশের জন্যও পরের মুখপানে চাহিয়া থাকিতে হয়। ইহা হইতে আর কি দুঃখ আছে? যাহাদের চক্ষু নাই, চেতন জীব হইয়াও যাহারা

ARTIST PRESS

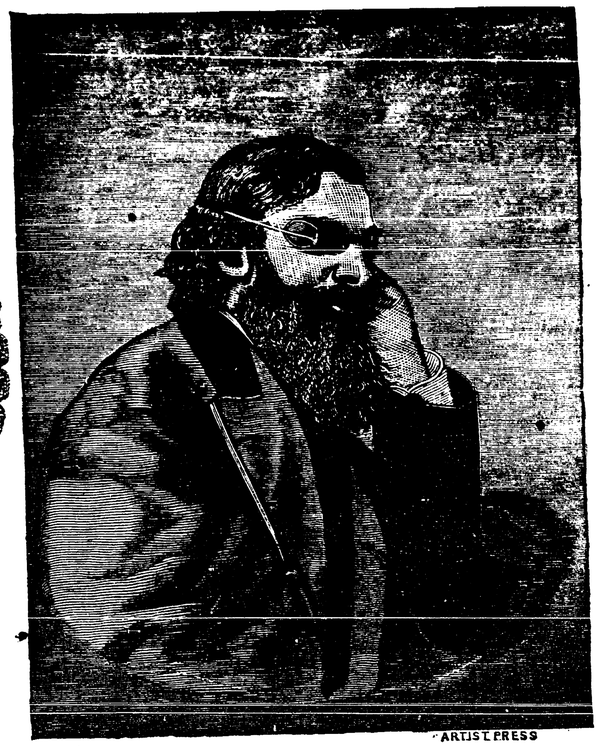

অচেতন পদার্থের ন্যায় অন্যের সাহায্য ব্যতীত এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতে পারে না, তাহাদের মত দুঃখী আর কি কেহ আছে?

আমাদের দেশের অন্ধদের এইরূপই দুরবস্থা। তাহাদের দুঃখ, কষ্ট দেখিবার লোক নাই। যদি এই দুঃখীদিগের উপযুক্ত শিক্ষা দিবার কোনরূপ উপায় থাকিত তাহা হইলে আজ তাহাদের এমন দুরবস্থা হইত না। অন্ধদিগকে শিক্ষা দিবার কথা বলিলাম বলিয়া হয়ত তোমরা কেহ কেহ বলিয়া উঠিবে যে যাহার চোক নাই সে আবার কি করিয়া লেখা পড়া শিখিবে? যাহারা অন্ধ তাহারা চিরকালই ভিক্ষা করিয়া খাইবে। আমাদের দেশে অন্ধদিগকে শিক্ষা দিবার কোন প্রকার স্কুল নাই, তাহাদিগকে সৎপথে রাখিয়া মানুষ করিবার কোন উপায় নাই কাজেই তাহাদের এত কষ্ট। মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া, রোগ শোক ভুলিয়া গিয়া, শীত গ্রীষ্ম সহ্য করিয়া কাজেই তাহারা ভিক্ষা করিতেছে। এই ভিক্ষা দ্বারাই কোনমতে কষ্টে সৃষ্টে তাহারা তাহাদের নিজের ও পরিবারের ক্ষুধা নিবৃত্তি করি[illegible]

ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি [illegible] অন্ধদিগকে উপযুক্ত শিক্ষা দিবা[illegible] কালেজ আছে, উহা শুনিলে তো[illegible] আশ্চর্য্য বোধ করিবে। বিলাতে অন্ধ[illegible] জন্য, তাহাদিগকে সৎপথে রাখিয়া [illegible] বার জন্য কিরূপ যত্ন এবং চেষ্টা করা [illegible] অন্ধেরা শিক্ষা পইয়া কি কি কাজ [illegible] শুনিলে তোমরা অবাক হইবে!—

উপরে যাঁহার ছবি দেখিতেছ উনি একজন জন্মান্ধ; উনিই বিলাতে অন্ধদের দুরবস্থা দেখিয়া

তাহাদিগকে উপযুক্ত শিক্ষা দিবার জন্য (Royal Normal College for the Blind) রয়াল নর্ম্মাল কালেজ নামে একটী কালেজ স্থাপন করেন। যে মহাপুরুষ নিজে অন্ধ হইয়া তাঁহার সমাবস্থাপন্ন দুঃখীদের দুঃখ দূর করিবার জন্য এই কালেজ স্থাপন করিয়া নিজে অধ্যক্ষ হইয়া কাজ করিতেছেন তাঁহার ইতিহাস একটু বলি শুন।

ইউনাইটেড্ ষ্টেট্‌সের (United States) অন্তঃপাতী টেনেসে নগরে প্রায় ৫০ বৎসর হইল ফ্রান্সিস জোসেফ্ ক্যাম্বেলের জন্ম হয়; তিনি জন্মাবধিই অন্ধ। যখন অতি শিশু ছিলেন তখন সকলেই তাঁহার কিছুই হইবে না বলিয়া স্থির করিলেন। কিন্তু তিনি কিছু না করিবার ছেলে ছিলেন না; ছেলেবেলা হইতেই সঙ্গীদের সহিত মিশিয়া সময় কাটাইবার অনেক নির্দ্দোষ আমোদজনক উপায় শিখিয়াছিলেন। আমাদের দেশের অন্ধেরা যেমন ছেলেবেলা হইতেই কুসঙ্গে মিশিয়া কুকাজ করিয়া সময় কাটায় এবং ভাল হইবার জন্য কখনও চেষ্টা করে [illegible] ক্রমে তাঁহার সে দশা ঘটে নাই। [illegible] ইচ্ছা মনে ক্রমশঃই প্রবল হইতে [illegible]

[illegible] বাড়ীর কিছু দূরে ন্যাস্‌ভিলি নামক [illegible] দিগকে শিক্ষা দিবার জন্য একটী [illegible] আছে, তথায় তিনি ছয় বৎসর বয়[illegible] ভর্ত্তি হন। তাঁহার এমনই প্রখর বুদ্ধি, তোমরা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইবে যে, তিনি এক ঘণ্টার মধ্যেই বর্ণমালা শিখিয়া ফেলিলেন। তোমরা ছাপান ইংরাজী অক্ষর দেখিয়া সহজেই বর্ণমালা শেখ, কিন্তু অন্ধদের শিখিবার জন্য এক প্রকার অক্ষর আছে, যাহা হাত দিয়া ছুঁইয়া ছুঁইয়া শিখিতে হয়; সুতরাং সহজেই বুঝিতে পার তাহাদের অক্ষর শেখা কত কষ্টকর।

স্কুলে ভর্ত্তি হইয়াই তাঁহার সঙ্গীত শিখিতে ইচ্ছা হইল; কিন্তু কালেজের সঙ্গীত শিক্ষক তাঁহার সঙ্গীত শিখিবার ক্ষমতা নাই বলিয়া তাঁহাকে সঙ্গীত শিখাইলেন না। তিনি হতাশ না হইয়া নিজে বাটীতে শিক্ষক রাখিয়া সঙ্গীত শিখিতে আরম্ভ করিলেন,—অল্পকাল মধ্যেই তিনি সঙ্গীত এমন ভালরূপে শিখিলেন যে তাঁহার ১৬ বৎসর বয়সের সময়ে তিনি সেই কালেজের সঙ্গীতের অধ্যাপক রূপে নিযুক্ত হইলেন।

কেবলমাত্র সঙ্গীত শিখিয়াই তিনি ক্ষান্ত হইলেন না; তাঁহার অঙ্ক শাস্ত্র, গ্রীক ও লাটিন শিখিবার ইচ্ছা হইল। দিনের বেলায় স্কুলে অধ্যাপকের কাজ করেন বলিয়া এই সমুদয় শিখিবার সময় দিনে পাইতেন না। রাত্রিতে তাঁহার নিকট এই সমুদয় পড়িবার জন্য দুইজন লোক নিযুক্ত করিলেন,—একজন প্রথম রাত্রিতে আর একজন শেষ রাত্রিতে তাঁহার নিকট পড়িতেন; তিনি শুনিয়া শুনিয়া এই সমুদয় বিষয় উত্তমরূপে শিখিলেন।

পাঠক পাঠিকাগণ! তাঁহার পড়িবার ইচ্ছা এবং যত্ন ও পরিশ্রম একবার স্মরণ কর। তিনি স্কুলে কাজ করিয়া বাড়ীতে আসিয়া প্রায় সমস্ত রাত্রি দুই জনের সাহায্যে পড়িতেন, একজন তাঁহার সহিত রাত্রি জাগিয়া উঠিতে পারিতেন না বলিয়াই দুইজন লোক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। পড়িবার জন্য যাঁহার এইরূপ যত্ন এবং পরিশ্রম তিনি যে বড় লোক হইবেন সে বিষয়ে কি আর কোন সন্দেহ আছে? তিনি কেবল মাত্র পুস্তক পড়িয়া মনের উন্নতি করিতেন না; শরীরের উন্নতির জন্যও তাঁহার বিশেষ চেষ্টা ছিল। শরীরের উন্নতির জন্য তিনি প্রত্যহই ব্যায়াম করিতেন; তিনি যে প্রকারে শরীরের অঙ্গ চালনা করিতেন তাহা শুনিলে কখনই তোমরা তাঁহাকে অন্ধ বলিয়া বিশ্বাস করিবে না। তিনি শিকার করিতেন, মৎস্য ধরিতেন, গাছে চড়িতেন, গাছ কাটিতেন, পর্ব্বত শৃঙ্গে উঠিতেন, এক কথায় বলিতে গেলে তিনি কোন কাজ করিতেই ভয় পাইতেন না। এই রূপে শরীরের ও মনের উন্নতি করিয়া তিনি ১৮৬৯ সালে স্ত্রী ও পুত্রের সহিত ইউরোপের যেখানে যেখানে অন্ধদিগের শিক্ষার জন্য কালেজ ছিল সেই সেই স্থান পরিদর্শন করিতে বাহির হইলেন। সমুদয় স্থান ভ্রমণ করিয়া অনেক নূতন নূতন বিষয়ে বিশেষ পারদর্শী হইয়া ১৮৭১ সালে লণ্ডন নগরে উপস্থিত হন। মনে করিয়াছিলেন যে তিনি এই স্থান হইতে বাড়ী ফিরিয়া যাইবেন। কিন্তু তিনি বিলাতের অন্ধদের দুরবস্থা দেখিয়া তাহাদের জন্য কিছু করিতে কৃত সংকল্প হইলেন।

১৮৭২ সালে (Crystal Palace) স্ফটিক প্রাসাদের নিকটে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তিনটী বাড়ী ভাড়া করিয়া অন্ধদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য তিনি একটী কালেজ খুলিলেন। অল্প দিনের মধ্যেই এই কালেজের উপর অনেক বড় লোকের দৃষ্টি পড়িল; এবং দুই বৎসর পরে একজন বড় লোকের নিকট হইতে ১০০০০৲ দশ হাজার টাকা দান প্রাপ্ত হইয়া কালেজের জন্য একটী বড় বাড়ী করিলেন। এই কালেজের নাম (Royal Normal College for the Blind) রয়াল নর্ম্মাল কালেজ রাখিলেন এবং নিজে অধ্যক্ষ হইলেন। এখনও তিনি অধ্যক্ষ আছেন। এই কালেজে অঙ্গ চালনার দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়; কি স্ত্রী কি পুরুষ সকলকেই ব্যায়াম করিতে হয়। ডাক্তার ক্যাম্বেল এবং তাহার পুত্রের তত্ত্বাবধানে স্কুলের ছাত্রেরা ব্যায়াম করিতে কিছু মাত্র ভয় পায় না, অনায়াসে সকল প্রকার ব্যায়াম শিখিয়া ফেলে। এখানে এমনি আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ব্যায়াম শিখান হয় যে, অন্য কোন স্থানে তাহা অপেক্ষা সুন্দর ব্যায়াম শিখান হয় কি না সন্দেহ। এই শারীরিক ব্যায়াম দ্বারা ছাত্রদের শরীর বেশ সুস্থ হয় এবং কাজেই পড়া শুনা করিবার ক্ষমতাও বাড়ে। এই বিষয়ে একটী সুন্দর গল্প আছে। একদিন ডাক্তার কাম্ব্যালের একজন বন্ধু তাঁহার স্কুল পরিদর্শন করিতে গিয়া কয়েকটী দুর্ব্বল ছাত্র দেখিয়া বলিলেন যে "ইহাদিগকে যেরূপ দুর্ব্বল দেখিতেছি, তাহাতে বোধ হয় ইহাদের কিছুই হইবে না; কেন অনর্থক ইহাদিগকে ভর্ত্তি করিয়াছ?" ডাক্তার ক্যাম্বেল বলিলেন যে "নিয়মমত শরীরের অঙ্গ চালনা করিলেই দুর্ব্বল শরীর সুস্থ হইবে এবং পড়া শুনা করিবার ক্ষমতাও জন্মিবে।" কিন্তু তাহার বন্ধু এ কথায় বিশ্বাস না করিয়া চলিয়া গেলেন। অনেক দিন কাটিয়া গেল; উক্ত [illegible] মত শরীরের অঙ্গ চালনা করি[illegible] হইল। ইহার পর এক দি[illegible] বন্ধু পুনর্ব্বার স্কুল পরিদর্শন করিতে [illegible] পূর্ব্বে যে দুর্ব্বল ছেলেদিগকে দেখি[illegible] ছিলেন তাহাদিগকে দেখিয়া বলি[illegible] "ইহারা কখনই তাহারা নহে, তাহাদে[illegible] বর্ত্তে অন্য কাহাদিগকেও দেখাইতেছ?" ব্যায়াম করিয়া শরীরের এমনই পরিবর্ত্তন হইয়াছে যে তাহাদিগকে তিনি চিনিতে পারিলেন না।

শরীরের উন্নতির দিকে যেমন এই রূপ

যত্ন করা হইত অন্যান্য বিষয়ে শিক্ষা দিবার জন্যও পদপেক্ষা কম যত্ন করা হইত না। প্রত্যেক শ্রেণীতেই সঙ্গীত, ইতিহাস, সাহিত্য, অঙ্ক সমুদয় নিয়ম মত শিখান হয়। এমন যত্নে শিখান হয় যে অনেক ছাত্র কালেজ হইতে বাহির হইয়া কাজ কর্ম্ম করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছেন। এই কালেজে যাঁহারা নিয়মমত শিক্ষা লাভ করিয়া বাহির হইয়াছেন তাহারা কোন অংশেই অন্যান্য স্কুলের শিক্ষিত লোকের চেয়ে কম জ্ঞানবান নহেন। বিদ্যা বুদ্ধিতে কাহারও চেয়ে কম নহেন। ধন্য তিনি যিনি দুঃখী অন্ধদিগের শিক্ষার জন্য এই নূতন শিক্ষা প্রণালীর আবিষ্কার করিয়াছেন।

যাঁহাদের পয়সা কড়ি আছে তাঁহাদের বিদ্যা শিক্ষার জন্য কালেজ আছে, সেখানে পড়িয়া তাঁহারা কাজ কর্ম্ম করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারেন। আর যাহাদের সে রূপ সৌভাগ্য নাই তাহাদের সাহায্যের জন্যও আজ প্রায় ২৭ বৎসর হইল বিলাতে একটী সভা স্থাপিত হইয়াছে। এই সভার সম্পাদক সম্প্রতি [illegible] ডাক্তারেরা বলিয়াছেন যে [illegible] অন্ধদের সহিত বেড়াইতেন, অন্ধদের [illegible] বলিয়াই অন্ধ হইয়াছেন। [illegible] পরিশ্রম করিতে কাতর [illegible] তাহাদের উপকার করিতেছেন, বাড়ী বাড়ী [illegible] কাপড় ভিক্ষা করিয়া আনিয়া [illegible] করিতেছেন, যাহার যথার্থ [illegible] দূর করিবার জন্য প্রাণপণে তিনি চেষ্টা করিতেছেন। এই রূপ খাটিতে খাটিতেই তাহার চক্ষু দুইটী অন্ধ হইয়াছে। যেমন তিনি তেমন তাহার স্ত্রী; তাহার স্ত্রী ও স্বামীর সাহায্য করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত। দুই জনেই বিনা পুরস্কারে আজ ২৭ বৎসর অন্ধদিগের দুঃখ দূর করিবার জন্য এই সভা হইতে খাটিতেছেন। যাহারা কাজ কর্ম্ম করিয়া খাইতে পারে না তাহাদের সাহায্যের জন্য এই সভা স্থাপিত। এখন এই সভা হইতে প্রায় ১৫০ দেড়-শত অন্ধকে সপ্তাহে সপ্তাহে কিছু কিছু করিয়া নগদ দেওয়া হয়। এই সভার বার্ষিক অধিবেশনে অনেক দূর হইতে বহু সংখ্যক অন্ধেরা উপস্থিত হয়। সকলকেই বহু যত্নে আদরপূর্ব্বক খাওয়ান হয়। একটী বড় বাড়ীতে সকলে উপস্থিত হইলে তাহাদের ক্লান্তি দূর করিবার জন্য প্রথমতঃ একটী সুমধুর সঙ্গীত করা হয়। ইহার পর সমুদয় আত্মীয় স্বজনের পরস্পর আলাপ হয়; বহুদিন পরে দূর দেশবাসী আত্মীয় স্বজনের কথা শুনিয়া তাহাদের যে কি সুখ হয় তাহা বলা যায় না। এই সময়ে সভার সভ্যেরা কাহার বাড়ীতে কি অভাব, কে কে আসিতে পারিল না, কেন আসিতে পারিল না এই সমুদয় অতি যত্নের সহিত জানিয়া লন।

এই রূপে কিছুকাল অতিবাহিত হইলে তাহাদিগকে চা, রুটী, মাখন, মাংস, কমলা লেবু ইত্যাদি অনেক প্রকার সুখাদ্য যথেষ্ট পরিমাণে দেওয়া হয়। যাহারা বার্দ্ধক্য বা রোগ হেতু অথবা অন্য কোন কারণ বশতঃ সভায় উপস্থিত হইতে পারে নাই তাহাদের জন্য তাহাদের আত্মীয় স্বজনের নিকট কমলা লেবু দেওয়া হয় এবং যখন সকলে বাড়ী ফিরিয়া যায় তখন তাহাদের প্রত্যেককে ।০ আট আনা এবং এক এক বাক্স বিস্কুট দেওয়া হয়।

যাহাদের দেখিবার শক্তি নাই, তাহারা যদি এই রূপ পরের সাহায্য না পায়, তাহা হইলে কিদের দুঃখের সীমা আছে! আমাদের দেশের

অন্ধদের যে এমন দুরবস্থা তাহার প্রধান কারণ এই যে, তাহাদের ভাল করিতে কেহই যত্ন করেন না। কাজে কাজেই তাহারা কোন মতে কষ্টে সৃষ্টে ভিক্ষা করিয়া জীবন কাটায়। ইহাদের মত দুঃখী আর কেহ নাই। ইহারা প্রকৃতই দয়ার পাত্র। হে বালক বালিকাগণ! তোমরা যে যাহা পার ইহাদিগকে সর্ব্বদা সাহায্য করিও।

মূল বর্ণ।

রামধনু বিষয়ক একটী প্রস্তাব গত বর্ষের 'সখা'র ২৩ পৃষ্ঠায় লেখা হইয়াছিল. তাহাতে এক জায়গায় লেখা ছিল যে "লাল, সবুজ আর ভায়লেট্, এই তিনটী মূল বর্ণ; আর অন্য কয়েকটী বর্ণ ইহাদের হইতে উৎপন্ন।" লাল, নীল এবং পীত, এই তিনটী মূল বর্ণ, এইরূপ বিশ্বাসই সাধারণে প্রচলিত; সুতরাং আমাদের ঐরূপ লেখাতে অনেকেই চমৎকৃত হইয়াছেন। আমরা এ সম্বন্ধে একখানি চিঠিও পাইয়াছি। চিঠিখানি পড়িয়া আমরা অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি; এবং আহ্লাদের সহিত এবিষয়ে আমরা যাহা জানি, পত্র লেখকের সন্দেহ দূর করিবার জন্য তাহা লিখিতেছি।

প্রথমে অবান্তর কথা দু-একটী বলা আবশ্যক হইয়াছে। এ বিষয়টী ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে 'সখা'র এই প্রবন্ধে কুলাইবে না। কিন্তু কিছু একটু বুঝাইতে চেষ্টা করার পূর্ব্বে ও আলোক সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। আলোক আছে বলিয়াই আমরা জিনিসের রং দেখিতে পাই। রংটা বাস্তবিক জিনিসের নয়, রংটা আলোকের। জিনিসটা কিছু আমাদের চক্ষে আসিয়া পড়ে না; আমরা যে সকল জিনিস দেখি, সেগুলি যদি আমাদের চক্ষে আসিয়া পড়ার দরকার হইত, তবে এতদিনে অন্ধ হইয়া যাইতাম! জিনিস হইতে আলো আসিয়া আমাদের চক্ষে পড়ে। সেই আলোকের যে রং, জিনিসটার ও সেই রং দেখা যায়। জিনিস হইতে আলোক দুই প্রকারে আসিয়া আমাদের চক্ষে পড়িতে পারে। এক,—জিনিসটার ভিতর দিয়া আসিতে পারে, আর—তাহার গায় পড়িয়া উল্টিয়া আসিয়া আমাদের চক্ষে পড়িতে পারে। আর এক কথা, ভিতর দিয়াই আসুক, আর উল্টিয়াই আসুক, জিনিসে যত প্রকারের আলো পড়ে, সাধারণতঃ তাহার সকল গুলি আমাদের চক্ষে আসিতে পারে না। আলো পড়িবামাত্র জিনিসটা তাহার কিছুটা খাইয়া ফেলে, বাকী আমাদের কাছে আসিতে দেয়। কোন জিনিস [illegible] আর সকল রঙের আলো [illegible] লাল দেখা যায়; যে জিনিস [illegible] সব আলো খায়, তাহা[illegible] জিনিস সকল প্রকারের [illegible] কাল দেখা যায়। যে জিনিস [illegible] আলোই খাইতে জানে না, সে [illegible] যত আলো পড়ে তাহা [illegible] ফেলে, তবে তাহাকে কাল দেখাইবে। সবুজ জিনিসে সবুজ ছাড়া আর যেরূপ আলোই পড়ুক না, সে তাহা খাইয়া ফেলিবে এবং কাল দেখা-

হইবে।* আমরা সাধারণতঃ যে আলোতে দেখি তাহা সাদা। সাদা আলো সকল প্রকারের আলোর সমষ্টি; সুতরাং তাহাতে সকল প্রকারের জিনিসই স্বাভাবিক বর্ণের দেখা যায়। সাদা জিনিস কোনরূপ আলোকই খায় না, সুতরাং তাহাতে যখন যে রঙের আলো পড়ে, তখন সেই রং দেখায়। ইত্যাদি।

লাল রঙের কাচ লাল কেন? না, তাহার ভিতর দিয়া সে কেবল লাল রঙের আলো আসিতে দেয়, আর সব খাইয়া ফেলে। সবুজ কাচের ভিতর দিয়া কেবল সবুজ আলো আসিতে পারে, সেই জন্য সে সবুজ; ইত্যাদি। এখন মনে কর একখানা লাল রঙের কাচের উপর একখানা সবুজ রঙের কাচ রাখিয়া দুখানারই ভিতর দিয়া চাহিয়া দেখিলে কি দেখিবে? লালে সবুজে মিশিয়া যে রং হয়? না; সবুজ কাচখানা আলোর সব রং খাইয়া কেবল সবুজ আলো আসিতে দিয়াছিল, লালখানায় তাহাও খাইয়া ফেলিল। সুতরাং কোন রংই দেখিবে না। দেখিবে কেবল কালো।

[illegible] কাচের উপর আলো পড়িলে তাহার কতকটা [illegible] আইসে; কিন্তু সে অতি [illegible] ভিতরে যায়। কাচে [illegible] এই যে ভিতরে আসিল [illegible] খাইয়া ফেলে। এখন [illegible]দের কিছু অপর পৃষ্ঠে [illegible]সে, অবশিষ্ট ওপিঠে [illegible]হইয়া তাহাতে পল্‌তে ভিজাইয়া আলো জ্বালিলে সে আলো বিশুদ্ধ পীতবর্ণের হয়। সেই পীতবর্ণের আলোতে পীত ছাড়া অন্য রঙের জিনিস কাল দেখাইবে। পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইলে প্রথমতঃ ঘর সম্পূর্ণরূপে অন্ধকার করিয়া লইতে হইবে।

বাহির হইয়া যায়; এই দুই রকম আলোর দরুণই কাচের রং দেখা যাইবে। যত প্রকার জিনিসের রং দেখা যায়, (তাহাদের যদি নিজের আলো না থাকে) সকল প্রকার জিনিসের ভিতরেই আলো গিয়া ফিরিয়া বাহিরে আসিয়াছে ইহা নিশ্চয়; কারণ বাহির হইতে যে আলোক ফিরিয়া আইসে তাহার রঙের কোনরূপ পরিবর্ত্তন হইতে পারে না।—পরিবর্ত্তন হওয়ার অর্থ এই যে, যতগুলি ছিল, তাহার কিছু খাইয়া ফেলিয়াছে। যাহার নিজের আলো নাই তাহা দ্বারা আর কোনরূপ পরিবর্ত্তন হওয়া সম্ভব নহে।* অনেকে মনে করেন যে, যে জিনিস স্বচ্ছ নহে, তাহার ভিতরে আলো যাইতে পারে না, তবে তাহার রং হয় কি করিয়া? ইহার উত্তরে এই বলা যাইতে পারে যে, এমন জিনিস নাই, যাহা অল্প পরিমাণেও স্বচ্ছ নয়। খুব পাতলা হইলে ধাতুর পাতের ভিতর দিয়াও আলো আসিতে পারে।

এখন কাজের কথা হউক। আমাদের সাধারণ বিশ্বাস, নীল পীত মূল বর্ণ; তার যোগে সবুজ হইয়াছে। এখন জানিলাম, লাল সবুজ মূল বর্ণ, তার যোগে পীতের উৎপত্তি, এবং সবুজ ভায়লেট মূল বর্ণ, তার যোগে নীলের উৎপত্তি। আমাদের প্রমাণ নীল রঙের আর পীত রঙের জিনিসের চূর্ণ মিশাইয়া দেখা। কিন্তু পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে ঐরূপ ভাবে মিশ্রিত চূর্ণ হইতে যে আলো আইসে

* যাহার নিজের আলো আছে, তাহা বাহিরের আলো ছাড়াও দেখা যায়। আর অন্য আলো তাহাতে পড়িলে নিজের আলো তাহাতে মিশাইয়া দিয়া তাহাকে পরিবর্ত্তিত করিতে পারে।

তাহার অধিকাংশই দুই প্রকারের চূর্ণের ভিতর দিয়াই আসিয়া থাকে। সুতরাং ঐরূপ আলোর যে রং মিশ্রিত চূর্ণেরও প্রায় সেই রং হইবে। নীল পীত যদি মূল বর্ণ হইত, তবে নীল চূর্ণ আলোর সমস্ত অংশ খাইয়া কেবল নীল অংশ রাখিত, সেই অংশ আবার পীত চূর্ণের ভিতর দিয়া যাইবার সময় ভক্ষিত হইয়া যাইত। সুতরাং লাল এবং সবুজ কাচের ভিতর দিয়া আসিয়া আলোর যে দশা হইয়াছিল এখানেও তাহাই হইত। দুই চূর্ণ মিশিয়া প্রায় কাল রং হইত। কিন্তু নীল পীত উভয়ের মধ্যেই সবুজ থাকাতে সবুজ আলোটা উভয় প্রকার চূর্ণের ভিতর দিয়াই চলিয়া আসিতে পারে, কেহই তাহাকে খাইয়া ফেলে না। সুতরাং মিশ্রের রং সবুজ দেখায়। সেই রূপ লাল চূর্ণ আর সবুজ চূর্ণ মিশাইয়া আমরা একটা ধূঁয়ার মতন রং পাই। তাহাতেই মনে করি, বুঝি লাল আলো আর সবুজ আলো মিশিয়াও ঐ রংই হইবে। কিন্তু লাল আলো আর সবুজ আলো মিশিয়া যে রং হয় সে কিরূপ, জান? সে সাদা মতন! অতএব দুই তিন রঙের চূর্ণ মিশাইয়া সেই রঙের আলো মিশাইয়া ফেলিয়াছি, মনে করিলে চলিবে না।

আমরা এতক্ষণ যাহা বলিলাম তাহাতে আমাদের বক্তব্য বিষয়টাকে খুব পরিষ্কার করিতে পারিয়াছি এরূপ ভরসা করি না। একটী কথা মনে রাখিতে চেষ্টা করিবেঃ—দুই তিন প্রকারের চূর্ণ মিশাইলে একের বর্ণের সহিত অন্যের বর্ণের যোগ করা হইল না; উভয়ের সাধারণ অংশটুকু রাখিয়া অবশিষ্ট অংশটুকুকে ধ্বংস করা হইল মাত্র। কারণ, প্রথম যার ভিতর দিয়া আলো আসিল, তার যে রং তাহা ছাড়া অন্য সকল প্রকারের আলো সে খাইয়া ফেলিল। অবশিষ্ট আলোটুকু যখন দ্বিতীয় চূর্ণের ভিতর দিয়া গেল সেও তাহাই করিল; ইত্যাদি। একটী দৃষ্টান্ত দিইঃ—সিন্দুর লাল, আল্ট্রামেরিণ পরিস্কার নীল। সিন্দুরে আল্ট্রামেরিণে মিশাইলে আমাদের হিসাবে বেগুণে রং হওয়া উচিত। কিন্তু কাজে দেখি প্রায় কাল রং হয়। লাল মূল বর্ণ, নীলে সবুজ এবং ভায়লেট আছে; এই দুয়ের মধ্যে সাধারণ কিছুই নাই, সুতরাং মিশ্রিত জিনিস কাল দেখাইবারই কথা। এখানেও দেখা যাইতেছে যে, আমরা যেরূপ বিশ্বাস করি, তার মতন কাজ হইল না। আমরা লাল রঙের জিনিস এবং নীল রঙের জিনিস অন্য জায়গায় মিশাইয়া বেগুণে পাইয়াছিলাম, তাহার কারণ এই ছিল যে, আমরা তখন যে নীল ব্যবহার করিয়াছিলাম তাহা বিশুদ্ধ নীল ছিল না, তাহাতে লালের অংশ কিছু ছিল। সুতরাং সেই লালের আভা দেখিয়া আমরা ভ্রমে পড়িয়াছিলাম। পণ্ডিতেরা এইরূপ অনেক দেখিয়া শেষে স্থির করিয়াছেন যে, আমরা সচরাচর যাহা ভাবি তাহা নয়। বাস্তবিক লাল, সবুজ এবং ভায়[illegible] মূল [illegible]।

(Deschanel's Natural [illegible])

গ্রন্থে [illegible]

বর্ণনা আছে[illegible]

তাও ভাল দেখে। ছেলে যত কুৎসিত হউক্, মার চক্ষে সে সোণামণি, যাদুমণি, আঁধার ঘরের মাণিক, কত কি! কেননা তিনি সন্তানকে ভাল বাসেন। খুব সাবধানে পরীক্ষা না করিলে যাঁকে ভালবাসা যায় তাঁর দোষ দেখা যায় না। এখন, ঐ সকল মন্দ ছেলেদের সঙ্গে সর্ব্বদা মিশিতে মিশিতে শেষে এমন হয় যে, তাহাদের দোষগুলিও গুণ বলিয়া মনে হয়, আর তা হলেই সর্ব্বনাশ। সেই সব দোষ নিজের মধ্যে আসিবেই, আসিবে। বুঝলে ত?"

মোহিত—"হাঁ মহাশয়! কিন্তু এমনও ত হয় যে, দোষ বুঝিয়া ও জানিয়া শুনিয়া ছেলে নষ্ট হয়। সে কেন হয় তবে?"

শিক্ষক—"ঠিক্ বলিয়াছ। পূর্ব্বে যে বলিলাম দুটী কারণে মন্দ হয় ঐটী তাহার দ্বিতীয় কারণ। ১ম টী এই যে, দোষকে ভালবাসার খাতিরে গুণ মনে করিয়া গ্রহণ করে। আর ২য় টী এই যে জানিয়া শুনিয়াও দোষ গ্রহণ করে। তোমরা জান, যে জিনিস প্রথমে খুব মন্দ মনে হয়, বেশী দিন তার কাছে থাকিলে তাহা সহ্য হইয়া যায়, আর তখন উহা তত মন্দ মনে হয় না। অভ্যা- [illegible] দেখিলেন আর কিছু হয় না, তখন আস্তে আস্তে সরিয়া সরিয়া কলার কাছে গিয়া বসিলেন। লজ্জায় হঠাৎ খাইতেও পারেন না; ইচ্ছাটা যে মা একটীবার বলেন ত খান। যাই মা বলিলেন

"খাওনা বাবা" আর কি? টপ্ করে নিয়ে ছুট! এখানে ঠিক তাই হয়। যা একদিন বড় খারাপ বলিয়া তুমি ঘৃণা করিলে যদি সে স্থান হইতে উঠিয়া অন্য ভাল স্থানে না যাও বা ভাল দ্রব্য না পাও, তবে আপনা হতেই ঐ কুৎসিত জিনিসের উপর তোমার ঘৃণা কমিয়া গিয়া ক্রমে বলিবে "দূর হোক্‌গে, নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল।" তাতেই অনেকের সর্ব্বনাশ হয়। অনেকের মদের উপর বা সিদ্ধি, তামাক বা অন্য নেশার উপর খুব ঘৃণা থাকে, কিন্তু ক্রমে ঐ সকল অসচ্চরিত্র লোকদের সঙ্গে থাকিতে থাকিতে তাহাদিগকে মাতাল ও মহা নেশাখোর হ'তে দেখা যায়। তার কারণ এই। এখন এ দুটী কারণ সকলে বুঝেছ?"

সকলেই সন্তুষ্ট হইয়া বলিল "হাঁ মহাশয়!" তখন তিনি বলিলেন "কুসঙ্গের আর কি কি দোষ আছে কে জান বল দেখি?" তখন শরৎ বলিল "আমার বোধ হয় আর একটা দোষ এই যে, কু সঙ্গীরা সর্ব্বদা কু পরামর্শ দিতে থাকে তাহা শুনিয়া খুব ভাল ছেলের মনও বেশী দিন ভাল থাকিতে পারে না।"

[illegible] সন্তুষ্ট হইয়া সকলকে বলিলেন "ইহাও [illegible] কারণে হয়। কেননা চরিত্রের গোড়ায় [illegible] দেখিলে দুটী জিনিস দেখা যায়। সকল মানুষেরই আপনা হতে যা কিছু ভাল তার দিকে [illegible] কেমন টান আছে, আর যা কিছু মন্দ তার দিকে একটা ঘৃণা আছে। এটী ঈশ্বরদত্ত গুণ, [illegible] এই রকম। যেমন লোকের স্বভাবই এই যে, গোলাপ ফুলের গন্ধে মন প্রফুল্ল হয় আর দুর্গন্ধ বস্তুকে ঘৃণা করে;—এমন মানুষই বোধহয় নাই যে আতরের গন্ধে ঘৃণা করে আর পঁচা পুকুরের গন্ধে খুসী হয়। তবে কু-

অভ্যাসের জন্য যার রুচি ও পছন্দ খারাপ হয়ে গেছে তাদের কথা ছেড়ে দাও। নহিলে সহজ স্বভাবের গুণই এমনি যে, যা কিছু ভাল তাতেই মন টানে আর মন্দ মাত্রেই ঘৃণা হয়। যিনি মদ খান না, সচ্চরিত্র লোক, তাঁকে ঘোর মাতালেরাও ভক্তি করে। সত্যবাদী সাধু ব্যক্তিকে জুয়াচোর নীচ লোকেরাও শ্রদ্ধা করে। পাষণ্ড ডাকাতে-রাও দয়ালু পরোপকারীর প্রশংসা করে।—কেন? এই জন্য।

"এই এক জিনিস সকলের চরিত্রে দেখা যায়। আর একটী আছে সেটী কি? শুধু ভালর দিকে টান থাকিলেই ত মানুষ ভাল হইতে পারে না; শুধু ক্ষুধা থাকিলেই ত আর পেট ভরে না, গায়েরও জোর হয় না। কি চাই? আহারের দ্রব্য চাই, অর্থাৎ ভাল উপদেশ চাই, ভাল শিক্ষা পাওয়া চাই। এই দুটী একত্র হ'লে তবে ভাল লোক হওয়া যায়। যদি আহার না পায়, অর্থাৎ ভাল উপদেশ না পায় তাহ'লে স্বভাব যার নির্ম্মল, যার রুচি মন্দ হইয়া যায় নাই, যার চরিত্রের ক্ষুধা আছে অর্থাৎ ভাল হইবার ইচ্ছা আছে, এমন সকল বালকও খারাপ হইয়া যায়। তবে বুঝিলে যে ভাল হইতে গেলে [illegible] চাই [illegible] শুধু ভাল হইবার ইচ্ছা থাকিলেই হয় না [illegible] উপদেশ এবং সুশিক্ষা পাওয়া চাই।"

নগেন—"কিন্তু, মহাশয়! [illegible] হ'বার খুব ইচ্ছা থাকে সে ভাল উপদেশ [illegible] লইতে পারে।"

শিক্ষক—"তা সত্য [illegible] সে সব ছেলে [illegible] কুসঙ্গে যায়ই না।"

বিধুভূষণ—"আচ্ছা, ভাল হ'বার ইচ্ছা যদি স্বাভাবিক, তবে সকলে সৎ উপদেশ পাইয়াও ভাল হয় না কেন? বরং তাতে দু এক জন

আরও অধিক দুষ্ট ও ভণ্ডতপস্বীর মত হইয়া ঠকাতে শিখে এও ত দেখিয়াছি!"

শিক্ষক—"এ কথাও মিথ্যা নয়। প্রথমে যখন তলোয়ার প্রস্তুত হয় তখন ত কেমন ধার, ঝক্ ঝক্ করে। তাকে যদি ভাল করিয়া ব্যবহার না করিয়া তুলিয়া রাখা হয় তা'হলে মরচে পড়ে। শেষে বেশী দিন থাকিলে এমন হয় যে তা'র দ্বারা কোপ মারিলে জিনিসটা না কাটিয়া তলোয়ার খানাই ভাঙ্গিয়া যায়। এখানেও ঠিক তাই হয়। বেশী দিনের জন্য কুসঙ্গে পড়িলেও মানুষের স্বভাবে মরিচা পড়ে তখন সে আর উপদেশ মত কাজ করিতে পারে না বরং আরও মন্দ হইয়া উচ্ছন্ন যায়।

"এখন বেশ্ বুঝিলে যে চরিত্র ভাল করিতে হইলে সর্ব্বদা ভাল ভাল কথা শুনিতে হয়, ভাল ভাল বই পড়িতে হয়, ভাল ভাল লোকের সঙ্গে বেড়াইতে হয়। নহিলে ভাল হওয়া কঠিন। কিন্তু কুলোকের সঙ্গে সর্ব্বদা থাকিলে এর কিছুই হয় না। বরং বিপরীত দিকেই ফল হয়। সর্ব্বদা মন্দ কথা শুনিয়া মন্দ কাজ দেখিয়া নিজের স্বাভাবিক গুণের প্রতি ভালবাসা ও দোষের প্রতি [illegible] হয় এই যে—যে কাজে একলা থাকিলে এক গুণ উৎসাহ হয়, দশ জন একত্র মিলিলে সে কাজে একশ গুণ উৎসাহ বাড়ে। তাতে দলের মধ্যে কুকাজে উৎসাহ ও ভরসা খুব বেশী হয়।"

তাও ভাল দেখে। ছেলে যত কুৎসিত হউক্, মার চক্ষে সে সোণামণি, যাদুমণি, আঁধার ঘরের মাণিক, কত কি! কেননা তিনি সন্তানকে ভাল বাসেন। খুব সাবধানে পরীক্ষা না করিলে যাঁকে ভালবাসা যায় তাঁর দোষ দেখা যায় না। এখন, ঐ সকল মন্দ ছেলেদের সঙ্গে সর্ব্বদা মিশিতে মিশিতে শেষে এমন হয় যে, তাহাদের দোষগুলিও গুণ বলিয়া মনে হয়, আর তা হলেই সর্ব্বনাশ। সেই সব দোষ নিজের মধ্যে আসিবেই, আসিবে। বুঝ্‌লে ত?"

মোহিত—"হাঁ মহাশয়! কিন্তু এমনও ত হয় যে, দোষ বুঝিয়া ও জানিয়া শুনিয়া ছেলে নষ্ট হয়। সে কেন হয় তবে?"

শিক্ষক—"ঠিক্ বলিয়াছ। পূর্ব্বে যে বলিলাম দুটী কারণে মন্দ হয় ঐটী তাহার দ্বিতীয় কারণ। ১ম টী এই যে, দোষকে ভালবাসার খাতিরে গুণ মনে করিয়া গ্রহণ করে। আর ২য় টী এই যে জানিয়া শুনিয়াও দোষ গ্রহণ করে। তোমরা জান, যে জিনিস প্রথমে খুব মন্দ মনে হয়, বেশী দিন তার কাছে থাকিলে তাহা সহ্য হইয়া যায়, আর তখন উহা তত মন্দ মনে হয় না। অভ্যা-[illegible]

[illegible] দেখিলেন আর কিছু হয় না, তখন আস্তে আস্তে সরিয়া সরিয়া কলার কাছে গিয়া বসিলেন। লজ্জায় হঠাৎ খাইতেও পারেন না; ইচ্ছাটা যে মা একটীবার বলেন ত খান। যাই মা বলিলেন "খাওনা বাবা" আর কি? টপ্ করে নিয়ে ছুট! এখানে ঠিক তাই হয়। যা একদিন বড় খারাপ বলিয়া তুমি ঘৃণা করিলে যদি সে স্থান হইতে উঠিয়া অন্য ভাল স্থানে না যাও বা ভাল দ্রব্য না পাও, তবে আপনা হতেই ঐ কুৎসিত জিনিসের উপর তোমার ঘৃণা কমিয়া গিয়া ক্রমে বলিবে "দূর হোক্‌গে, নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল।" তাতেই অনেকের সর্ব্বনাশ হয়। অনেকের মদের উপর বা সিদ্ধি, তামাক বা অন্য নেশার উপর খুব ঘৃণা থাকে, কিন্তু ক্রমে ঐ সকল অসচ্চরিত্র লোকদের সঙ্গে থাকিতে থাকিতে তাহাদিগকে মাতাল ও মহা নেশাখোর হ'তে দেখা যায়। তার কারণ এই। এখন এ দুটী কারণ সকলে বুঝেছ?"

সকলেই সন্তুষ্ট হইয়া বলিল "হাঁ মহাশয়!" তখন তিনি বলিলেন "কুসঙ্গের আর কি কি দোষ আছে কে জান বল দেখি?" তখন শরৎ বলিল "আমার বোধ হয় আর একটা দোষ এই যে, কু সঙ্গীরা সর্ব্বদা কু পরামর্শ দিতে থাকে তাহা শুনিয়া খুব ভাল ছেলের মনও বেশী দিন ভাল থাকিতে পারে না।"

[illegible] হইয়া সকলকে বলিলেন "ইহাও [illegible] কারণে হয়। কেননা চরিত্রের গোড়ায় [illegible] দেখিলে দুটী জিনিস দেখা যায়। সকল মানুষেরই আপনা হতে যা কিছু ভাল তার দিকে [illegible] কেমন টান আছে, আর যা কিছু মন্দ তার দিকে একটা ঘৃণা আছে। এটী ঈশ্বরদত্ত গুণ, [illegible] ই এই রকম। যেমন লোকের স্বভাবই এই যে, গোলাপ ফুলের গন্ধে মন প্রফুল্ল হয় আর দুর্গন্ধ বস্তুকে ঘৃণা করে;—এমন মানুষই বোধহয় নাই যে আতরের গন্ধে ঘৃণা করে আর পঁচা পুকুরের গন্ধে খুসী হয়। তবে কু-অভ্যাসের জন্য যার রুচি ও পছন্দ খারাপ হয়ে গেছে তাদের কথা ছেড়ে দাও। নহিলে সহজ স্বভাবের গুণই এমনি যে, যা কিছু ভাল তাতেই মন টানে আর মন্দ মাত্রেই ঘৃণা হয়। যিনি মদ খান না, সচ্চরিত্র লোক, তাঁকে ঘোর মাতালেরাও ভক্তি করে। সত্যবাদী সাধু ব্যক্তিকে জুয়াচোর নীচ লোকেরাও শ্রদ্ধা করে। পাষণ্ড ডাকাতেরাও দয়ালু পরোপকারীর প্রশংসা করে।—কেন? এই জন্য।

"এই এক জিনিস সকলের চরিত্রে দেখা যায়। আর একটী আছে সেটী কি? শুধু ভালর দিকে টান থাকিলেই ত মানুষ ভাল হইতে পারে না; শুধু ক্ষুধা থাকিলেই ত আর পেট ভরে না, গায়েরও জোর হয় না। কি চাই? আহারের দ্রব্য চাই, অর্থাৎ ভাল উপদেশ চাই, ভাল শিক্ষা পাওয়া চাই। এই দুটী একত্র হ'লে তবে ভাল লোক হওয়া যায়। যদি আহার না পায়, অর্থাৎ ভাল উপদেশ না পায় তাহ'লে স্বভাব যার নির্ম্মল, যার রুচি মন্দ হইয়া যায় নাই, যার চরিত্রের ক্ষুধা আছে অর্থাৎ ভাল হইবার ইচ্ছা আছে, এমন সকল বালকও খারাপ হইয়া যায়। তবে বুঝিলে যে ভাল হইতে গেলে [illegible] চাই; শুধু ভাল হইবার ইচ্ছা থাকিলেই হয় না, ভাল উপদেশ এবং সুশিক্ষা পাওয়া চাই।"

নগেন—"কিন্তু, মহাশয়! [illegible] হ'বার খুব ইচ্ছা থাকে সে ভাল উপদেশ [illegible] লইতে পারে।"

শিক্ষক—"তা সত্য। সে সব ছেলে [illegible] কুসঙ্গে যায়ই না।"

বিধুভূষণ—"আচ্ছা, ভাল হ'বার ইচ্ছা যদি স্বাভাবিক, তবে সকলে সৎ উপদেশ পাইয়াও ভাল হয় না কেন? বরং তাতে দু এক জন আরও অধিক দুষ্ট ও ভণ্ডতপস্বীর মত হইয়া ঠকাতে শিখে এও ত দেখিয়াছি।"

শিক্ষক—"এ কথাও মিথ্যা নয়। প্রথমে যখন তলোয়ার প্রস্তুত হয় তখন ত কেমন ধার, ঝক্ ঝক্ করে। তাকে যদি ভাল করিয়া ব্যবহার না করিয়া তুলিয়া রাখা হয় তা'হলে মরচে পড়ে। শেষে বেশী দিন থাকিলে এমন হয় যে তা'র দ্বারা কোপ মারিলে জিনিসটা না কাটিয়া তলোয়ার খানাই ভাঙ্গিয়া যায়। এখানেও ঠিক তাই হয়। বেশী দিনের জন্য কুসঙ্গে পড়িলেও মানুষের স্বভাবে মরিচা পড়ে তখন সে আর উপদেশ মত কাজ করিতে পারে না বরং আরও মন্দ হইয়া উচ্ছন্ন যায়।

"এখন বেশ্ বুঝিলে যে চরিত্র ভাল করিতে হইলে সর্ব্বদা ভাল ভাল কথা শুনিতে হয়, ভাল ভাল বই পড়িতে হয়, ভাল ভাল লোকের সঙ্গে বেড়াইতে হয়। নহিলে ভাল হওয়া কঠিন। কিন্তু কুলোকের সঙ্গে সর্ব্বদা থাকিলে এর কিছুই হয় না। বরং বিপরীত দিকেই ফল হয়। সর্ব্বদা মন্দ কথা শুনিয়া মন্দ কাজ দেখিয়া নিজের স্বাভাবিক গুণের প্রতি ভালবাসা ও দোষের প্রতি [illegible]

[illegible] হয় এই যে—যে কাজে একলা থাকিলে এক গুণ উৎসাহ হয়, দশ জন একত্র মিলিলে সে কাজে একশ গুণ উৎসাহ বাড়ে। তাতে দলের মধ্যে কুকাজে উৎসাহ ও ভরসা খুব বেশী হয়।"

শিক্ষক মহাশয় অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। "এটী অতি সত্য কথা। মনে কর, কয়লার উনুনে আগুন গম্ গম্ কর্চ্ছে, এখন এক একটী করে জ্বলন্ত কয়লা যদি চিমটা করিয়া তুলিয়া মাটীতে আলাদা রাখা যায়, তাহ'লে একটু পরে সে গুলা নিবিয়া যায়। এখানেও ঠিক তাই। তোমরা সকলেই জান যে, একলা কোন কাজে মনে তত উৎসাহ হয় না। দুজন হলে ভরসা হয়, দশজন একত্র হলে আর উৎসাহ ও আনন্দ ধরে না। হৈ হৈ শব্দে আকাশ ফাটে। মহা হল্লা পড়িয়া যায়। কি ভাল কাজ কি মন্দ কাজ সব কাজেই দশ জন সঙ্গী পেলে কাজের সুবিধা হয়। একজন "ভয় কি ?" বলিয়া উঠিলে অমনি সকলের মুখে "ভয় কি" "ভয় কি" শব্দ হইতে থাকে। এই জন্য সর্ব্বদা দেখা যায় যে, যে দুষ্ট ছেলে একাকী মন্দ কর্ম্ম করে তাহাকে শীঘ্র শুধ্‌রাণ যায়, কিন্তু যে দলে মিশে মন্দ কাজ করে তার পিতা মাতা এবং আত্মীয় বন্ধুগণও কত চেষ্টা করিয়াও তাহাকে ভাল করিতে পারেন না।

"এইরূপে ভাবিয়া দেখিলে অসৎ সংসর্গের যে কত দোষ দেখা যাইবে তাহার সংখ্যা নাই। [illegible] ভাল হইবার একটুও [illegible] প্রাণ গেলেও মন্দ [illegible] [illegible]

তার পর [illegible] "good bye, sir" বলিয়া বাড়ী গেল।

আমাদের দেশের লোকের দয়া।

যখন ১৮৫৭ সালে সিপাহিদিগের হাঙ্গামা উপস্থিত হয়, তখন উন্মত্ত সিপাহিরা অনেক সাহেব বিবি, বালক বালিকাকে হত্যা করিতে থাকে। এই সময়ে আমাদের দেশের অনেকে দয়া করিয়া সাহেব বিবি ও বালক বালিকাদিগকে রক্ষা করিয়াছেন। এমন কি কেহ কেহ ইহাদের রক্ষার জন্য আপনার প্রাণ পর্য্যন্ত দিয়াছেন। আজ তোমাদিগকে এ বিষয়ে একটী কথা শুনাইব।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে কানপুর নামে একটী সহর আছে। সহরটী গঙ্গার ধারে। এই সহরে গবর্ণমেণ্টের অনেক সৈন্য থাকে। সিপাহি হাঙ্গামার সময় কানপুর সিপাহিদিগের একটী প্রধান আড্ডা হয়। কানপুরের নিকটে বিঠোর নামক একটী স্থানে নানাসাহেব থাকিতেন। এই নানাসাহেব সিপাহিদিগের পক্ষ হইয়া ইংরেজদিগের সহিত যুদ্ধ করেন। সিপাহি যুদ্ধে নানাসাহেব কানপুরের অনেক সাহেব বিবি ও বালক বালিকাকে অবরোধ করেন। সেই সময়ে ইংরেজ সেনাপতি নানাসাহেবকে পরাস্ত করিতে না পারিয়া এই নিয়মে কানপুর নানাসাহেবের হস্তে সমর্পণ করিবার প্রস্তাব করেন যে, সহরে যত ইংরেজ মহিলা ও বালক বালিকা আছে, তাহারা নৌকায় চড়িয়া স্থানান্তরে যাইতে পারিবে; সিপাহিরা তাহাদের কোনরূপ বিঘ্ন জন্মাইতে

পারিবে না। নানাসাহেব প্রথমে এই প্রস্তাবে সম্মত হন। নানাসাহেবের সম্মতি জানিয়া, ইংরেজ মহিলারা প্রসন্ন চিত্তে নৌকায় চড়িবার জন্য আয়োজন করিতে থাকেন। একটী ফিরিঙ্গী-সন্তানের ধাত্রী এই মহিলাদিগের মধ্যে ছিল। ধাই আমাদের দেশের একটী নীচ জাতীয় হিন্দু রমণী। ফিরিঙ্গী সন্তানটীর পিতামাতা উভয়েই পূর্ব্বে হত হইয়াছিলেন, কেবল ছেলেটী হিন্দু রমণীর যত্নে রক্ষা পাইয়াছিল। পিতৃ-মাতৃহীন দুঃখী সন্তান এই দুঃখিনী নারীর দয়ায় এইরূপে জীবন ধারণ করিতেছিল।

সকলে নৌকায় চড়িয়াছে, এমন সময়ে সিপাহিরা হঠাৎ তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। এই আক্রমণে ভীত হইয়া, কেহ কেহ জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িল, কেহ কেহ ডাঙ্গার দিকে দৌড়িতে লাগিল—চারিদিকেই একটা মহা গণ্ডগোল উপস্থিত হইল। সিপাহিরা অসময়ে ইহাদিগকে আক্রমণ করিবে, ইহা কেহই জানিতে পারে নাই; সুতরাং সকলেই সহসা মৃত্যু নিকটে জানিয়া, একবারে দিশাহারা হইয়া পড়িল। সিপাহিরা অনেক বিবি ও বালক বালিকাকে গুলি করিয়া বধ করিল—অনেককে তরবারির আঘাতে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল।

ফিরিঙ্গী সন্তানের প্রতিপালিকা সেই হিন্দু রমণী এই ঘোরতর বিপদ দেখিয়া, ছেলেটীকে কাপড় দিয়া বুকে চাপিয়া রাখিয়া, নৌকায় চড়িবার জন্য যে সিঁড়ি ছিল, সেই সিঁড়ি দিয়া ডাঙ্গার দিকে ছুটিল। তাহার একটী ১৫ বৎসরের পুত্র ছিল, সে মার পিছনে পিছনে যাইতে লাগিল। দুঃখিনী রমণী সিঁড়ি ছাড়িয়া ডাঙ্গায় আসিয়াছে, এমন সময়ে একজন সিপাহি খোলা তরবার হাতে করিয়া, ফিরিঙ্গী ছেলেটীক ধরিবার জন্য অগ্রসর হইল। কিন্তু দয়াবতী রমণী সেই অনাথ সন্তানটীকে নরঘাতক সিপাহির হাতে দিল না। সিপাহি তখন ক্রোধের সহিত কহিল:—

"ছেলেটীকে আমার হাতে দাও। তোমার শরীর অক্ষত থাকিবে।"

দুঃখিনী নারী বিনয়ের সহিত কহিল:—

"আমার ছেলে তোমার হাতে দিব না। ঈশ্বরের করুণা স্মরণ করিয়া আমাদের উভয়কেই দয়া কর।"

সিপাহি পূর্ব্বের ন্যায় সরোষে বলিল:—

"সন্তানটীকে না দিলে দয়ার আশা নাই। এখনি তরবারি দিয়া তোমাকে কাটিয়া ফেলিব।"

দুঃখিনীর পুত্র পশ্চাতে ছিল সে কাতরভাবে কহিল:—

"মা; ছেলেটীকে দিয়া আপনার প্রাণ রক্ষা কর।"

মাতা দৃঢ়তার সহিত বলিল:—"না, তাহা কখনই হইবে না। আমার ছেলেকে কখনই নরঘাতক সিপাহির হাতে দিব না।" এই কথা বলিবামাত্র সিপাহি তাহাকে তরবারি দ্বারা আঘাত করিল। [illegible] ভূমিতে পড়িয়া গেল। [illegible] [illegible]

পাইল। সিপাহি তাহার [illegible] করিল না।

ভেকের পত্র।

বাগান বাজার পুস্তকালয় ও সাধারণ পাঠাগার
সন ১২৯৩ সালে প্রতিষ্ঠিত

১

বড় এক পুকুরের ধারে
[illegible] বাস করে ;
[illegible] ছেলে গুলো খেলা করে
[illegible] রে তা'দের জ্বালায় !
[illegible] ার
[illegible]
[illegible] মনে
[illegible] মোরা প্রাণে ?"
অবশেষে যুক্তি করি', 'মিটিং' করিল ভারি ;
দাঁড়াইয়া ভেকরাজ বলিল তখন
বাম হস্ত করি উত্তোলন।

৩

"সাবধানে শুন বৎসগণ
প্রাণপণে কর 'আন্দোলন' ;
প্রতি গৃহস্থের ঘরে, কাতরে প্রার্থনা ক'রে
সবে মিলে পত্র এক করহ প্রেরণ
'ছেলেদের করিতে বারণ।'

৪

"যদিও মোদের ক্ষুদ্র প্রাণ
সুখ দুঃখ আছে তবু জ্ঞান।
অতএব দয়া ক'রে, ক্ষুদ্র আমোদের তরে
যেন আর সেই খেলা করে না কখন
যাতে ঘটে ভেকের মরণ॥"

সখা। তৃতীয় ভাগ। নবম সংখ্যা।
সেপ্টেম্বর, ১৮৮৫।

বাগান বাজার পুস্তকালয় ও সাধারণ পাঠাগার

আশ্চর্য্য শিক্ষা।

বনের পাখী আপনার মনে উড়িয়া বেড়াইতেছে, তাহাকে ধরিয়া খাঁচায় পুরিতে কাহাকেও পরামর্শ দিই না। কচি শাবক মাতার পাখার নীচে আরামে থাকিয়া দিন দিন বড় হইতেছিল; দুরন্ত বালক তাহা পাড়িয়া আনিয়া বেশ যত্নে রাখিলেও তাহা ভাল কাজ মনে করি না, কিন্তু এমন বন্দী দশাতেও তাহার প্রতি ভাল ব্যবহার করিলে কেমন সুন্দর ফল পাওয়া যায় পাঠক পাঠিকাগণ! তাহার এক দৃষ্টান্ত আজ তোমাদিগকে বলিব।

বিলাতের স্ফটিক প্রাসাদের বিষয় তোমরা 'সখা' ১ম ভাগ, ৮ পৃষ্ঠায় পড়িয়াছ। তথায় অনেক আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য জিনিস থাকে। গত বর্ষের ফেব্রুয়ারি মাসে এই যাদুঘরে একটী পাখী ছিল। উহা মানুষের মত অবিকল শব্দ করিত, হাসিত, কাশিত, হাঁচিত; সময়ে সময়ে নিশ্বাস ফেলিত ও হাই তুলিত। কেবল ইহা নয়। স্পষ্ট মানুষের মত কথা কহিত; কত কথার মানুষের মত উত্তর দিত। ইংরাজীতে "আপনি কেমন আছেন" "কোথায় যাইতেছেন" "দরজাটা দেখ" "তবে আসি" এইরূপ কত বলিত। বিড়াল, কুকুর, ঘোড়া, গাধা কাহারও শব্দ তাহার নিকট ফাঁক যাইবার যো ছিল না। কেহ ডাকিলেই অমনি সে নকল করিত।

এখনো গুণের কথা কিছু বলা হয় নাই। তাহার শিক্ষক যদি বলিতেন "ঘণ্টা বাজাও"; পাখী সময় নষ্ট করিত না, ধীরে আপনার চঞ্চু দিয়া ঘণ্টার দড়ী ধরিয়া নাড়িত; উপরে ঘণ্টার ঢং ঢং শব্দ হইত। ('চ' চিত্র দেখ)। যদি তিনি দরজার কড়া নাড়িতে বলিতেন, সে অমনি এক দ্বারের কড়া ধরিয়া খট্ খট্ করিত। ('গ' চিত্র দেখ)। তাহার এক মণিব্যাগ ছিল; টাকা কড়ি পাইলে তাহা খুলিয়া রাখিয়া দিত। ('ঘ' চিত্র দেখ) [illegible]
অনেক [illegible]
হইয়াছিল। [illegible]
গাড়িতে [illegible]
তাহার [illegible]
নার [illegible]
আর [illegible]
কামা [illegible]
ক্যাপ দিয়া বলিতেন "এক—দুই—তিন, ছোড়" অমনি পাখী ঠোঁটে করিয়া তাহা আওয়াজ করিত। ('ন' চিত্র দেখ)। তাহার নিকট যদি

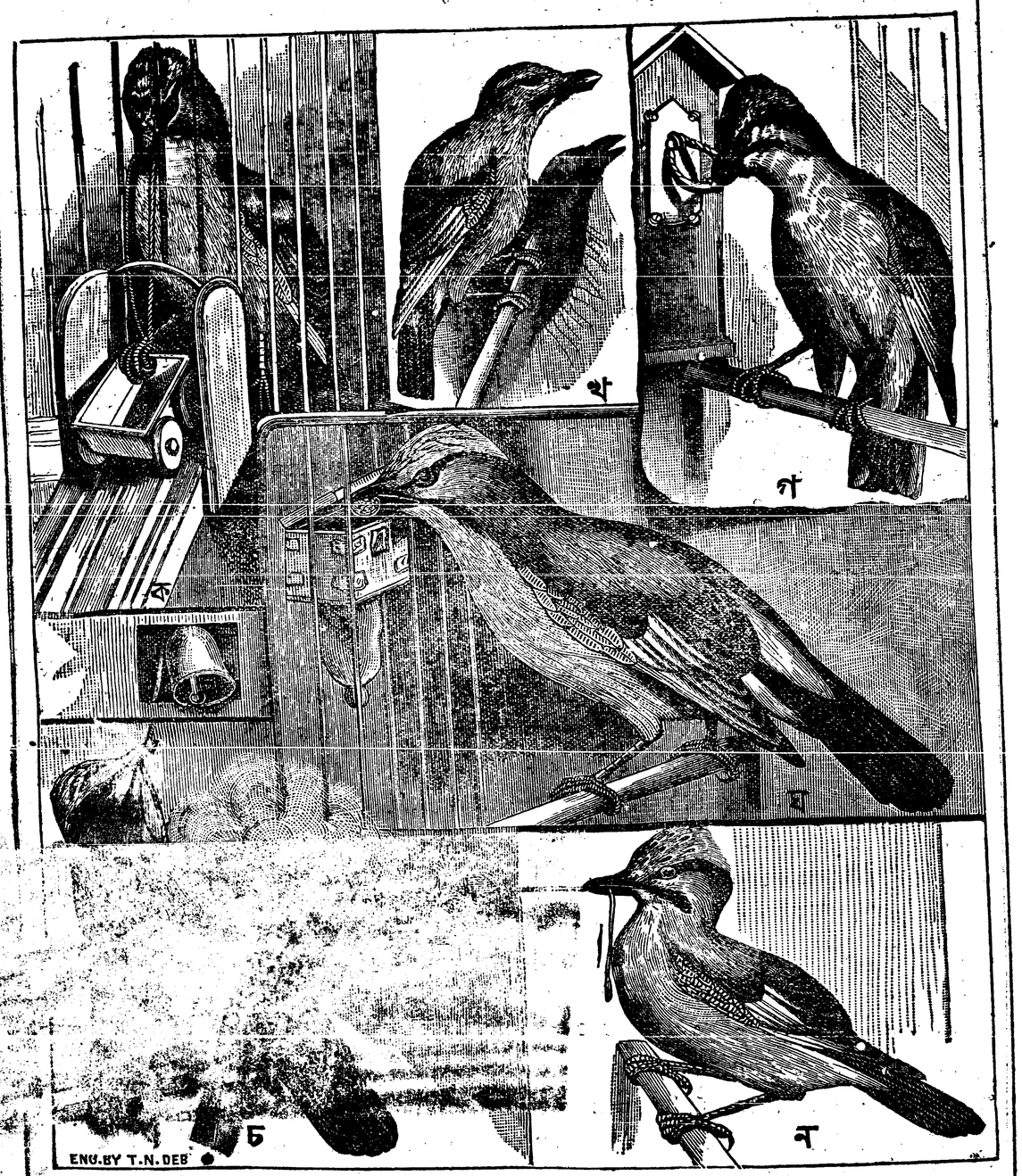

কেহ একটা পত্র ফেলিয়া দিত, তাহা হইলে সে অতি যত্নে কুড়াইয়া লইত। আস্তে আস্তে খুলিত; এবং যেন কতই পড়িতেছে, এই-রূপে কতক্ষণ থাকিত। আবার যদি কেহ তাহার নিকট বলিতেন "কি, তোমার অসুখ হইয়াছে?" অমনি সে কাতর স্বরে বলিত 'বড় অসুখ'; আর রোগীর মত কাশিত, ও মুখ ভার করিয়া বসিয়া থাকিত। ('খ' চিত্র দেখ)। এই আশ্চর্য্য পাখীকে অনেকে দেখিয়াছেন; যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহাদের মুখে ইহার প্রশংসা আর ধরে না। *

সক্রেটিস।

মহাত্মা সক্রেটিসের নাম কি তোমরা ইতিপূর্ব্বে শুনিয়াছ? ৪৬৯ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে অর্থাৎ বর্ত্তমান সময়ের প্রায় ২৩৫৪ বৎসর পূর্ব্বে গ্রীস দেশের এথেন্স নগরে ইহাঁর জন্ম হয়। পূর্ব্বকালে গ্রীস দেশ জ্ঞান চর্চ্চার জন্য বিখ্যাত ছিল। সে সময়ে যতদূর শিক্ষা লাভ সম্ভব সক্রেটিস ততদূর শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া, কালে একজন পরম বিজ্ঞ দার্শনিক পণ্ডিত হইয়া উঠিলেন। তখন গ্রীসে যাঁহারা দর্শন-শাস্ত্রের চর্চ্চা করিতেন তাঁহারা প্রায়ই অহঙ্কারী হইতেন এবং আপনাদিগকে 'জ্ঞানী' বলিয়া পরিচয় দিতেন। সক্রেটিস যেমন পরম জ্ঞানী ছিলেন তেমনি অতিশয় বিনয়ী ছিলেন। জ্ঞানের অভিমান কোন কালে তাঁহার মনে স্থান পায় নাই। দার্শনিক সম্প্রদায়ের অহঙ্কার তাঁহার ভাল লাগিল না। তিনি আপনাকে 'জ্ঞানী' বলিয়া জানাইতেন না। তিনি জ্ঞানকে প্রাণের সহিত ভাল বাসিতেন, কিন্তু আপনাকে জ্ঞানী বলিয়া বিশ্বাস করিতেন না।

সক্রেটিস নূতন প্রণালীতে দর্শনের চর্চ্চা আরম্ভ করিলেন। এখন যেমন কতগুলি লোক আছে, যাহারা দিবারাত্র মুখে বড় বড় কথা বলিয়া বেড়ায়, মুখের জোরে বিদ্যা বুদ্ধি প্রকাশ করিতে চায়, এবং নিজে যাহা না জানে, না বুঝে, পরকে তাহা শিখাইতে যায়; সে কালেও এইরূপ অনেক লোক ছিল। এই সকল লোকের জ্ঞানের স্পর্দ্ধা একটু খাটো করিবার জন্য এবং সাধারণ লোকের নানাবিধ ভ্রমপ্রমাদ সহজে দূর করিবার জন্য, রাস্তায়, বাজারে এবং অন্যান্য প্রকাশ্য স্থানে, ছোট বড় সকলের সহিত সক্রেটিস আলাপ করিতেন; এবং কথায় [illegible] হা-দিগের মতামতের ভুল ধরিয়া [illegible] সকলে আপনাদিগের [illegible] বুঝিতে পারে এ[illegible] জানি[illegible] [illegible] না, বা কোন [illegible] মান লাভের প্রত্যাশায় [illegible]

সক্রেটিস অতি [illegible] লেন। তৎকালে এথেন্সের শাসন[illegible] নি যখন যে অন্যায় কাজ করিতেন তিনি নির্ভয়ে তাহার নিন্দা

* বিলাতের ব্যাণ্ড অব হোপ নামক মাসিক পত্রে ইহার সবিস্তর বর্ণনা আছে।

ও প্রতিবাদ করিতেন। একদা তাহাদের কোন আদেশ নীতি-সঙ্গত বলিয়া মনে না হওয়াতে সে আদেশ পালন করিতে অস্বীকৃত হইলেন।

মহাপুরুষদিগকে অনেক কষ্ট, অনেক অত্যাচার সহ্য করিতে হয়। দেশের সকল লোক যখন পাপ ও কুসংস্কারে অন্ধ হইয়া থাকে, তখন যে সাধু পুরুষ তাহাদিগের চক্ষু ফুটাইতে চাহেন, তাঁহাকে তাহারা শত্রু বলিয়া মনে করে। সক্রেটিসকেও অনেক দুঃখ ও অত্যাচার সহ্য করিতে হইয়াছিল। অবশেষে কতগুলি লোকের মিথ্যা অপবাদে তাঁহার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইল। তাঁহার বন্ধুগণ তাঁহাকে দেশ হইতে পলাইয়া প্রাণ বাঁচাইতে পরামর্শ দিলেন, কিন্তু ইহা তাঁহার নিকট অন্যায় বোধ হওয়াতে তিনি কিছুতেই স্বীকৃত হইলেন না। নির্দ্দিষ্ট দিবসে বিচারকদিগের আজ্ঞানুসারে শিষ্য এবং বন্ধুগণের হাহাকার ও ক্রন্দনের মধ্যে তিনি নির্ভয় মনে, প্রফুল্ল মুখে বিষ পান করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। জ্ঞান, বিনয়, সচ্চরিত্রতা, উদারতা ও ন্যায়পরতার জন্য তাঁহার নাম জগতে প্রাতঃস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে।

[illegible] কথা।

[illegible] যাইতে [illegible] দেখিয়া [illegible] যাহাতে [illegible] এমন করিয়া বেড়াই[illegible] উহা লক্ষ্য করে। ইহা দেখিয়া সক্রে[illegible]লেন "আমি তোমার পোষাকের ঐ [illegible]দ্রের ভিতর দিয়া তোমার অহঙ্কার দেখিতে[illegible]ছি।"

তরুণবয়স্কদিগকে সক্রেটিস একটী অতি সৎপরামর্শ দিয়াছেন। তিনি তাহাদিগকে বলিতেন "তোমরা মাঝে মাঝে দর্পণে আপন আপন মুখ দেখিও। যদি আপনাকে সুন্দর দেখ তাহা হইলে চরিত্রকে সৌন্দর্য্যের অনুরূপ করিতে সর্ব্বক্ষণ চেষ্টা করিবে; যদি দুর্ভাগ্যক্রমে কুৎসিৎ হও, তাহা হইলে সদ্‌গুণের আবরণে কুরূপ ঢাকিয়া রাখিবে।"

সক্রেটিসকে একজন লোক জিজ্ঞাসা করিল, "মহাশয় আপনি গ্রন্থ রচনা করেন না কেন?" বিনয়ী সক্রেটিস বলিলেন "আমি যাহাই লিখিনা কেন, কাগজের মূল্য তদপেক্ষা অনেক অধিক।"

সক্রেটিস সর্ব্বদাই বলিতেন "আমি এইমাত্র জানি যে আমি কিছুই জানিনা।"

সক্রেটিসের মৃত্যুদণ্ডের কথা শুনিয়া তাঁহার পত্নী বলিলেন "হায় অবিচারে (বিনা দোষে) তোমার প্রাণদণ্ড হইল।" সক্রেটিস বলিলেন "যদি দোষ করিয়া উচিত বিচারে আমি প্রাণ হারাইতাম তাহা হইলে কি তুমি সুখী হইতে?"

সরলার জীবনের এক শিক্ষার দিন।

সরলা পিতা মাতার একমাত্র সন্তান; সুতরাং বড় আদরের ধন। কিন্তু এই আদরই তাহার সর্ব্বনাশের মূল। এই আদর পাইয়া সে বড় একগুঁয়ে, স্বার্থপর হইয়াছিল। সে মনে মনে ভাবিত সকলের

ভালবাসার উপর তারই একমাত্র অধিকার। কাহাকেও তাহার অংশীদার দেখিলে তাহার বড় হিংসা হইত। কাহারও কোন কথা তার সহ্য হইত না।

সরলার একটী মাসতুতো বোন্ ছিল। তাহার নাম উষাবালা। সে সরলার চাইতে এক বৎসরের বড়, তাহার বয়স ১২ বৎসর। সে তাহার পিতা মাতার একমাত্র ধন। যখন সে অতি শিশু তখন তাহার পিতার মৃত্যু হয়। এখন আবার তাহার একমাত্র অভিভাবক মাতার মৃত্যু হওয়াতে সে মেস মহাশয়ের আশ্রয়ে আসিয়াছে। উষা বড় বিনয়ী। আর তার মনখানি যেন ভালবাসায় গড়া। উষার মুখে কি যে এক প্রকার সুন্দর ভাবের ছায়া আছে, যাহাতে তাহার মুখ খানিকে অতি সুন্দর দেখায়। তাই তাহাকে যে একবার দেখে সেই বড় ভালবাসে। সরলা এর পূর্ব্বে কখনও উষাকে দেখে নাই। উষার তাদের বাড়ী আসা পর্য্যন্ত তার মাসী মা ও মেস মহাশয় খুব ভালবাসেন। সেই জন্য যদিও সরলার উষাকে খুব ভাল লাগিত ও ভাল মেয়ে বলে ধারণা হইল, তবুও তাহাকে তার পিতা মাতার ভালবাসার অংশীদার দেখিয়া মনে মনে হিংসা হইত। সরলা ভাবিত "আমি বেশ একলা ছিলাম, বাবা মা আমাকেই ভালবাসিতেন, এ আবার এল কেন?" উষা মাসী মা মেস মহাশয়কে তাহার মিষ্ট স্বভাবের দ্বারা বশ করিয়া লইল; কিন্তু সরলা তাহাকে ধরা দিল না বরং উষার সহিত ঝগড়া করিবার জন্য সুযোগের অপেক্ষা করিতে লাগিল। ক্রমে সরলার পিতা উষাকে স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। প্রথম প্রথম অভ্যাস না থাকাতে সে যাইতে চায় নাই। দুদিন যাইতে না যাইতে সকল মেয়ের সঙ্গে তার ভাব হইল, সকলে তাকে ভালবাসিতে লাগিল। সরলাদের স্কুলে একটী সেলাইএর পরীক্ষা হইত। যে সকলের চেয়ে সুন্দর সেলাই করিতে পারিত সেই পুরস্কার পাইত। সরলা বেশ সেলাই করিতে পারিত। সরলা, উষা সকলেই পুরস্কার পাইবার জন্য সেলাই করিতে আরম্ভ করিল। সরলা এক অতি সুন্দর আসন তৈয়ার করিয়াছে। সেলাইটী দিবার এক দিন পূর্ব্বে টেবিলের উপর সেলাইটী রাখিয়া সরলা কি করিতেছে, এমন সময় উষা যেমন একখানা কাঁচি লইবার জন্য হাত বাড়াইয়াছে অমনি কাছে এক দোয়াত কালি ছিল, উল্টিয়া সেলায়ের উপরে পড়িয়া গেল। পড়িয়া যাবা মাত্র উষা বলিয়া উঠিল "হায়! হায়! কি করিলাম! আহা! সরলা, ভাই আমি অতি অন্যায় কাজ করিয়াছি। ছিঃ! আমি এত অসাবধান! আমি এখন কি করি! আহা যা করিলে ভাল করিয়া দিতে পারি আমি তাই করিব।" সরলা এই কথা শুনিয়া ফিরিয়া দেখিবা মাত্র রাগে তাহার শরীর জ্বলিয়া উঠিল। সে লাফাইয়া উঠিয়া হাতদুখানি ঝাঁকড়াইতে ঝাঁকড়াইতে চীৎকার করিয়া বলিল "ও হতভাগী হিংসুকে মেয়ে! কি করিলে! তুমি নিশ্চয়ই ইচ্ছা করিয়া কালি ঢালিয়াছ, পাছে আমি [illegible] আবার মিথ্যা কথা। [illegible] পেটে দুষ্টামি। [illegible] এইবারে [illegible] বক ধা[illegible] "ভাই সত্য [illegible] এবং বকুনি খ[illegible] ইচ্ছা করিয়া [illegible]?"

এই কথা শুনিয়া সরলা রাগিয়া বলিল "তুমি আমাদের বাড়ী হতে দূর হও। তোমার মুখ

দেখ্‌তে চাই না।” উষা কাঁদিতে কাঁদিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। উষা গেলে সরলা চেয়ারে বসিয়া মুখে কাপড় দিয়া খুব কাঁদিতে লাগিল। এমন সময় কে আস্তে আস্তে [illegible] হইয়া [illegible] ভূপেন্দ্র [illegible] এক [illegible] ফেলিয়া [illegible] “ও [illegible] কে [illegible] কাঁদিতে [illegible] দাদা, উষা [illegible] করিয়া আমার সেলাইয়ে কালি ঢালিয়া দিয়াছে।”—

ভূপেন্দ্র “দূর! একি হতে পারে। না দেখে ফেলে দিয়াছে। সে যে অতি ভাল মেয়ে।—যাঃ! আর কি হবে! তোরা না বলেছিলি আমার সঙ্গে সেই বাগানটা দেখ্‌তে যাবি।—এখন ওঠ, যা মুখ ধুয়ে কাপড় চোপড় পরে আয়।” তার পর ওদের দুই বোনকে নিয়ে ভূপেন্দ্র বেড়াইতে গেলেন। এখনও সরলার উষার উপর ভয়ানক রাগ আছে; সে তাহার দিকে ফিরেও চাহিতেছে না।—সেখানে গিয়া হঠাৎ কি মনে হওয়াতে ভূপেন্দ্র বাড়ীতে ছুটিয়া গেলেন। যাবার সময় উষা সেখানে ছিল না, সে কি দেখিবার জন্য কোথায় গিয়াছিল। তাই ভূপেন্দ্র সরলাকে বলিয়া গেলেন “দেখ সরো ওদিকে যেও না আর উষাকে যেতে বারণ করো; ওদিকে একটা ভয়ানক সাপ্‌ আছে।” পরে সরলা উষাকে সেই দিকে যাইতে দেখিয়াও রাগে কোন কথা বলিল না। উষা সেই দিকে যাইতে যাইতে হঠাৎ সাপ্‌টার লেজ মাড়ানতে সাপ্‌ ফোঁস্‌ করিয়া উঠিল। উষা তাহা টের পাইয়াই ছুটিতে লাগিল, সাপটাও তার পিছন পিছন তাড়া করিল। শেষে উষা আর পারিয়া উঠিল না, সাপ্‌টা তাহাকে আক্রমণ করিল।—অমনি “ওগো মাগো” বলিয়া মাটিতে পড়িয়া গোঙ্গাইতে লাগিল। সাপ্‌টা আপনার কাজ করিয়া গর্ত্তে ফিরিয়া গেল। সরলা এই দৃশ্য দেখিয়া অবাক্‌ হইয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহাকে উঠায় এমন কেহ নাই। ভূপেন্দ্র আসিয়াই সকল বুঝিতে পারিলেন, ও ছুটিয়া গিয়া দেখেন উষার মুখ দিয়া ফেণা উঠিতেছে। চেতনা নাই। কাছেই বাড়ী ছিল, তাহাকে কোলে করিয়া বাড়ী লইয়া গেলেন। ডাক্তার আসিয়া ঔষধ দিলেন, কিন্তু সবই বৃথা। সরলাকে সে ঘরের ভিতর যাইতে দেওয়া হয় নাই। সে একলাটী বসিয়া আপনার দোষের জন্য কাঁদিতে লাগিল। সে ভাবিতে লাগিল “যদি উষা দিদি মারা যায়, তা হলে—আমিই মারিলাম।” অনেকক্ষণ বসিয়া বসিয়া কাঁদিতেছে এমন সময় ঘরের ভিতর হঠাৎ সকলের কান্না শুনিতে পাইল। ঘরের ভিতর ছুটিয়া গিয়া দেখে উষা দিদি চির জীবনের মত তাহাদের ছাড়িয়া পলাইয়াছে। ভূপেন দাদা অস্থির হইয়া কাঁদিতেছেন। মা বাবা সকলেই কাঁদিতেছেন দেখিয়াই সরলা ছুটিয়া গিয়া উষার মুখের উপর পড়িয়া ভয়ানক কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল “উষা দিদি! কাঁদাইয়া বিদায় দিলাম। উষা দিদি আমায় ক্ষমা কর। ক্ষমা কর।” সেই দিন রাত্রেই সরলার অত্যন্ত জ্বর আসিল। সেই অসুখে অনেক দিন ভুগিয়াছিল। যখন সারিয়া উঠিল তখন সে আর সে সরলা নয়, একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে। উষা দিদি তাহাকে নবজীবন দিয়া গিয়াছিল।—পাঠক পাঠিকাগণ! উষা কি তোমাদিগকেও নবজীবন দিল?

পিপীলিকা।

তোমরা সকলেই লাল, কাল—ছোট, বড় অনেক প্রকারের পিপীলিকা সচরাচর দেখিয়া থাক। ইহাদের মধ্যে এক এক প্রকারের পিপীলিকা এক এক রকম স্থানে নিজেদের বাসা নির্ম্মাণ করে। কোন প্রকার মাটির নীচে গর্ত্ত করিয়া তন্মধ্যে বাড়ী করে এবং উপরে মাটির ঢিবি করিয়া রাখে, কোন প্রকার পুরাণ কাষ্ঠ খণ্ডের ভিতর গর্ত্ত করিয়া বাস করে, কোন প্রকার গাছের উপর বাসা নির্ম্মাণ করে, কোন প্রকার টুক্‌রা টুক্‌রা কাটকুটো একত্র [illegible] করে; পিপীলি[illegible] বাসা নির্ম্মাণ করিতে [illegible] পিপীলি[illegible]

[illegible] দেখ)।

এবং ক্লীব (‘গ’ চিত্র দেখ)। পুরুষ ও স্ত্রীর সংখ্যা অতি কম; এবং ক্লীবের সংখ্যা পুরুষ ও স্ত্রীর

সংখ্যা অপেক্ষা প্রায় দশগুণ বেশী। এই ক্লীব জাতীয় পিপীলিকারাই সমুদয় কাজ কর্ম্ম করে। পুরুষ এবং স্ত্রী জাতীয়দের কোন কোন সময়ে পাখা উঠে।

ইহাদের মাটির নীচের গৃহ নির্ম্মাণ কৌশল অতি চমৎকার। মাটির নীচে ছোট ছোট সহরের ন্যায় পিপীলিকারা বাড়ী তৈয়ার করে। এই বাড়ী পরিষ্কার করিবার জন্য মেথর-পিপীলিকা আছে, তাহারা ময়লা দেখিতে পাইলেই টানিয়া বাহিরে ফেলিয়া দিয়া আইসে। শান্তি রক্ষার জন্য পাহারাওয়ালা আছে, সর্ব্বদাই একজন না একজন সদর দরজায় পাহারা দেয়; কোন বিপদের আশঙ্কা দেখিলেই অমনি ভিতরে খবর দেয়, আর দলে দলে যোদ্ধাগণ বাহিরে আসিয়া আক্রমণকারীদিগের সহিত যুদ্ধ করে। গৃহটী প্রায়ই দোতালা করে; প্রত্যেক তালায় অনেক গুলি ঘর আছে। কোন ঘরে ডিম গুলি সুন্দর সুশৃঙ্খল ভাবে সাজান থাকে, কোন ঘরে দাস দাসীরা ছোট ছোট পিপীলিকা-সন্তানদের সেবা শুশ্রূষা করে, কোন কোন ঘরে কেবল মাত্র খাবার রাখে—এক এক ঘরে এক এক রকম খাবার [illegible]

[illegible] ইহাদের বড়ই মায়া। [illegible] পিপীলিকারাই সমুদয় [illegible] সাজাইয়া [illegible] দিগকে [illegible] করে, খাবার [illegible] দিয়াও [illegible]। সন্ধ্যার পূর্ব্বে উপরের তালা হইতে নীচের তালায় সমুদয়গুলিকে লইয়া যায়; এবং দরজা বন্ধ করিয়া দেয়। এরূপ করার উদ্দেশ্য এই যে, রাত্রির ঠাণ্ডা বাতাসে উপরে রাখিলে ডিম ও পিপীলিকা-শিশুদের অপকার হইবার সম্ভাবনা। আবার প্রাতঃকাল হইলে ডিম, সন্তান সন্ততি সমুদয়-গুলিকে উপরের তালায় লইয়া আসে। ইহাদিগকে সুখে রাখিবার জন্য এইরূপ প্রত্যহই করে। রৌদ্রের উত্তাপে শরীর ভাল থাকে বলিয়াই দিনের বেলায় উপরের তালায় রাখে। দিনের বেলায় বৃষ্টি বা ঠাণ্ডা বাতাস বহিলেও উপরের তালা হইতে উহাদিগকে নীচের তালায় লইয়া যায়। সর্ব্বদাই একদল পিপীলিকা ইহাই করিতেছে। এবং আর একদল খাদ্যের অন্বেষণে বাহিরে বাহিরে ভ্রমণ করে। খাবার পেলেই ঘরে লইয়া আসে।

কোন কোন গাছে এক রকম পোকা বাস করে; ইহাদের শরীর হইতে একরূপ রস নির্গত হয়। এই রস ছোট ছোট পিপীলিকা-সন্তানেরা বড়ই ভালবাসে এবং ইহা খাইলে তাহাদের উপকারও যথেষ্ট হয়। ক্লীব পিপীলিকা দলে দলে গিয়া এই রস মুখে করিয়া লইয়া আসে; কখন কখনও একদল এই পোকাকে টানিতে টানিতে বাটীতে আনিয়া রাখিয়া দেয়। আমরা যেমন ছেলে পিলের দুগ্ধের জন্য গরু পুসি ইহারাও সেইরূপ ইহাদিগকে পোষে। দেখ কেমন বুদ্ধি!

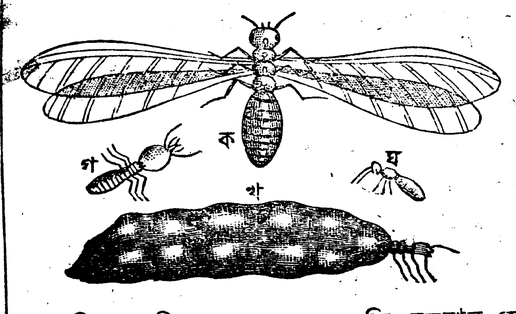

ক্লীব জাতীয়দের মধ্যে যে গুলি বলবান সেই গুলি যুদ্ধের কাজ করে ('গ' চিত্র দেখ); অবশিষ্ট গুলি অন্যান্য সমুদয় কাজ করে ('ঘ' চিত্র দেখ)। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে পুরুষ ও স্ত্রীদের কোন কোন সময়ে পাখা উঠে; এই পাখা উঠার পর দলে দলে স্ত্রী পুরুষ পিপীলিকা গর্ত্ত হইতে বাহির হয়, এবং স্ত্রী পিপীলিকারা ডিম প্রসব করে, প্রসব করার পর পাখা ফেলিয়া দেয়; ইহার পর কিরূপ আকৃতি হয় ('খ' চিত্র) দেখ। পুরুষগুলির পাখা হইলে কিরূপ চেহারা হয় তাহা ('ক' চিত্র) দেখ।

একতা ইহাদের মধ্যে যথেষ্ট আছে। কোন একটা ভারী দ্রব্য একটী পিপীলিকা টানিয়া লইয়া যাইতে না পারিলে বাসায় গিয়া খবর দেয় আর দু দশ জন তার সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া সেই জিনিসটাকে লইয়া যায়। কেহ কোন একটা জিনিস পাইলে নিজে কেবল খায় না; বাসায় লইয়া যাইয়া ঘরে জমা করিয়া রাখে, শেষে সমান ভাগ করিয়া খায়। কোন একটা বিপদ আপদে পড়িলে আর দশজনে তৎক্ষণাৎ আসিয়া সাহায্য করে। কোন একটার পীড়া হইলে বা কোন প্রকার আঘাত লাগিলে আর দশজনে আসিয়া শুশ্রূষা করে।

ইহারা আবার কখনও দলবল লইয়া যুদ্ধে বাহির হয়। অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র জাতীয় অন্য এক প্রকারের পিপীলিকাদের বাসায় গিয়া আক্রমণ করে। যুদ্ধে জিতিতে পারিলে তাহাদের সন্তান সন্ততি সমুদয় ঘাড়ে করিয়া নিজেদের বাসায় লইয়া আসে; এবং যত্নের সহিত আদর করে। শেষে তাহারা ভাল বাসার গুণে নিজেদের দাসত্ব ভুলিয়া গিয়া সকলকেই আপন বিবেচনা করে এবং সন্তুষ্ট চিত্তে সমুদয় কাজ কর্ম্ম করিয়া গৃহের সুশৃঙ্খলা রাখে।

পিপীলিকার কাজে লাগিয়া থাকিবার ইচ্ছাটা বড়ই প্রবল। যতক্ষণ পর্য্যন্ত কোন একটা খাদ্য দ্রব্য টানিয়া স্বীয় গর্ত্তে লইয়া না যাইতে পারে ততক্ষণ সুস্থির হয় না, কেবলি কাজ করিতেছে। অবশেষে গর্ত্তে নিয়া সুস্থির হয়। পরিশ্রম করিতে ইহারা কখনই কাতর হয় না। শীতকালে ইহারা কোন কাজ করে না; বাসায় বসিয়া কেবল ঘুমায়। অন্যান্য সময়ে পরিশ্রম করিয়া এত খাদ্য সঞ্চয় করে যে খাদ্যের অভাবে শীতকালে তাহাদের কোন কষ্টই হয় না।

এই ক্ষুদ্র প্রাণী হইতে আমরা এই উপদেশ প্রাপ্ত হই।—(১) সর্ব্বদা পরিশ্রম করা উচিত; ইহারা যেমন গ্রীষ্মকালে পরিশ্রম করিয়া শীতকালের খাদ্য সঞ্চয় করে, আমাদেরও সেইরূপ ছেলেবেলায় পরিশ্রম করিয়া বিদ্যা উপার্জন করা উচিত যে, যৌবনকালে বিদ্যার বলে অর্থ উপার্জন করিয়া বৃদ্ধ বয়সের জন্য কিছু সঞ্চয় করিতে পারি। (২) অধ্যবসায়ী হওয়া উচিত; একটা কাজে একবারে কৃতকার্য্য না হইলে বার বার চেষ্টা করিতে হইবে। (৩) শত্রুদিগকে ভালবাসা দ্বারা বশীভূত করা উচিত; ভালবাসার দ্বারা যেমন অপরকে বশীভূত করা যায়, কর্কশ ব্যবহার বা শাসন দ্বারা সেইরূপ করা যায় না। (৪) সকলেরই মধ্যে একতা থাকা উচিত। একজনে একটা [illegible] যায়। বৃহৎ কোন [illegible] দশজনের সাহায্য [illegible]

কালার ঘরে ধলা ছেলে।

(ডেনমার্ক দেশীয় একটী গল্প অবলম্বনে লিখিত)

সহরের অনেক দূরে একখানি গ্রাম আছে। ঐ গ্রামের এক পাশে একজন চাষা বাস করে। সে কতকগুলি পাতি হাঁস পুষিয়াছে। খিড়কীর পুকুর ধারে আমতলায় হাঁসদের থাকিবার জন্য এক যায়গা করিয়া দিয়াছে। হাঁসগুলি খায় দায় খেলিয়া বেড়ায়, রাত্রি হইলে আমতলায় নিজেদের ঘরে আসিয়া ঘুমাইয়া থাকে। একবার বর্ষাকাল, আষাঢ় কি শ্রাবণ মাস হইবে, একটী পাতি হংসী ডিম পাড়িয়াছে। অনেক ডিম পাড়িয়াছিল, তাহার সকল গুলিতে তা দেয় নাই কেবল মাত্র ৬টীতে তা দিতেছে। বেচারির কি কষ্ট! আষাঢ়ান্ত বেলা—দিন গিয়াও যায় না; বেচারি দিন নাই রাত্রি নাই, বসিয়াই আছে। একা নির্জ্জনে বসিয়া থাকা কি কষ্ট সকলেই বুঝিতে পার। তাহার স্বামী পাতি হংস হাজার হোক পুরুষ, সে আপনার মনে আর দশজন হংস হংসীর সহিত পুকুরে [illegible] খেলিয়া বেড়াইতেছে, ভাত [illegible] "প্যাঁক [illegible]" [illegible] হইতেছে সে [illegible] কেবল দিনের মধ্যে [illegible] আসিয়া দুটো মিষ্ট কথা বলিয়া যাইতেছে।

কিছুদিন পরে পাতিহংসী বলিল;—"আর বাপু পারি না—দেখি দেখি হতভাগা গুলোর বাহির হইবার সময় হলো কি না?" এই বলিয়া দেখে যে সময় হইয়াছে, একটী ডিমের মুখ ভাঙ্গিবামাত্র একটী হাঁস মুখ বাড়াইল। এইরূপে ছেলে মেয়েতে পাঁচটা বাহির হইল। তখন তাহাদের শিক্ষার ভাবনা পড়িল। তারা বলে "পীঁ" "পীঁ" মা বলে "প্যাঁক" "প্যাঁক"—এইরূপে ডাকিতে শিখাইতে লাগিল। কিন্তু একটী ডিম আর ফোটে না। এমন সময়ে এক প্রতিবেশিনী হংসী একদিন বেড়াইতে আসিয়া বলিল;—"কিগো সই, তোমার ডিমে তা দেওয়া কি ঘুচ্‌বে না?" পাতি হংসী বলিল;—"আর বোন্! নিগ্রহের কথা বল কেন? একটা কাল শত্রু আর বাহিরে আস্‌তে চায় না। আমিও আর পারি না।" সমাগত হংসী বলিল "দেখি দোখ ডিমে তা দিতে ত এত দিন লাগে না।" দেখিয়া সবিস্ময়ে বলিল—"ওমা একি! এত বড় ডিমত কারুর দেখি নাই। এ ভাই তোর ডিম নয়।" শুনিয়া পাতি হংসীর মনে বড় চিন্তা হইল। "তাইত আমিও ভাব্‌ছিলাম এ কি? এতদিন লাগে কেন?" সমাগত হংসী বলিল "দেখ ভাই আমাকে কিনিয়া আনিবার পূর্ব্বে আমি কলিকাতায় এক জজের বাড়ীতে ছিলাম, সেখানে আমাদের সঙ্গে কয়জন পেরু থাকিত—তাহারা [illegible] বড় বড় ডিম পাড়ে, আমার বোধ হয় এ পেরুর ডিম।" হংসী বলিল "যাহা হোক্ এত দিন গেছে না হয় আরও দুই দিন যাবে; দেখি কেমন ছেলে বাহির হয়—জলে লইয়া গেলেই পেরু কি না ধরা পড়িবে।" প্রতিবেশিনী চলিয়া গেল—হংসী বসিয়া বিষণ্ন মনে তা দিতে লাগিল। ক্রমে এক প্রকাণ্ড পুরুষ হংস বাহির হইল। পাতি হাঁসের ঘরে এত বড় ছেলে কেউ কখনও দেখে নাই। হংসী দেখিয়া মনে মনে

বলিল—"পোড়া কপাল! কি একটা কদাকার প্রকাণ্ড ছেলে হইল। একে লোক-সমাজে লইয়া যাওয়াও লজ্জা!" যাহা হউক মনের ভাব মনে গোপন করিয়া হংসী কয়েক দিনের মধ্যেই ছেলে মেয়েগুলিকে সঙ্গে লইয়া পুকুরের দিকে গমন করিল; মনের অভিপ্রায়, পুকুরে তাহাদিগকে সাঁতার শিখাইয়া পাড়া পড়্‌সীর নিকট লইয়া যাইবে। হংসী ছানাগুলিকে একত্র করিয়া বলিল "দেখ এইবার তোমাদিগকে জলে লইয়া যাইব, জল দেখিয়া ভয় পাইও না, সাঁতার দেওয়া আমাদের জাতির স্বধর্ম্ম; প্রথমে নামিবা মাত্র তোমরা ডুবিয়া যাইবে তখন ভয় পাইও না, তৎক্ষণাৎ আবার ভাসিয়া উঠিবে; ও তখন আমার দিকে দেখিও, আমি যেমন করিয়া পা নাড়ি তেমনি করিয়া পা নাড়িবে, তাহা হইলে সাঁতার দিতে পারিবে। সেখানে তোমাদের বাবা সাঁতার দিয়া বেড়াইতেছেন, দেখিতে পাইবে।" ছানাগুলি "পীঁ" "পীঁ" করিয়া সে কথায় সায় দিল। কিন্তু কদাকার ছেলেটীর বড় নিগ্রহ! এমন কি তাহার ভাই ভগিনীরা তাহাকে নড়িতে চড়িতে তামাসা করে। কেহ বলে "মরণ আর কি, হাঁটিবার ধরণ দেখ।" কেহ বলে "রাম রাম সে দিনের ছেলে, শরীরটা দেখ! যেন একটা বুড়ো।" কেহ বলে "তুই আমাদের সঙ্গে আসিস্ নে।" এই বলিয়া দুই তিন জনে তাহার ঘাড় কামড়াইয়া মাটিতে তাহার মুখ ঘষিয়া দেয়। মা ফিরিয়া "প্যাঁক" "প্যাঁক" স্বরে তিরস্কার করেন। বলেন "আহা ষেঠের বাছা যদি হয়েছে ত বেঁচে থাক্, তোরা কেন ওরে মারিস্।" কদাকার ছানাটী বিষণ্ণ ভাবে সকলের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। পুকুরের কাছে গিয়া হংসী লম্ফ দিয়া জলে পড়িল, ছানাগুলি দেখাদেখি যেই লম্ফ দিল, অমনি তলাইয়া গেল; ভয়ে ওলট পালট খাইয়া আবার ভাসিয়া উঠিল। তখন মায়ের উপদেশ মত সাঁতার দিতে লাগিল। হংসী দেখে কদাকার ছেলেটীও বেশ সাঁতার দিতেছে, তখন দুশ্চিন্তা দূর হইল। ভাবিল "বাঁচ্‌লাম। আহা আমার বাছা পেরু হতে গেল কেন?" তখন হাঁসেরা ভাত খাইতে গিয়াছিল; হংসীর আর দেরি সয় না; এমন সব সুসন্তান তাহাদিগকে লোক-সমাজে পরিচিত করিয়া না দিলে মন তৃপ্ত হয় না। পুষ্করিণী হইতে পাড়ে বসিয়া ডানা ঝাড়িয়া ছানাদিগকে ডানা ঝাড়িতে শিখাইল; বলিল: "সাবধান! লোক-সমাজে যাইতেছ অসভ্যতা করিও না, গুরুজনদিগকে পা দেখাইও না, অকারণ "পীঁ" "পীঁ" করিও না। আর সেখানে একজন বড়লোকের স্ত্রীকে দেখিবে, তাঁহার পায়ে রাঙ্গা সূতা বাঁধা, তিনি বড় ঘরের মেয়ে, তাহার দাম অনেক, পাছে হারাইয়া যান বলিয়া গৃহস্থ পায়ে সূতা বাঁধিয়া দিয়াছে! তাঁহার কাছে গিয়া সভ্য ভব্য হইয়া থাকিবে।" এইরূপ অনেক উপদেশ দিয়া শাবক সঙ্গে গৃহস্থের বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইল। অমনি হাঁসেরা সকলে আসিয়া ছেলেদিগকে আদর করিতে লাগিল। কেহ বলে "আ[illegible]! কি সুন্দর ছেলেগুলি!" কেহ বলে [illegible] কেহ বলে "আহা বেঁচে থাক।" কিন্তু কদাকার ছানাটীকে দে[illegible] করিতে লা[illegible] এমন কদাকা[illegible] সূতা বাঁধা হ[illegible] লজ্জা করিলে [illegible] গো অমুকের মা, ও ছেলেটা কি তোমার?" "হাঁ দিদি কপাল ক্রমে ওই একটা কদাকার ছেলে হয়েছে কি

করি।” লাল সূতা বাঁধা হংসী বলিল—“ছি! এমন কদাকার ছেলে লইয়া তোমার লোক-সমাজে আসা উচিত হয় নাই, ঘরে রাখিয়া আসিতে পার নাই? সে বলিল:—“আর দিদি আমি গরিব আমার ছেলে দেখে কে? বিশেষতঃ ওদের বিড়ালটা বড় দুষ্ট।” লাল সূতা বাঁধা হংসী বলিল—“তা বলিলে কি হয়, আর আমার কাছে ওকে আনিও না।” এই বলিয়া একেবারে দৌড়িয়া আসিয়া তাহার ঘাড় কামড়াইয়া মাটিতে তাহার মুখ ঘষিয়া দিল। মা বেচারি কি করে, বড়লোকের স্ত্রীকে কিছু বলিতে পারে না, কাজেই সহ্য করিতে হইল।

কদাকার ছানাটী এইরূপ যার তার নিকট অপমান গঞ্জনা আর সহিতে না পারিয়া মনের দুঃখে গ্রামের পার্শ্ববর্ত্তী এক খড়িবনের ভিতর চলিয়া গেল। মনে মনে ভাবিল লোকালয়ে থাকিয়া গঞ্জনা সহ্য করা অপেক্ষা বনবাসী হওয়াই ভাল। সেখানে গিয়া কতকগুলি বাইল-হাঁসের সহিত তাহার আলাপ হইল। সে আপনার দুঃখের কাহিনী সমুদায় বলিল;—তাহারা মনে মনে বলিল “যে কদাকার! গঞ্জনা দিবেই ত।” যাহা হউক [illegible] অনুরোধে মনের [illegible] মনে [illegible] বলিল “আচ্ছা যদি তোমাদের [illegible] হইয়াছে তবে এই বনে থাক, চরিয়া বেড়াও [illegible] [illegible]দ্রতা [illegible]

একদিন কদাকার হংস খড়িবনে নির্ভয় মনে পাতাড়ির কচি কচি ডাঁটা খাইয়া বেড়াইতেছে, এমন সময়েও কি শব্দ! বন্দুকের আওয়াজ! বেচারা জীবনে ওরূপ ধ্বনি কখন শুনে নাই। শুনিয়াইত হৃৎকম্প উপস্থিত! ভাবিবার সময় না পাইতে পাইতে বাইল হাঁসের ঝাঁক উড়িয়াছে; আবার আওয়াজ, এক নিমেষের মধ্যে একটী রক্তাক্ত হাঁস তাহার সন্নিকটে খড়িবনে মরিয়া পড়িল। কদাকার হংস ভয়ে সরিতে সরিতে খড়িবনে অদৃশ্য হইয়া গেল। শেষে মনে করিল “এখানে থাকাতে বিপদ আছে; দূর হোক এ দেশটা ছাড়িয়া যাই।” খড়িবন হইতে উঠিয়া সন্ধ্যাকালে আর এক দিকে যাইবার জন্য যাত্রা করিল। পথে ভয়ানক ঝড় বৃষ্টি, ডানা ছিঁড়িয়া যায়, মুখ থুবড়িয়া পড়ে, আর চলিতে পারে না। অবশেষে এক বুড়ীর আগড়ের পাশ দিয়া তাহার ঘরে ঢুকিল এবং ভয়ে জড়সড় হইয়া এক কোণে গিয়া এক তক্তার আড়ালে লুকাইয়া রহিল। রাত্রিটা কাটিয়া গেল। সে বুড়ীর সংসারে কেহ নাই কেবল এক পোষা শালিক পাখী আছে, সে মানুষের মত কথা কয়; আর একটী পোষা বিড়াল সে পাখী ধরে না। এই দুইটী বুড়ীর ঘরে রাজত্ব করে। সকালবেলা শালিকটী বকিতে বকিতে কোণের দিকে আসিয়া কদাকার হংসকে দেখিতে পাইয়া অবাক্ হইয়া গেল। তখন সে বিড়াল মহাশয়কে ডাকিয়া আনিল, এবং দুইজনে মিলিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দিবার [illegible] করিল। যখন তাহারা তাড়াইবার [illegible] বুড়ী [illegible] হইয়া হংস দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইল, আপনার সহচরদিগকে নিষেধ করিয়া বলিল “তাড়াস্‌নে, থাক্, ডিম দিবে”। বিড়াল ও শালিক অগত্যা সে প্রস্তাবে সম্মত হইল; কিন্তু হংসের উপরে অপ্রসন্ন থাকিয়া গেল।

এখানে আসিয়া কদাকার হংসের বড় বিপদ

হইল। সে বাহির হইয়া যাইতে পারে না। বুড়ী বাহির হইবার সময় তাহাকে বন্ধ করিয়া যায়, ঘরে থাকিবার সময় চোখে চোখে রাখে। বিশেষ বুড়ীর বাড়ী হইতে পুকুর অনেক দূর, বুড়ী সেখানে তাহাকে যাইতে দেয় না। বেচারা কি করে অধিকাংশ সময় ঘরের কোণে কাটায়। এবং বড় বিষণ্ণ থাকে। একদিন শালিক তাহার নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল “আচ্ছা তুমি এত বিষণ্ণ থাক কেন?” কদাকার হংস বলিল “ভাই একটু জলে বেড়াইতে পারিনা, মনটা বড় কেমন করে।” শালিক বলিল—“কি, পাগলের মত কথা কও, পাখী কি আবার জলে বেড়ায়” হংস—“হাঁ ভাই আমাদের জাত জলে বেড়ায়।” শালিক—“ঐ জন্যই ত আমরা তোমাকে ঘৃণা করি। আচ্ছা আমাদের বিড়াল একজন বহুদর্শী ও পরম জ্ঞানী লোক তাহাকে ডাকিয়া আনি, জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ সে জলে বেড়ায় কি না, কিম্বা কাহাকেও বেড়াইতে শুনিয়াছে কি না। যে কথা নয় তাহা বল কেন? তোমার কোন যোগ্যতা নাই লাভের মধ্যে মিথ্যা কথা কও। তুমি না ডিম পাড়িতে পার, না মানুষের মত কথা বলিতে পার, না উনুন কাধাঁয় শুইয়া বিড়ালের ন্যায় ঘোঁড় ঘোঁড় করিতে পার। ইহার উপরে আবার মিথ্যা কথা কও।” এই বলিয়া শালিক বিড়ালকে ডাকিয়া আনিল। বিড়াল বলিল—“একি কথা! পাখী কি জলে যায়? ও কথা শুনিতে নাই!” সে দিন হইতে সে তাহাদের বিশেষ অপ্রিয় হইল। বুড়ীও দেখিল বহু দিন গেল তবু ডিম দেয় না, শেষে তাহাকে তাড়াইয়া দিল। শালিক ও বিড়াল বাঁচিল।

কদাকার হংস তাড়া খাইয়া পথে বাহির হইয়া কিয়দ্দূর গিয়াছে, এমন সময় গ্রামের একদল ছেলে তাহাকে দেখিবা মাত্র বলিয়া উঠিল “ওরে ভাই বাবুদের হাঁস কি করে আসিয়া পড়িয়াছে, চল ধরে দিয়ে আসি, বক্‌সিস্ পাইব।” এই বলিয়া পাঁচ সাত জন ছেলেতে তাড়াতাড়ি করিয়া তাহাকে ধরিল ও জমিদার বাবুদের বাড়ীতে লইয়া গেল। বাবুদের বাগানে এক পাল রাজহংস চরিতেছিল, তাহাদিগকে দেখিবা মাত্র কদাকার হংসের প্রাণটা কেমন কেমন করিতে লাগিল। বাবুরা বালকদিগকে বক্‌সিস্ দিয়া তাহাকে হাঁসের পালে ছাড়িয়া দিতে বলিলেন। যেই তাহাকে হাঁসের পালে ছাড়িয়া দেওয়া হইল; অমনি রাজহংসগণ গলা লম্বা করিয়া আনন্দধ্বনি পূর্ব্বক তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া লইল। কেহ বলিল “আহা এমন সুপুরুষ কোথা হইতে আসিল।” কদাকার হংস নিজের আদর দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইল এবং মনে মনে কত তর্ক বিতর্ক করিতে লাগিল। অবশেষে তাহাদের সঙ্গে পুকুরের জলে গিয়া নির্ম্মল জলে আপনার প্রতিবিম্ব দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিল—“বাঃ আমিও যে রাজহংস।” সে পাতি হাঁসদিগের গঞ্জনা ভুলিয়া গিয়া আনন্দে বিচরণ করিয়া বেড়াইতে লাগিল। যথাসময়ে একটী রাজহংসীর সহিত তাহার বিবাহ হইল। পরে [illegible] একটী দুষ্ট বালক একটী রাজহংসের [illegible] ঐ চাষার পাতি হাঁসের বাসা [illegible]য়া আনিয়াছিল।

উপদেশ;—গুণের আদর গুণী লোকেই করিয়া থাকে।

(এক সত্য ঘটনা অবলম্বনে লিখিত)

সাধের নৌকা।

সামাল সামাল, ওই ডেকে আসে বাণ,
দেশ ছেয়ে আসে ধেয়ে জল কাণে কাণ!
নিমেষে নিমেষে বাড়ে কে কোথা পালায়,
তরাসে সকল জীব হাবু ডুবু খায়।
[illegible] স যায় চাল,
[illegible] আ[illegible]
[illegible] চাই,
[illegible] ড় বালাই!
[illegible] াধের নৌকায়,
চড়িয়া [illegible] ভেসে যায়।
এক ভাগ্না বসেছেন ছত্রির উপরে;
কয় জন দেখিছেন বসিয়া ভিতরে।
টানে পড়ে ছোটে তরি, হু হু করে ধায়,
আরামেতে কয় জনে বসিয়া তাহায়।
এমন অপূর্ব্ব তরি কে দেখেছে কবে?
এ তরির ইতিহাস শুন কিছু তবে।
আছিল কৃষক এক মুরগী পুষিত,
পরিয়া কাঠের জুতা কাদাতে চষিত।
আসিলে বন্যার জল কে কোথা ছুটিল,
মুরগী শাবক ছাড়ি কোথা পলাইল!
ছানাগুলি জলে পড়ি না দেখে উপায়,
[illegible]ষে লম্ফ দিয়া উঠিল জুতায়।
এলো জল ভাসে জুতা নৌকার মতন,
আরোহী হইল তাতে এই কয় জন।
বড়রা ডুবিয়া মলো; ছোটরা বাঁচিল,
ভাসিতে ভাসিতে তরি ডাঙ্গাতে লাগিল।

সময়ের সদ্ব্যবহার।

বড়লোক হইতে তোমার, আমার সকলেরই ইচ্ছা করে; ঘরে বসিয়া আছি হঠাৎ একেবারে কতকগুলি টাকা পাইলাম আর অমনি বড়লোক হইয়া গেলাম এইরূপই অনেকেরই ইচ্ছা। কিন্তু এরূপ ইচ্ছা প্রায়ই সফল হয় না।—

দুই রকম লোককে সচরাচর সকলে বড়লোক বলে। এক, যাহাদের অনেক টাকা কড়ি, বিষয় সম্পত্তি আছে তাহাদিগকে; আর যাহারা বিদ্যাতে ও বুদ্ধিতে শ্রেষ্ঠ তাঁহাদিগকে বড়লোক বলা যায়।

দ্বিতীয় প্রকারের বড়লোকেরই মান, সম্ভ্রম পৃথিবীতে বেশী। সময়ের মূল্য বুঝা চাই; সময় অপব্যয় করিলে কি ক্ষতি হয় এবং কাজে লাগাইলে কি উপকার হয় ইহা না বুঝিলে এই প্রকারের বড় লোক হওয়া যায় না।

যেমন কোন একটী ক্ষেত্র কোনরূপ চাষ না করিয়া যদি ফেলিয়া রাখা হয় তাহা হইলে সেই ক্ষেত্রটী অতি শীঘ্রই পতিত হইয়া যায় অথবা কাঁটা গাছ, জঙ্গল কেবলমাত্র উৎপন্ন করে; আর যদি পরিশ্রম করিয়া মাটি চাষ করিয়া তাহাতে ভাল বীজ বপন করা যায় তাহা হইলে উত্তম শস্য উৎপাদন করে। সেইরূপ যাঁহারা বিদ্যা উপার্জ্জন দ্বারা মনের উন্নতির দিকে চেষ্টা না করেন, বৃথা গল্প করিয়া সময় কাটান, তাহাদের মনে কাঁটা গাছরূপ কুভাব উদয় হয় এবং ক্রমশঃ তাহা বৃদ্ধি পাইয়া মনকে নানা প্রকার পাপ কার্য্যে প্রবৃত্ত করে; আর যিনি সময়ের মূল্য বুঝিয়া ছেলেবেলা হইতেই বৃথা সময় না কাটাইয়া পরিশ্রম সহকারে বিদ্যা উপার্জ্জনের দ্বারা মনের উন্নতি করেন তিনিই শেষে বিদ্যা বুদ্ধির গুণে বড়লোক হন।

সময় অমূল্য, একবার সময় নষ্ট করিলে, আর তাহা ফিরাইয়া আনা যায় না। যদিও প্রথমে সময় বৃথা কাটাইয়া পরে কঠিন পরিশ্রম করিয়া প্রথমে যে কাজ করা উচিত ছিল তাহা করা যাইতে পারে, কিন্তু কে বলিতে পারে যে অত দিন বাঁচিয়া থাকিয়া পরিশ্রম করিবার সময় সকলেই পাইবে? মানুষের জীবন অতি ক্ষণস্থায়ী; এখন হাসিতেছি, খেলিতেছি, কাল হঠাৎ মরিয়া যাইতে পারি। কোন কালেই সময়ের অপব্যবহার কোন মতেই করা উচিত নহে। পরে কঠিন পরিশ্রম করিব এখন বৃথা আমোদ করি, কখনই এরূপ ভাবে সময় কাটান উচিত নহে।

সময়ের উপযুক্ত ব্যবহার করিতে হইলে সর্ব্বদা কোন না কোন কাজে মনকে নিযুক্ত রাখিতে হয়। যাহারা কোন কাজ কর্ম্ম করে না, কেবলমাত্র শুইয়া বসিয়া সময় কাটায় তাহাদের মনে প্রথমতঃ কুচিন্তার উদয় হয়, পরে কুকাজ করিবার ইচ্ছা ক্রমশঃ প্রবল হয়। মন্দ হওয়া বড় সহজ, ইচ্ছা করিলে যত শীঘ্র মন্দ হওয়া যায় কিন্তু বিনা পরিশ্রমে, বিনা কষ্টে, [illegible] করিলে তত শীঘ্র ভাল হওয়া যায় না। কাজেই যাহাদের কোন কাজই থাকে না তারাই অতি [illegible] সহজে মন্দ হইয়া পড়ে।

[illegible] লেই নিজের সময় কাটাইবা[illegible] পরের নিন্দা ভাল লাগে, [illegible] কুৎসা বলিয়া বেড়াইতে ইচ্ছা হয়, শেষে পরের অনিষ্ট করিতে ইচ্ছা হয়, অনেক মন্দ কাজ করিতে বাধ্য হইতে হয় এবং ক্রমশঃ ঘোর পাপী হইতে হয়। নিষ্কর্ম্মা লোকদের নিকট একদিন এক বৎসর

বলিয়া বোধ হয়। এই দীর্ঘ সময় কাটাইবার জন্য কোন প্রকার অন্যায় কাজ করিতে কুণ্ঠিত হয় না। আলস্যই পাপের মূল। আর যাহারা সর্ব্বদা কার্য্যে ব্যস্ত তাহারা কুচিন্তা করিবার সময়ও পায় না। সময়ের সদ্ব্যবহারে যেমন বিদ্যাবুদ্ধিতে শ্রেষ্ঠ হইয়া বড় লোক হওয়া যায় তেমন স্বভাবও নির্ম্মল থাকে।

পৃথিবীতে গণ্যমান্য ব্যক্তি হইতে যদি চাও তাহা হইলে ছেলেবেলা হইতে সময়ের সদ্ব্যবহার কর; বৃথা সময় নষ্ট করিও না। বৃথা আমোদ, আহ্লাদ, গল্প পরিত্যাগ করিয়া ভাল ভাল পুস্তক পড়িয়া বিজ্ঞ হইবার চেষ্টা কর।

উচ্চ বংশে যাহাদের জন্ম তাহাদের বুদ্ধি বেশী, তাহারাই যত্ন করিলে লেখা পড়া শিখিতে পারেন আর নীচ জাতীয়দের সন্তানেরা চেষ্টা করিলেও সেইরূপ কৃতকার্য্য হইতে পারে না, এইরূপ বিশ্বাস অনেকেরই আছে। এ বিশ্বাস সম্পূর্ণ অমূলক। শত শত দৃষ্টান্ত দেওয়া হইতে পারে যে যাহাদিগকে আমরা 'ছোটলোক' বলি তাহারাও সময়ের সদ্ব্যবহার করিয়া লেখা পড়ায় শ্রেষ্ঠ হইয়া বড়লোক হইয়াছেন।

ছোট বড় সব জাতিতেই সময়ের উচিত ব্যবহার করিলে বড় লোক হইতে পারে। এই পথে জাতি বিচার নাই। যিনি সময়ের মূল্য বুঝিয়া পরিশ্রম [illegible] বিদ্যা উ[illegible] [illegible] লোক হইবেন।

[illegible] বড় লোক হইতে চাও তাহা[illegible] হইতেই সময়ের সদ্ব্যবহার কর।

ধাঁধা।

জুন মাসের ধাঁধার উত্তর।

আট সেরী ভাঁড়ের তৈল দ্বারা পাঁচ সেরী ভাঁড় পূর্ণ করিয়া পাঁচ সেরী ভাঁড় হইতে তিন সেরী ভাঁড় পূর্ণ করিল। তিনসেরী ভাঁড়ের তৈল আটসেরীতে রাখিয়া পাঁচ সেরী ভাঁড়ের তৈল তিনসেরীতে রাখিল। এখন আট সেরী ভাঁড়ে ছয় সের ও তিন সেরী ভাঁড়ে দু সের রহিল। তৎপর আট সেরী ভাঁড়ের তৈল দ্বারা পাঁচ সেরী ভাঁড় পূর্ণ করিল এবং আট সেরী ভাঁড়ে এক সের তৈল রহিল। পাঁচ সেরী ভাঁড়ের তৈল দ্বারা তিন সের ভাঁড় পূর্ণ করিল,এখন আট সেরী ভাঁড়ে এক সের, পাঁচ সেরী ভাঁড়ে চারি সের এবং তিন সেরী ভাঁড় পূর্ণ রহিল। এখন তিন সেরী ভাঁড়ের তৈল আট সেরীতে ঢালিল; সুতরাং আট সেরীতে চারি সের ও পাঁচ সেরী ভাঁড়ে চারি সের রহিল। দুই জনেরই সমান হইল।

নূতন।

১। হস্ত পদ নাহি তার নাহি বাক শক্তি,
কৌশলেতে কথা কয় বুঝে কার শক্তি।
পবন সমান হয় তাহার গমন,
বিদ্যুৎ আকার তার সমস্ত লক্ষণ।

২। এক জমিদারের ১৮টী ঘোড়া ছিল; মরিবার সময়ে উইল করিয়া গেলেন যে তাঁহার প্রথম পুত্র $\frac{1}{2}$ একার্দ্ধ পাইবে; দ্বিতীয় পুত্র $\frac{1}{3}$ এক-তৃতীয়াংশ পাইবে; এবং তৃতীয় পুত্র $\frac{1}{9}$ এক নবমাংশ পাইবে। মৃত্যুর পর একটী ঘোড়া মরিয়া গেল। উইলের 'এক্সিকিউটার' কি প্রকারে ঘোড়া ভাগ করিবেন?

সখা।
তৃতীয় ভাগ। দশম সংখ্যা।
অক্টোবর, ১৮৮৫।

মহাভারতের উপদেশ।

দুইটী গল্প।

আমাদের দেশের বালকেরা প্রাচীনকালে যেরূপে বিদ্যাভ্যাস করিত, তাহা একবার বলিয়াছি। তখন বালকদের বাবুগিরি ছিল না। কেহ গাড়ীতে বা পাল্কীতে চড়িয়া স্কুলে আসিত না। সকলেই গুরুগৃহে কঠোর ব্রহ্মচর্য্য ব্রত অবলম্বন করিয়া বিদ্যাশিক্ষা করিত। এই ব্রহ্মচর্য্যের কথা 'সখা'র পাঠকদিগকে পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। আজ এ সম্বন্ধে দুইটী গল্প বলিতেছি।

পূর্ব্বকালে অয়োদধৌম্য নামে এক ঋষি ছিলেন। তাঁহার আরুণি, উপমন্যু ও বেদ নামে তিনটী শিষ্য ছিল। অদ্য আরুণি ও উপমন্যুর কথা বলিব। পূর্ব্বে বালকেরা কিরূপ কঠোর পরিশ্রম করিয়া নানা শাস্ত্রে পণ্ডিত হইত, লোভ, ক্রোধ প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া কিরূপ আত্ম-সংযম অভ্যাস করিত, সরল চিত্তে কিরূপে গুরুর আদেশ প্রতিপালনে যত্নশীল হইত, এবং নানা কষ্ট সহিয়া কিরূপে গুরুর সেবায় নিযুক্ত থাকিত, তাহা এই কথায় জানা যাইবে।

আয়োদধৌম্য বড় একটা সদয়প্রকৃতি ছিলেন না। শিষ্যেরা কতদূর কষ্ট সহিতে পারে, তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য তিনি সময়ে সময়ে শিষ্যদিগকে অনেক কঠোর কাজে নিযুক্ত করিতেন। শিষ্যগণ ছেলেবেলা হইতেই পরিশ্রমী ও কষ্ট-সহিষ্ণু হয় ইহাই তাঁহার ইচ্ছা ছিল। তিনি এক দিন আরুণিকে ক্ষেত্রের আলি বাঁধিতে বলিলেন। আরুণি গুরুর আদেশে ক্ষেত্রে যাইয়া আলি বাঁধিতে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু অনেক যত্ন করিয়াও আলি বাঁধিতে পারিল না। তখন নিজে সেই থানে শুইয়া জলের পথ রোধ করিল। এইরূপে অনেক সময় গেল; আরুণি আর কিছুতেই সেইখান হইতে উঠিল না। আলি বাঁধিতে অক্ষম হওয়াতে গুরুর আদেশ প্রতিপালন জন্য নিজেই আলি স্বরূপ হইয়া তথায় শুইয়া রহিল। পরে কোন সময়ে গুরু অপরাপর শিষ্যদিগকে আরুণির কথা জিজ্ঞাসিলে, তাঁহারা [illegible] "আরুণি আপনার আদেশে [illegible] আলি বাঁধিতে গিয়াছে।" গুরু [illegible] যেখানে আরুণি গিয়াছে, চল আমরাও সেখানে যাই।" আয়োদধৌম্য সেইখানে উপস্থিত হইয়া আরুণিকে ডাকিয়া কহিলেন, "বৎস আরুণি, কোথায়

গিয়াছ, আমার কাছে আইস।” আরুণি গুরুর কথায় তৎক্ষণাৎ ক্ষেত্র হইতে উঠিয়া আসিয়া অতি বিনীতভাবে গুরুকে কহিল, “ক্ষেত্র হইতে যে জল বাহির হইতেছিল, তাহা কিছুতেই বারণ করিতে পারি নাই, এজন্য আমি নিজে শুইয়া সেই জলরোধ করিয়াছিলাম। এখন আপনার কথায় উঠিয়া আসিলাম। অভিবাদন করি, আর কি আদেশ পালন করিতে হইবে আজ্ঞা করুন।” আয়োদধৌম্য শিষ্যের এইরূপ কষ্ট-সহিষ্ণুতা ও গুরুভক্তি দেখিয়া কহিলেন, “বৎস তুমি যথাসাধ্য আমার আদেশ পালন করিয়াছ, তোমার মঙ্গল হইবে। সমস্ত বেদ ও সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্র তোমার আয়ত্ত হইয়া উঠিবে। তুমি শস্যক্ষেত্রের আলি ভেদ করিয়া উঠিয়াছ, এজন্য আজ হইতে তুমি উদ্দালক নামে প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিবে।” আরুণি এইরূপে সেবা শুশ্রূষায় গুরুকে সন্তুষ্ট করিয়া অভীষ্ট বর পাইয়া স্বস্থানে চলিয়া গেল।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, আয়োদধৌম্যের উপমন্যু নামে আর একটী শিষ্য ছিল। এখন সেই উপমন্যুর কথা বলিতেছি। গুরু উপমন্যুকে গোচারণে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। উপমন্যু সমস্ত দিন গোরু চরাইয়া সন্ধ্যাকালে গুরুগৃহে আসিত; এবং অতি বিনীতভাবে গুরুকে অভিবাদন করিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইত। একদিন গুরু তাহাকে মোটা সোটা দেখিয়া কহিলেন, “বৎস উপমন্যু, তোমাকে বেশ হৃষ্ট-পুষ্ট দেখিতেছি, এখন কি খাও, বল।” উপমন্যু কহিল, “এখন আমি ভিক্ষা করিয়া দিনপাত করি।” ইহা শুনিয়া গুরু কহিলেন, “দেখ, ভিক্ষাতে যাহা পাও, আমাকে না জানাইয়া তাহা তোমার আহার করা উচিত নয়।” উপমন্যু গুরুর এই কথায় পরদিন হইতে ভিক্ষায় যাহা পাইত সমুদয় গুরুর কাছে আনিয়া দিত। গুরু সমুদয়ই নিজে লইতেন। তাহাকে খাইতে কিছুই দিতেন না। উপমন্যু ইহাতে কিছুমাত্র বিরক্ত না হইয়া গুরুর আদেশে পূর্ব্বের ন্যায় গোরু চরাইতে লাগিল। একদিন গুরু তাহাকে পূর্ব্বের ন্যায় মোটা সোটা দেখিয়া কহিলেন, “বৎস, তুমি ভিক্ষায় যাহা পাও, সমুদয় আমি লইয়া থাকি, তোমাকে কিছুই খাইতে দিই না; অথচ তোমাকে মোটা দেখিতেছি, এখন কি খাও, বল।” উপমন্যু কহিল, “একবার ভিক্ষা করিয়া যাহা পাই আনিয়া আপনাকে দিই, আর একবার কয়েক মুষ্টি চাউল সংগ্রহ করিয়া নিজের উদর পূরণ করিয়া থাকি।” গুরু কহিলেন, “দেখ, ইহা ভদ্রলোকের ধর্ম্ম নয়, তুমি নিজে দুইবার ভিক্ষা করিলে গৃহস্থ আর কাহাকেও ভিক্ষা দিবে না। ইহাতে অপর ভিক্ষুকদিগের কষ্ট হইবে, তোমারও লোভ বৃদ্ধি পাইবে। অতএব তুমি আর কখন দ্বিতীয়বার ভিক্ষা করিও না।” উপমন্যু গুরুর এই আদেশে দ্বিতীয় বার ভিক্ষা করিতে নিরস্ত হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় হৃষ্ট চিত্তে গোচারণ করিতে লাগিল। গুরু দেখিলেন—উপমন্যু কৃশ না হইয়া ক্রমেই বেশী মোটা হইতেছে; এজন্য তাহাকে আর একদিন কহিলেন, “বৎস! তোমার সমস্ত ভিক্ষান্ন লইয়া থাকি, আমার আদেশে তুমি দ্বিতীয় বার ভিক্ষাও কর না, অথচ তোমাকে পূর্ব্বাপেক্ষা স্থূলকায় দেখিতেছি; এখন কি আহার কর, জানিতে ইচ্ছা করি।” উপমন্যু কহিল, “গাভীগণের দুগ্ধ পান করিয়া জীবন ধারণ করিতেছি।” গুরু কহিলেন, “দেখ, আমি তোমাকে দুগ্ধ পান করিতে অনুমতি করি নাই, আমার অনুমতি না লইয়া

দুগ্ধ পান করা তোমার অত্যন্ত অন্যায় হইতেছে।” উপমন্যু ইহাতে লজ্জিত হইয়া প্রতিজ্ঞা করিল যে, আর কখনও গাভীর দুগ্ধ পান করিবে না। এদিকে গুরু তাহাকে বিলক্ষণ স্থূলকায় দেখিয়া আর একদিন কহিলেন, “বৎস, আমি তোমাকে দুগ্ধ পান করিতে নিষেধ করিয়াছি, অথচ তোমাকে স্থূলকায় দেখা যাইতেছে, এখন কি আহার কর?” উপমন্যু কহিল, “গো-বৎসগণ মাতৃস্তন পান করিয়া মুখ হইতে যে ফেণ বাহির করে, আমি তাহা পান করিয়া জীবন ধারণ করিতেছি।” গুরু ইহা শুনিয়া কহিলেন, “ইহাতে গো-বৎসগণের অত্যন্ত কষ্ট হয়, অতএব ফেণ পান করাও তোমার উচিত নয়।” উপমন্যু গুরুর এই আদেশ পাইয়া পূর্ব্বের ন্যায় গোরু চরাইতে লাগিল। সে গুরুর আদেশে ভিক্ষান্ন খাইত না, দ্বিতীয় বার ভিক্ষাও করিত না; এখন গাভীর দুগ্ধ পান ও দুগ্ধের ফেণ খাইতেও বিরত হইল। এইরূপে অনাহারী হইয়া গোরু চরাইতে চরাইতে উপমন্যু একদিন ক্ষুধায় বড় কাতর হইয়া পড়িল। নিকটে একটী আকন্দ গাছ ছিল, ক্ষুধার জ্বালায় উপমন্যু তাহার পাতা খাইল; সেই আকন্দ গাছের কটু তিক্ত পাতা খাওয়াতে তাহার চক্ষুর দোষ জন্মিল। উপমন্যু অন্ধ হইয়া বেড়াইতে বেড়াইতে একটী কূপে পড়িয়া গেল।

প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় উপমন্যু গোরু চরাইয়া আয়োদধৌম্যের নিকট উপস্থিত হইত। কিন্তু কূপে পড়িয়া যাওয়াতে সেদিন সন্ধ্যাকালে গুরুগৃহে যাইতে পারিল না। গুরু উপমন্যুকে দেখিতে না পাইয়া শিষ্যদিগকে কহিলেন, “উপমন্যু এখনও আসিতেছে না, আমি তাহাকে আহার করিতে নিষেধ করিয়াছি। বোধ হয়, সে কুপিত হইয়াছে; এই জন্য ফিরিতেছে না, চল আমরা তাহার অনুসন্ধান করি।” ইহা কহিয়া গুরু শিষ্যগণের সহিত বনে যাইয়া “বৎস উপমন্যু, কোথায় গিয়াছ” বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। উপমন্যু কূপ হইতে গুরুর স্বর শুনিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিল, “গুরুদেব! আমি কূপে পতিত হইয়াছি।” আয়োদধৌম্য ইহার কারণ জিজ্ঞাসিলে উপমন্যু পূর্ব্বের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে বলিল,—“আকন্দ পাতা খাওয়াতে অন্ধ হইয়া কূপে পড়িয়া গিয়াছি।” গুরু কহিলেন, “দেব-বৈদ্য অশ্বিনীকুমারের স্তব কর। তাঁহারা তোমার চক্ষুদান করিবেন।” উপমন্যু গুরুর আদেশে সংযত চিত্তে অশ্বিনীকুমার দ্বয়ের স্তব করিতে লাগিল। অশ্বিনীকুমার যুগল স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া সেইখানে আসিয়া উপমন্যুকে কহিলেন, “আমরা তোমার উপর বড় সন্তুষ্ট হইয়া এই পিষ্টক দিতেছি, ভক্ষণ কর।” উপমন্যু কহিল, “আপনাদের কথা অবহেলা করা উচিত নয়, কিন্তু আমি গুরুকে নিবেদন না করিয়া পিষ্টক খাইতে পারি না।”

ইহা শুনিয়া অশ্বিনীতনয় দ্বয় কহিলেন, “পূর্ব্বে তোমার গুরুও আমাদিগের স্তব করিয়াছিলেন। আমরা সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে একখানি পিষ্টক দিয়াছিলাম, তিনি গুরুর আদেশ না লইয়া তাহা খাইয়াছিলেন। তোমার গুরু যেরূপ করিয়াছিলেন, তুমিও সেইরূপ কর।” উপমন্যু কাতরস্বরে বলিল, “আপনাদিগকে অনুনয় করিতেছি, আমি গুরুকে নিবেদন না খাইতে পারিব না।” অশ্বিনীকুমার যুগল কহিলেন, “তোমার এইরূপ অসাধারণ গুরুভক্তি দেখিয়া আমরা সন্তুষ্ট হইয়াছি। তোমার চক্ষু লাভ হউক। কখনও যেন তোমার কোন অম-

জল না হয়।” উপমন্যু এইরূপে চক্ষু রত্ন পাইয়া গুরুর কাছে আসিয়া অতি বিনীতভাবে সমস্ত বৃত্তান্ত বলিল। গুরু প্রীত হইয়া কহিলেন, “দেববৈদ্যগণ যেরূপ কহিয়াছেন, সেইরূপ তোমার মঙ্গল হউক, তুমি সমস্ত বেদ ও ধর্ম্মশাস্ত্রের অধিকারী হও।” এইরূপে উপমন্যুর পরীক্ষা সমাপ্ত হইল।

দুই ভাই।

অমৃত ও সুরেন দুই ভাই এক রবিবারে বসিয়া গল্প করিতেছে। নানা প্রকার কথা বার্ত্তা হইতেছে:—‘স্কুলের অমুক ছেলেটী বড় ভাল, কিন্তু তার একটা দোষ, সে অহঙ্কারী; কারও সঙ্গে মন খুলে কথা কয় না। অমুক মাষ্টারটী বড় মারেন, ভারি রাগী, একদিন অমৃতকে মারিতে গিয়াছিলেন, দূর হইতে সুরেন তা দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়াছিল’—ইত্যাদি ইত্যাদি কত সব কথা হইতেছিল। এমন সময়ে মা আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

মা—“কি কথা হইতেছে, অমৃত?

অমৃত—“এই সব স্কুলের কথা আর ছেলেদের কথা, আর কিছু না।”

মা—“মিছামিছি সময়টা নষ্ট করা কি ভাল?”

সুরেন—“তা, মা! আজ ত আর স্কুলের পড়া নাই; মাষ্টার মহাশয়ও আসিবেন না?”

মা—“আজিকার পড়া নাই বা থাকিল? আর মাষ্টার মহাশয় না এলে কি পড়িতে নাই? এই আমি একখানা ভাল বই দিয়া যাচ্ছি, সেইখানা দুজনে পড়িতে পারিবে ত?”

অমৃত—“কি বই মা? সহজ ত?”

মা—“হাঁ খুব সোজা, আর ভাল ভাল গল্প ও উপদেশ আছে।”

সুরেন—“তা হলে দাও মা, এখনি দাও। আমি ভাল গল্প ও ভাল কথা শুনতে কি পড়তে বড় ভাল বাসি।”

মা তাঁর ঘর থেকে বইখানি আনিয়া দিলেন ও তাহাদিগকে পড়িতে আরম্ভ করাইয়া তিনি চলিয়া গেলেন। দুটী ভাই অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বসিয়া এক মনে বইখানি সমাপ্ত করিল। সুরেন তখন বলিল—“দেখ, দাদা! মা যদি না আস্‌তেন, তা হলে, আমরা কত কি বাজে কথাতেই আজ সকালবেলাটা কাটাতেম, আর এ কেমন চমৎকার কথা পড়িতে পেলাম! আমাদের মতন মা কিন্তু আর কারও নাই! ও বাড়ীর কেশব আর দুলাল সমস্ত দিনটা খেলা করিয়া বেড়ায়; কৈ, তাদের মা ত এমন ক’রে বই পড়তে দেন না? এবার অবধি আমাদের স্কুলের পড়া হয়ে গেলেই মার কাছ থেকে এক একখানা ভাল বই নিয়ে প’ড়ব, কেমন দাদা?” অমৃত ঘন ঘন ঘড়ীর দিকে চাহিতে চাহিতে কথাগুলি শুনিল; তার পর বলিল “হাঁ ভাই! চল এখন স্নান করিগে, দেখ বেলা ১০টা বাজে।”—“তাই ত! ওঃ! এর মধ্যে এত বেলা হয়েছে? আমি তা কিছুই জানতে পারি নাই। চল যাই।” উভয়ে পুস্তক খানি যত্ন করিয়া রাখিয়া স্নান ও আহারাদি করিতে গেল।

খাওয়া দাওয়ার পর দুজনে বাহিরের বাড়ীতে

ঘোড়ার গায়ে হাত বুলাইতে লাগিল। ঘোড়াটীকে দুজনে বড় ভালবাসে। অনেকক্ষণ ঘোড়াটীর গায়ে পায়ে, গলায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল, আর নিকটে সইস্ ভাত রাঁধিতেছিল, তাহার মুখে ঘোড়ার কত কথা শুনিতে লাগিল; কত রকমের ঘোড়া আছে, কোন্ জাতের ঘোড়ার কি কি গুণ, কত দাম ইত্যাদি কত কথা! তার পর দুজনে হাত ধরাধরি করিয়া ফুল বাগানের দিকে গেল। গোলাবাড়ী পার হইয়া বাগানের ছোট দরজাটীতে যেই পা দিয়েছে, অমনি দেখে যে একটা কি কাগজ পড়িয়া রহিয়াছে। সুরেন কুড়াইয়া লইল। অবাক! এ ওর মুখপানে চাহিতে লাগিল; আর কাগজখানা দেখিতে লাগিল—একখানা পাঁচ টাকার নোট!

ফুলবাগানে যাওয়া আর হ’ল না। বাড়ী ফিরিয়া আসিতে আসিতে পরামর্শ করিতে লাগিল—কি করা যায়? “মার কাছে লইয়া যাইতে হইবে।—যার নোট হারাইয়াছে নিশ্চয়ই তিনি সন্ধান করিয়া তাহাকে দিবেন।” অমনি একছুট। অনেক অনুসন্ধান করা হইল, নোট যে কাহার তা কেহ বলিতে পারিল না। শেষে মা বলিলেন—“যখন কার নোট ঠিক হইল না, তখন ও তোমাদেরই হইল। তোমরা যা ইচ্ছা করিতে পার।” দুজনের আর আনন্দ ধরে না। নোট পাইয়া দুজনে পড়িবার ঘরে বসিয়া পরামর্শ করিতে লাগিল, কিরূপে এই পাঁচটী টাকা খরচ করা হইবে। কতই বুদ্ধি আসিতে লাগিল, আবার তখনি “না সুবিধা হইবে না” “না, ওটা ভাল হয় না” মনে হইতে লাগিল। কোনটাই ঠিক মনের মত হইল না। অমৃতের ইচ্ছা, নিজেদের জন্য কোন পছন্দ মত ভাল জিনিস কিনে; সুরেন সে কথায় কাণ দেয় না, বরং বিরক্ত হয়—“কেন? আমাদের যা দরকার বাবাকে মাকে বলিলেই ত উচিত মনে করিলে তাঁহারাই কিনে দেন? সে জন্য এ টাকা খরচ করিতে হলে ত এক রকম বাবাকেই দেওয়া হয়। সে হবে না; এ টাকা কোন ভাল কাজে খরচ কর্ত্তে হবে।” তখন অমৃত বলিল, “ঠিক বলিয়াছ, সকালে বৈখানিতে যে পড়িলাম ‘কুড়াইয়া পাওয়া অর্থ নিজের দরকারে খরচ করিতে নাই, কেন না তাহাতে আমার কোন অধিকার নাই। যে যাহা পরিশ্রম করিয়া উপার্জ্জন না করে, তাহাতে তাহার যথার্থ অধিকার হয় না।’ ঠিক কথা! এতক্ষণ আমার মনে ছিল না। এ টাকা ভাল কাজেই খরচ করিতে হইবে।” সুরেনের এ সব কিন্তু মনে ছিল, তাই সে এতক্ষণ ঐ কথা বলিতেছিল। অনেকক্ষণ পরে স্থির হইল যে তাহাদের ক্লাশে গোপাল নামে যে ছেলেটী পড়ে তার বাপের পক্ষাঘাত রোগ হওয়া অবধি সে ভিক্ষা করিয়া স্কুলের বেতন দেয়, কিন্তু বৈ শ্লেট কিনিবার ক্ষমতা নাই বলিয়া পড়িবার বড়ই অসুবিধা হয়; ঐ টাকাতে তাহার সমস্ত বৈ ও একখানি শ্লেট, কিছু কাগজ, কলম ও কালি কিনিয়া দিতে হইবে। উভয়ের মন এখানে মিলিল। তখনি বাজারে গিয়া সমস্ত কিনিল, ও তা ছাড়া দুটী টাকা যে বাকী ছিল তাহাতে তাহার জন্য দুটী জামাও কিনিল।

“যাহা ভাল কাজ তাহা মনে উদিত হইবা মাত্রই করিয়া ফেলা উচিত” এই উপদেশ তাহারা মার মুখে প্রায় হাজার বার শুনিয়াছে; কাজেই তখনি সমস্ত সামগ্রী কিনিয়া ফেলিল। কিন্তু তার পর এক বড় গোলে পড়িয়া গেল। গোপালদের বাড়ীর সম্মুখে আসিয়াছে। কিন্তু

কেমন যে লজ্জা করিতে লাগিল ; বাড়ীতে যাইতে আর পারে না । গায়ে কাঁটা দিতেছে, বুকের ভিতর গুর গুর করিয়া উঠিতেছে, আর সমস্ত প্রাণটা যেন কেমন করিতেছে । একজন [illegible] আর একজন জামা ও শ্লেট কাগজ প্রভৃতি [illegible] তাহাদের পাঁচীলের পাশে [illegible] উপরের দাঁত দিয়া নীচের ঠোঁট কামড়াইতেছে, আর পথের দিকে চাহিতেছে । প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে ; আর যে রাস্তাটা কিছু গলির মতন, তাই সেখান দিয়ে এখন একজনও লোক চলিতেছে না । নহিলে তাহারা সেখানে দাঁড়াইতে পারিত না । ছেলে মানুষ কি না ? ভাল কাজ করিবে, উপকার করিবে—কেমন লজ্জা হইতেছে । হইতেই পারে ।

এ অবস্থায় কিন্তু তাদের বেশীক্ষণ থাকিতে হয় নাই । গোপাল একটা বাটী হাতে করিয়া বাজারে যাইবার সময় বাহিরে আসিয়া দেখে যে ছুটী ভাই পথের পাশে ঐরূপে দাঁড়াইয়া আছে । দেখিয়া সে আশ্চর্য্য বোধ করিল । এদিকে তাহারাও গোপালকে দেখিবামাত্র চম্‌কাইয়া উঠিল ; বুকের ভিতর ছুজনেরই যেন বড় বড় ঢেঁকি পড়িতে লাগিল "ধড়াস্ ধড়াস্" । তাহারা [illegible] পড়িল, গলায় আট্‌কাইয়া গিয়াছে, [illegible] সমস্ত গোপালের সম্মুখে [illegible] শীঘ্র হন্ হন্ [illegible] ভাঙ্গা [illegible] গুলি [illegible]

ক্রমশঃ

নিদ্রালু ননীগোপাল।

আর দিন নাই এস ননী ভাই
পরশু পরীক্ষা হবে ;
রজনী জাগিয়া বসিয়া বসিয়া
পড়ি মন দিয়া সবে ।
এই কথা বলি ননীরপুতলি
ননীগোপালেরে ধরি ;
বিমল সরল বালকের দল
বসাইল যত্ন করি ।
পড়িতে বসিয়া ঢুলিয়া ঢুলিয়া
ঘুমে হল ননী সারা ;
মুখে পড়ে লাল ভাসে ছুটী গাল
মুদিত নয়ন তারা ।
পণ্ডিত মশায় ধরিয়া তাহায়
তুলে দেয় বারে বারে ;
কেতাব খুলিয়া পড়ে গেঙ্গাইয়া
কিন্তু বুঝিবারে নারে ।
পাঠে যেই জন নাহি দেয় মন
তার কি স্মরণে থাকে ?
পড়ার বেলায় ঘুমে ধরে তায়,
মাঝে মাঝে নাক ডাকে ।
হইল না পড়া ছাড়ি চূড়া ধড়া
হাতে লয়ে মোমবাতি ;
চলে ননী ঘরে শুইবার তরে
না হইতে সন্ধ্যা রাতি ।
ঘুমে আঁখি ভরা মুখটী হাঁ করা
ফেলি জুতা খালি পায় ;
কাছা কোঁচা খোলা যেন বোম ভোলা,
টলিতে টলিতে যায় ।

বাগান বাজার পুস্তকালয় ও সাধারণ পাঠাগার

দেখো ভাই ননী খোঁকা ধনমণি
পড়িও না যেন ঢলে ;
হাঁ করিতে আর হবে না তোমার !
যাও মার কাছে চলে ।

অদ্ভুত কৌশল।

যদি সূর্য্যের আলোক এবং উত্তাপ না থাকিত তাহা হইলে আমরা বাঁচিতাম না, আর কেবল তাহাই নহে এ পৃথিবীতে যাঁহা কিছু সুন্দর ও মনোহর পদার্থ আছে, তাহার কিছুই থাকিত না, হয়ত এ জগতেরই সৃষ্টি হইত না। সূর্য্যের আলোক এবং উত্তাপ আমাদিগের জীবন ধারণের যেমন এক প্রধান উপায় তেমনি সুখেরও এক প্রধান কারণ। তাই বলিতেছিলাম যে, সূর্য্য যে আলোক ও উত্তাপ এখন দিতেছে, তাহাতেই আমরা বাঁচিয়া আছি এবং নানা প্রকার সুখ ভোগ করিতেছি। আবার পাঠক পাঠিকা শুনিয়া হয়ত অবাক্ হইবে যে, সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে, যখন তোমার বুড়ো ঠাকুরদাদার ঠাকুরদাদারও জন্ম হয় নাই, হয়ত [illegible] জন্ম হয় নাই, তখন সূর্য্য যে আলোক ও উত্তাপ দিয়াছে, সে আলোক এবং উত্তাপও ঈশ্বর নানা প্রকার সুখের জন্য সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছেন। কি আশ্চর্য্য কৌশলে পরমেশ্বর সেই আলোক ও উত্তাপ তোমার সুখের জন্য সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছেন, আজ তাহারই একটী [illegible] বলিতেছি।

পাথুরে কয়লা তোমরা অনেকেই দেখিয়াছ। ইংরাজিতে ইহাকে 'কোল' বলে; আমাদের দেশে 'পাথুরে কয়লা' বলে। পাথরের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ আছে বলিয়া যে ইহাকে পাথুরে কয়লা বলা হয় তাহা নহে; বোধ হয় পাথরের মত কঠিন, পাথরের মত ওজনে ভারি এবং কতকটা পাথরের মত দেখ্‌তে এই জন্যই পাথুরে কয়লা বলে। বাস্তবিক ইহার পাথরের সঙ্গে কোনই সম্বন্ধ নাই; আর শুধু 'কয়লা' বলিলে কাঠ পোড়াইলে যে কয়লা হয় তাহাই মনে হইতে পারে, এ জন্যও পাথুরে কয়লা বলা হয়। ইংরাজিতে দুইএরই ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে, পাথুরে কয়লাকে 'কোল্' বলে এবং কাঠের কয়লাকে 'চারকোল্' বলে।

অনেকের ধারণা আছে যে পাথর যেমন পাহাড় হইতে কাটিয়া আনে, পাথুরে কয়লাও তেমনি পাথুরে কয়লার পাহাড় হইতে কাটিয়া আনে। বাস্তবিক তাহা নহে। কয়লা খনি হইতে কাটিয়া আনিতে হয়। বিলাতে, আমেরিকায় এবং অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি নানা স্থানে বড় বড় কয়লার খনি আছে। আমাদের দেশেও রাণিগঞ্জ, গিরিধি প্রভৃতি স্থানে বড় বড় খনি আছে। মাটির অনেক নীচে এই সমস্ত কয়লার খনি দেখিতে পাওয়া যায়। দুই তিন হাত মাটি খুঁড়িলেই যে কয়লার খনি বাহির হয় তাহা নহে। প্রথম স্তরে স্তরে মাটি খুঁড়িয়া ফেলিতে হয়, তার পর বালির স্তর দেখিতে পাওয়া যায়, সে গুলি খুঁড়িলে কর্দ্দমের স্তর বাহির হয়, তার পর অনেক সময় পাথরের স্তরও দেখিতে পাওয়া যায়, সেই গুলি খুঁড়িয়া ফেলিলে তখন কয়লার স্তর বাহির হয়। ইহার এক একটী স্তর অনেক দূর ব্যাপিয়া থাকে। আমেরিকার এক স্থানে সাত শত ত্রিশ মাইল দীর্ঘ এবং একশত আশি মাইল প্রস্থ কয়লার খনি বাহির হইয়াছে; সমস্ত ইংলণ্ড ইহার অপেক্ষা ছোট। এখন ভাবিয়া দেখ এক একটী

কয়লার খনি কত বড়। এই সমস্ত খনি হইতে কয়লা সংগ্রহ করিতে কত লোক নিযুক্ত করিতে হয়, কত প্রকার বাষ্পীয় কল নিযুক্ত ও কত পরিশ্রম করিতে হয় তাহা অনায়াসেই বুঝা যায়। কি উপায়ে কয়লা সংগ্রহ হয় সে সম্বন্ধে বিশেষ কিছু আমরা বলিব না; গত বৎসরের দ্বাদশ সংখ্যা, ১৯১ পৃষ্ঠা, সম্পাদকের দ্বিতীয় পত্রে তাহার বিশেষ বিবরণ আছে। কয়লা কিরূপে প্রস্তুত হয় এবং আমাদের কি কি উপকারে আসে, সংক্ষেপে তাহাই বলিব।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে পাথুরে কয়লার সঙ্গে পাথরের কোন সম্বন্ধ নাই। তবে এ জিনিসটা কি? যদি দুই কথায় ইহার উত্তর দিতে হয় তাহা হইলে এই বলা যাইতে পারে যে পাথুরে কয়লা উদ্ভিদের রূপান্তর মাত্র। যে কাঠ পোড়াইলে কয়লা বা 'চারকোল্' হয়, এও সেই কাঠ; তবে ভিন্ন প্রকার অবস্থায় থাকাতে ভিন্ন আকার এবং ভিন্ন নাম হইয়াছে মাত্র। উদ্ভিদই যে কয়লার মূল তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। অনেক সময় গাছের পাতা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গাছ ও লতা পাওয়া গিয়াছে, যাহার আকার ঠিক রহিয়াছে, কিন্তু এখন আর পাতা অথবা লতা নাই; এখন সে গুলি কয়লা হইয়া গিয়াছে, অথচ আকারের কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। আমরা যে কয়লা দেখিতে পাই তাহাতে কোন চিহ্ন হয়ত থাকে না, কিন্তু খনি হইতে যখন প্রথম কয়লা সংগ্রহ করা হয়, তখন অনেক উদ্ভিদের চিহ্ন ইহাতে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। বৈজ্ঞানিকেরা পরীক্ষা করিয়া নয়শত চৌত্রিশ রকমের উদ্ভিদ এ পর্য্যন্ত কয়লার মধ্যে পাইয়াছেন। কখন কখনও বড় বড় গাছও দেখা গিয়াছে, কিন্তু এখন আর তাহা গাছ নাই, কয়লা হইয়া পড়িয়াছে। কি রকমে কয়লা তৈয়ার হয় তাহা এখন বলিতেছি। জলা স্থান, হ্রদ ও নদী প্রভৃতির মধ্যে প্রথম গাছের পাতা, ছোট গাছ, লতা এবং বড় বড় গাছ পড়িয়া জমিতে থাকে। জলে ঢাকা থাকে এজন্য বাতাসের সঙ্গে কোন সংশ্রব থাকে না। ক্রমে এই গুলি পচিতে থাকে, এবং খানিকটা কাল হইয়া যায়, কিন্তু তখনও উদ্ভিদের আকার বজায় থাকে। ক্রমে বালি ও মাটির স্তর ইহার উপর জমিতে থাকে, এবং ক্রমে এই মাটির স্তর পুরু হইয়া উঠে। এই মাটির স্তরের চাপে ক্রমে ঐ জলমধ্যস্থ পদার্থগুলি জমাট বাঁধিতে থাকে, এবং ক্রমে রাসায়নিক যোগে রূপান্তরিত হইয়া কঠিন ও ভারি হয়; তখন ইহাকে পাথুরে কয়লা বলা যায়। এক স্থানে যে একটী মাত্র স্তর দেখিতে পাওয়া যায় তাহা নহে; যে প্রকার লিখিত হইয়াছে, ঐ প্রকার এক স্তর তৈয়ার হইলে উহার উপরে যে মাটির স্তর থাকে পুনরায় তাহার উপর পূর্ব্বের ন্যায় বৃক্ষাদি জমিতে থাকে, ক্রমে সে গুলি কয়লায় পরিণত হয়, এইরূপে অনেক স্তর হইতে দেখা যায়। ইহা যে দুই এক বছরেই হয় তাহা নহে; এক একটী স্তর তৈয়ার হইতে সহস্র সহস্র বৎসর দরকার হয়। এই কয়লার দ্বারা মানুষের যে কত উপকার হইতেছে, মানুষ যে কত সুখভোগ করিতেছে [illegible] না হয় না। এই কয়লার সাহায্যে আমরা বাড়ী আলোকে সাজাইতেছি, আমাদিগের খাদ্য সামগ্রী তৈয়ার করিতেছি। বড় বড় সহর ইহার সাহায্যে রাত্রিতে দিনের মত আলোকিত হইতেছে। ইহারই সাহায্যে রেল গাড়ীতে ছয় মাসের পথ ছয় দিনে যাইতেছি। ইহারই সাহায্যে বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে, কাপড় বোনা হইতেছে, লক্ষ রকমের কল চলিতেছে ও মানুষের নানা সুখ বিধান করিতেছে। আবার দেখ লক্ষ

লক্ষ লোক এই কয়লার খনিতে নিযুক্ত হইয়া অন্ন সংস্থান করিতেছে।

একটা কথা বলিতে ভুলিয়াছি, বোধ হয় তোমরা জান যে, যে কয়লা দ্বারা আমাদের রন্ধনের কাজ হয় তাহা ঠিক খনির কয়লা নহে। খনির কয়লা হইতে গ্যাস্ ও আল্‌কাত্‌রা বাহির করিয়া লইলে যাহা থাকে, তাহাই আমাদের রন্ধন কাজে লাগে, এবং ইহাকে ইংরাজিতে 'কোক্' কহে। একটা হাঁড়ির মধ্যে এক খণ্ড আদৎ কয়লা রাখিয়া হাঁড়িটার মুখ আঁটিয়া, হাঁড়ির গায়ে একটী ছিদ্র করিয়া তাহাতে একটা নল বসাইয়া যদি আগুনের উত্তাপ দেওয়া যায়, তাহা হইলে দেখা যায় যে নলের মুখ হইতে ধুমের ন্যায় এক রকম জিনিস বাহির হইতেছে। ইহাকেই গ্যাস্ কহে, এবং জ্বালাইলে সুন্দর আলো হয়। গ্যাস ভিন্ন ইহা হইতে আগুনের উত্তাপে আল্‌কাত্‌রা বাহির হয়। এবং অবশিষ্ট যাহা থাকে তাহাকে 'কোক্' কহে।

পাঠক পাঠিকাগণ! যে কয়লার সাহায্যে তোমাদের গৃহ আলোকিত করিতেছ, সুমিষ্ট খাদ্য তৈয়ার করিতেছ, যাহার সাহায্যে বিদেশের বন্ধু বান্ধবদিগকে এক মুহূর্ত্তে দেখিতে পাইতেছ, যাহার সাহায্যে [illegible] সুখভোগ করিতেছ, তাহা সূর্য্যের [illegible] কেবল এই কয়লার উত্তাপ ও আলোক দিবার শক্তি। এ উত্তাপ ও আলোক [illegible] শক্তি কোথা হইতে আসিল? শুনিলে আশ্চর্য্য হইবে যে সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে সূর্য্য যে [illegible] দিয়াছে, এ সেই উত্তাপ এবং সেই আলোক। কাঠ পোড়াইলে যে উত্তাপ ও আলোক দেখা যায় তাহাও সেই সূর্য্যের উত্তাপ ও সূর্য্যের আলোক। বৃক্ষ সূর্য্যের যে উত্তাপ ও আলোক সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিল, তুমি যখন তাহাকে পোড়াইতেছ তখন সেই উত্তাপ ও আলোক তোমাকে দিতেছে। আর সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে বৃক্ষেরা যে আলোক ও যে উত্তাপ সূর্য্যের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিল, এবং পরমেশ্বর যে অদ্ভুত কৌশলে তাহা তোমার সুখের জন্য সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিলেন, আজ সহস্র সহস্র বৎসর পরে সূর্য্যের সেই আলোক ও উত্তাপ ভোগ করিতেছ, ইহা কি আশ্চর্য্য নহে? ইহা কি ঈশ্বরের অদ্ভুত কৌশল নহে?

পণ্ডিতবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

বালক বালিকাগণ! আজ যে মহাত্মার ছবি অপর পৃষ্ঠায় দেখিতেছ উহাঁকে কি তোমরা চেন? নিশ্চয় চেন; যখন পাঁচ বৎসরের সময় তোমাদের বর্ণ পরিচয় হয় তখন হইতে ইহাঁর সহিত পরিচয় হইয়াছে। ইনি আমাদের বিদ্যাসাগর মহাশয়। আমাদের বিদ্যাসাগর মহাশয়, বলিতে মনে কত সুখ হইতেছে। কেন না হইবে? এত বড় লোক যে দেশে জন্মে, এরূপ লোককে যাহারা আমাদের লোক বলিতে পারে তাহারা কেন না সুখী হইবে? বাস্তবিক ইনি যে আমাদের দেশে জন্মিয়াছেন, এজন্য আমাদের দেশের মুখ উজ্জ্বল।

আমাদের বিদ্যাসাগর মহাশয় যে কত বড় লোক তোমরা তাহার কিছুই জান না। তোমরা যেমন মানুষ, কি করিয়াই বা জানিবে? যত বড় হইবে ততই ইহাঁর গুণাবলী শুনিবে। তোমরা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয়, কথামালা, বোধোদয়, আখ্যানমঞ্জরী, সীতার বনবাস প্রভৃতি

[library stamp]

ARTIST PRESS

পড়িয়াছ, এই মাত্র জান; এবং হয়ত শুনিয়াছ যে ইনি এদেশে বিধবা বিবাহ প্রচলিত করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু এই মাত্র জানাইলে ইহাঁর কিছুই বলা হইল না; ইহাঁর মহত্ত্ব কিছুই প্রকাশ করা হইল না। ইহাঁর ভিতরে যে মনুষ্যত্ব আছে, যে অসাধারণ মহত্ত্ব আছে, আমাদের ভাষার এমন কোন শব্দ নাই যে, তাহা দ্বারা আমরা তোমাদিগকে তাহা বুঝাইয়া বলি। একটা দাঁড়ি পাল্লার এক দিকে যদি একটা মোণ চাপাইয়া দেও ও অন্য দিকে যদি একটা ছটাক চাপাইয়া দেও তাহা হইলে [illegible] দশা হয় আমাদের স[illegible] গেলেও সেই দশা ঘটে। [illegible] এক পাল্লায় দিয়া ইহাঁকে আর দিকে দিলেও সমান হয় না। ইহাঁর জীবন-চরিত কিছু বলি শুন।

১৭৪২ শকের ১২ই আশ্বিন, মঙ্গলবার দিবা

দ্বিপ্রহরের সময় বিদ্যাসাগর মহাশয় হুগলি [illegible]লার অধীন বীরসিংহ গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি কলিকাতা সহরে সামান্য বিষয় কর্ম্ম করিয়া [illegible] কষ্টে নিজ পরিবারের ভরণ পোষণ নির্ব্বাহ করিতেন। এরূপ শুনা যায় দশ টাকা মাত্র তাঁহার মাসিক আয় ছিল। এই সামান্য আয়ে তাঁহাকে বাড়ীর ব্যয় ও কলিকাতার নিজের ব্যয় চালাইতে হইত। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বয়স [illegible] ৯ বৎসর তখন তাঁহার পিতা তাঁহাকে বিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য কলিকাতায় আনি[illegible]। ১০৲ টাকা মাসিক আয়ে একে নিজের [illegible] চলা দুষ্কর তাহাতে আবার পুত্রটীকে আনা [illegible]। ইহাতে পিতা ও পুত্র উভয়কে কিরূপ ক্লেশে দিন কাটাইতে হইত, তাহা তোমরা সহ[illegible] অনুমান করিতে পার। সেই নবম বর্ষীয় [illegible] স্নেহময়ী মাতার কোল ছাড়া হইয়া আসিয়া কলিকাতায় ঘোর দারিদ্র্যে দিন কাটাইতে লাগি[illegible]। বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিয়া থাকেন, সে [illegible] তিনি তরকারির মুখ প্রায় দেখিতে পাই[illegible]; প্রায় ভাতে ভাত ও কখন কখনও লবণ [illegible] তাঁহার পিতা তাঁহাকে আনিয়া কলিকাতার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বিদ্যা বুদ্ধি বিষয়ে সর্ব্বাগ্রগণ্য হইতে লাগি[illegible]। তাঁহার বালককাল হইতেই লোকে [illegible]তে পারিল যে এ ছেলে বাঁচিয়া থাকিলে [illegible] অদ্বিতীয় লোক হইবে।

যাহা হউক ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে ইনি কালেজের পাঠ সমাপন পূর্ব্বক যশস্বী হইয়া বাহির হইলেন। সেই সময়ে সিবিলিয়ান সাহেবদিগের শিক্ষার জন্য ফোর্ট উইলিয়াম কালেজ নামে একটী কালেজ ছিল। তিনি সর্ব্বপ্রথমে ৫০৲ টাকা বেতনে সেই কালেজের প্রধান পণ্ডিতের পদ পাইলেন। এই খানে কর্ম্ম করিবার সময় ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে তিনি বেতাল পঞ্চবিংশতি নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ঐ বৎসরের এপ্রেল মাসে তিনি সংস্কৃত কালেজের সহকারী সম্পাদকের পদ প্রাপ্ত হন। তৎপরে আবার কিছুকাল ফোর্ট উই-লিয়ম কালেজে কর্ম্ম করিয়া পুনরায় সংস্কৃত কালেজে আসিয়া ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে ১৫০৲ বেতনে সংস্কৃত কালেজের প্রিন্সিপাল অর্থাৎ অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হন। এই কয়েক বৎসরের মধ্যে জীবন-চরিত, বোধোদয়, উপক্রমণিকা প্রভৃতি আরও কতকগুলি গ্রন্থ প্রকাশ করিলেন। সংস্কৃত কালে-জের অধ্যক্ষের কাজ করিবার সময় ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে হিন্দু বিধবাদিগের পুনর্ব্বিবাহ শাস্ত্র সঙ্গত কি না এই প্রশ্ন তাঁহার হৃদয়ে উদিত হয়। এদেশের বালিকাদিগের অতি অল্প বয়সেই বিবাহ হয়, অনেক বালিকা শৈশবেই বিধবা হয়; তাহাতে আবার কোন স্ত্রীলোক বিধবা হইলে সে আর বিবাহ করিতে পায় না। তাহাকে চিরজীবন পরের গলগ্রহ হইয়া থাকিতে হয়। পরের গলগ্রহ হইয়া, লোকের তাড়া খাইয়া, [illegible]নের গঞ্জনা সহিয়া বিধবাদিগকে যেরূপে দিন যাপন করিতে হয় তাহা স্মরণ করিলে কাহার না হৃদয়ে দয়া হয়? বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহাদের দুঃখ দেখিয়া প্রাণে বড়ই ক্লেশ পাইয়া-ছিলেন; এই জন্যই তিনি বিধবা বিবাহ শাস্ত্র-সিদ্ধ কিনা, এইরূপ বিবাহ দেশে প্রচলিত

করা উচিত কিনা এই চিন্তাতে রত হইয়া-ছিলেন। এই খানেই তাঁহার মহত্ত্ব অনুভব করিতে পারা যায়। দেশের হাজার হাজার লোক প্রতিদিন স্বচক্ষে বিধবাদিগের কত যাতনা দেখিতেছে, কিন্তু তাহারা দেখিয়া উপেক্ষা করে; বিদ্যাসাগর মহাশয় উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। এই তাঁহার মহত্ত্ব। দুঃখিনী বিধবাদের জন্য কি করি?—এই চিন্তাতে তাঁহার মনের শান্তি গেল। তিনি রাত্রে ঘুমাইতে পারিতেন না। তিনি দিন দিন এই চিন্তায় এতদূর নিমগ্ন হইলেন যে, আহার নিদ্রা ভুলিয়া গেলেন। সে সময়ে তাঁহার পরিশ্রম যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহাদের মুখে শুনিতে পাই যে, তিনি সংস্কৃত কালেজের পুস্তকালয়েতে বাসা করিয়া ফেলিয়া-ছিলেন। কি প্রাতে, কি মধ্যাহ্নে, কি রাত্রে যখন যাও, দেখিবে বিদ্যাসাগর মহাশয় পুস্তক রাশির মধ্যে নিমগ্ন; মনোযোগ সহকারে কেবল বিবিধ শাস্ত্র পাঠ করিতেছেন ও গভীর রূপে শাস্ত্রের বিচারে নিযুক্ত রহিয়াছেন। একবার এক মুষ্টি অন্ন মুখে দিবার জন্য বাহিরে যাই-তেন, তদ্ভিন্ন সমুদয় সময় শাস্ত্র পাঠে যাপন করিতেন। এখন অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে, কিন্তু রাশীকৃত হাতে [illegible] পড়িয়া তাঁহাকে এক একটী বচন সংগ্রহ করিতে হইয়াছে।

এইরূপ গুরুতর পরিশ্রম ও পাঠের পর ১৮[illegible] খৃষ্টাব্দেই তাঁহার বিধবা বিবাহ বিষয়ক গ্রন্থ প্রকা-শিত হইল। তিনি শাস্ত্রের বচন তুলিয়া প্রমাণ করিলেন যে, বিধবাদিগের পুনর্ব্বিবাহ শাস্ত্র-সিদ্ধ। তাঁহার গ্রন্থ প্রকাশ হওয়াতে দেশ মধ্যে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল। এমন আন্দোলন প্রায় দেখা যায় না। চারিদিকে হুলস্থূল। হাটে বাজারে, পথে ঘাটে যেখানে সেখানে এই চর্চ্চা। পথ ভিখারিগণ বিধবা বিবাহের গান গাইয়া বেড়াইতে লাগিল। শান্তিপুরের তাঁতীরা "বেঁচে থাক বিদ্যাসাগর চিরজীবী হয়ে" এই গান পেড়ে বুনিয়া ধুতি প্রস্তুত করিতে লাগিল। ওদিকে দেশের প্রাচীন কালের কুসংস্কার যাহাদের মনে প্রবল ছিল তাহারা বিদ্যাসাগর মহাশয়কে পাষণ্ড, কুলাঙ্গার, দেশের শত্রু, ধর্ম্মের উচ্ছেদ-কর্ত্তা বলিয়া কত কটূক্তি করিতে লাগিল। ঠিক যেন বোধ হইল বিদ্যাসাগর মহাশয় হঠাৎ একটা কোন দ্বার খুলিয়া দেশ মধ্যে এক প্রকাণ্ড ঝড় আনিয়া ফেলিলেন। এই ঝড়ে সকলে কাঁপিয়া গেল; যে তাঁহার বন্ধু ছিল সে গা ঢাকা দিল; যে সহায় ছিল সে দূরে পলাইল; যাহারা বিধবা বিবাহের সপক্ষ বলিয়া নাম দিয়া-ছিল তাহাদের অনেকে গোবর খাইয়া প্রায়শ্চিত্ত করিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পিতা নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া গেলেন; তাঁহাকে একঘরে করি-বার জন্য সমাজের লোক ধর্ম্মঘট করিতে লাগিল। কিন্তু এত যে ওলট পালট হইয়া গেল, ইহার মধ্যে এক জন লোক [illegible] কাঁপিলেন না; [illegible] গিয়াছিলাম। [illegible] বার জন্য সহরের লোক [illegible] বিদ্যাসাগর মহাশয়কে দুই হাত অন্তর পাহারা রাখিতে হইয়াছিল; নতুবা দুষ্ট লোকে বোধ হয় তাঁহাকে ও বরযাত্রীদিগকে মারিয়া ফেলিত। অন্য লোক মুখে বলে, কাজে করে না; বিদ্যা-

[illegible] কথা সেই কাজ। তিনি [illegible] সাধনের জন্য দাঁড়াইলেন, [illegible] লোকের ভ্রূকুটির প্রতি একবার দৃষ্টি-[illegible] করিলেন না। দেশের পণ্ডিতেরা তাঁহার [illegible] গ্রন্থের প্রতিবাদ করিয়া যে [illegible] ছিলেন, তিনি তাহার উত্তর [illegible] প্রচার করিলেন। ইহাতে [illegible] বিচারশক্তি প্রকাশ পাই-[illegible] কেহই তাঁহার কথার উত্তর [illegible] দিতে পারে নাই।

তোমাদিগকে [illegible] বলি শুন, এমন বীর পুরুষ [illegible] য়াছি। তিনি যে প্রতিজ্ঞার [illegible] দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম [illegible] লেন, সেই প্রতিজ্ঞার বলে [illegible] শত্রুতার উপরে জয় লাভ করি-[illegible] কলেজের অধ্যক্ষ হইয়া তিনি [illegible] জন্য উপায় করিলেন; উপক্র-[illegible] ও কৌমুদী ব্যাকরণ প্রণয়ন করিলেন। [illegible] কিছুদিন পরে তিনি হুগলী, বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর ও নদীয়া জেলার স্কুল ইন্‌স্পেক্টরের পদ পাইলেন। উভয় কার্য্যের বেতন একত্র করিয়া তাঁহার মাসিক বেতন ৫০০৲ পাঁচ শত টাকা হইল। [illegible] করা তাঁহার অনেক দিন [illegible] তিনি ঘোর দারিদ্র্য ক্লেশ ভোগ করিয়াছেন বটে কিন্তু দরিদ্র হইলে লোকের যে নীচতা [illegible] নীচতা কখনও তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। তিনি কখনও আত্ম-মর্য্যাদা ভুলেন নাই; কখনও সামান্য স্বার্থের অনুরোধে অপমান সহ্য করেন নাই। ধনী বা পদস্থ লোকের তোষামোদ করা তাঁহার কুষ্ঠীতে লেখে নাই। জগদীশ্বর খাঁটি ইস্পাতে তাঁহাকে নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তিনি ভাঙ্গিবেন তবু নত হইবেন না। ইহাকেই ত বলে মানুষ। নতুবা ধনীর দ্বারে তোষামোদ দ্বারা জীবন ধারণ করাত শৃগাল কুকুরের কাজ। এই গুণে এই মহা-পুরুষকে আমরা এত ভালবাসি; আমাদের ভারতবর্ষে এমন রাজা নাই যাঁহার অপেক্ষা ঐ দরিদ্রের সন্তান বিদ্যাসাগর বড় লোক নহেন। যে স্বকর্ত্তব্য সাধনে সাহসী সেই মানবকুলে রাজা। আমাদের বিদ্যাসাগর মহাশয় এই হিসাবে এক-জন বড় রাজা।

যাহা হউক কে কোথায় দেখিয়াছ এক জন গরিব ব্রাহ্মণের ছেলে একটী ৫০০৲ শত টাকার চাকরী পাইয়া এক কথায় তাহা ছাড়িতে পারে? কিন্তু বিদ্যাসাগরের মত লোকের মনে অর্থের লোভ থাকে না। ধন সম্পদের প্রতি এ সব মহাত্মার ভ্রূক্ষেপ থাকে না। যে মনুষ্যত্বের অগ্নি ইহাঁদের মনে নিরন্তর জ্বলিতে থাকে, তাহার নিকট [illegible] সম্পদ তৃণ অপেক্ষাও হীন। ডিরেক্টর [illegible] সাহেবের অধীনে বিদ্যাসাগর মহাশয় কর্ম্ম [illegible] তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়কে চিনিতেন [illegible] তিনি তাহার প্রতি কিছু অপমান সূচক ব্যবহার করেন। বিদ্যাসাগরের তেজস্বী অন্তরে সেই ব্যবহার শেলের ন্যায় বিদ্ধ হইল। তিনি ৫০০৲ শত টাকাকে পাঁচ শত খোলার কুচির ন্যায় জ্ঞান করিয়া, অপকৃষ্ট বস্তুর ন্যায় পরি-ত্যাগ করিলেন। সাংসারিক লোকে কত ভয় দেখাইল, খাবে কি? পরিবে কি? চলিবে কিরূপে? বিদ্যাসাগর মহাশয় কাহাকেও কিছু বলিলেন না; কিন্তু দুর্জ্জয় প্রতিজ্ঞার সহিত গ্রন্থ রচনাতে প্রবৃত্ত হইলেন। এক্ষণে তিনি স্বীয় পরিশ্রমে এমন আয় দাঁড় করাইয়াছেন যে মাসে ৫০০৲ শত টাকা দিয়া এক জন লোক নিজের চাকর রাখিতে পারেন। যে মহাশয়েরা বলিয়াছিলেন বিদ্যাসাগর না খাইয়া মরিবে তাঁহারা এখন কোথায়? জগদীশ্বর কি বস্তু দিয়া এই ব্যক্তিকে গড়িয়াছেন, সংসারের স্বার্থপর নীচ প্রকৃতির লোকে বুঝিবে কি?

বিদ্যাসাগরের আত্ম নির্ভরের আর একটী গল্প বলি শুন; বিধবাদিগের বিবাহ দিবার জন্য তাঁহার অনেক হাজার টাকা ঋণ হয়। একবার সহরের কতকগুলি ভদ্র লোক তাঁহার ঋণ শোধের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করেন। বিদ্যা-সাগর মহাশয় শুনিলেন যে এরূপ অনেক লোকে টাকা দিতে যাইতেছে যাহারা বিধবা বিবাহের জন্য দিতেছে না কিন্তু কেবল বন্ধুকে বিপন্মুক্ত করিবার জন্যই দিতেছে। অমনি বিদ্যাসাগর মহাশয় সংবাদ পত্রে এই বলিয়া বিজ্ঞাপন দিলেন যে "বিধবা বিবাহের জন্য যিনি যাহা দিবেন তাহা তিনি কৃতজ্ঞ অন্তরে লইবেন। কিন্তু [illegible] বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য অ[illegible] বার প্রয়োজন নাই।" এরূপ তেজ[illegible] পরের কৃপার মুখাপেক্ষা করিবেন [illegible] নামের গৌরব থাকিবে কেন?

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অপরাপর কী[illegible] কার, দয়া, আত্ম-মর্য্যাদা বিষয়ে [illegible] আছে যে তাহা সমুদায় বলিতে গেলে এক খানি প্রকাণ্ড গ্রন্থ হয়। তাহার কিছু কিছু আর এক-বারে বলিবার ইচ্ছা রহিল।

পূজার ছুটির আমোদ।

বিদেশী পাঠক অনেকেই পূজার ছুটিতে বাড়ী চলিলেন। এই ছুটিতে অনেকেই অনেক প্রকারের আমোদ করিবেন। নূতন রকমের আমোদ দেখিবার জন্য সকলেই আগ্রহ প্রকাশ করে। একখানি ইংরাজি বই পড়িয়া যে সব নূতন আমোদের কথা এবারে শিখিয়াছি, তাহার কিছু কিছু সংক্ষেপে লিখিতেছি, একবার নিজেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন।

ঘরের মাঝামাঝি একটা পর্দ্দা টাঙাইয়া তাহার একপাশে আলো রাখিয়া তাহাতে আপ-নারা থাকিবেন। অপর পার্শ্ব অন্ধকার করিয়া তাহাতে কতকগুলি দর্শক ডাকিয়া বসাইবেন। এখন আপনারা আলো এবং পর্দ্দার মাঝখানে দাঁড়াইয়া যেরূপ অঙ্গভঙ্গী করিবেন, পর্দ্দায় তাহার যে ছায়া পড়িবে, তাহাতে তার চেয়ে ঐ সকল অঙ্গ ভঙ্গী আরো সুন্দর দেখাইবে।

খুব সরু সূতার দ্বারা একটা পুতুল টাঙাইয়া তাহার পেছনে যতগুলি আলো ধরা যায়, পর্দ্দায় [illegible]

আলোটা একটা টেবিলের উপরে রাখিয়া তাহার সামনে হাত ধরিলে পর্দ্দায় ঐ হাতের ছায়া পড়িবে। এখন বুদ্ধি খাটাইতে পারিলে হাত-টীকে কি হাত দুটীকে এরূপ ভাবে রাখা যাইতে

ENG·BY T·N·DEB

[illegible] একটা না একটা জানোয়ারের মতন দেখাইবে। হাত কিরূপ ভাবে রাখিলে কোন্ জানোয়ার হইবে, তাহা মুখে বলা তত সহজ নহে। পাঠকগণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক যদি একবার ছবি গুলির দিকে তাকান, তাহা হইলে আমার লেখার অপেক্ষা [illegible] পরিষ্কার বুঝিতে পারিবেন। জানোয়ার গুলি অবিকল হইল না। কিন্তু যাহা হইয়াছে তাহা দেখিয়াই দর্শকেরা বেশ্ সন্তুষ্ট হইবেন।

স্থানাভাবে গত বারের ধাঁধার উত্তর এবং নূতন ধাঁধা এবারে দেওয়া গেল না।

সখা।
তৃতীয় ভাগ। ১২শ সংখ্যা।

নবেম্বার, ১৮৮৫।

স্বাধীনতার প্রতি অনুরাগ।

একবার ইংরাজ এবং ফরাসীদিগের সহিত কোন এক যুদ্ধে জনৈক ইংরাজ নাবিক ফরাসীদিগের নিকটে বন্দী হয়। যে একদিনও সমুদ্রের ভীষণ তরঙ্গ দেখিয়া বিষণ্ণ হয় নাই, সে স্বাধীনতা-সুখ হারাইয়া পরের নিকট বন্দী হইল। গভীর যন্ত্রণায় তাহার হৃদয় পুড়িয়া যাইতে লাগিল। যদিও সে নিয়মমত খাইতে পরিতে পাইত; তবু বন্দী। আমরা স্ব ইচ্ছায় একটী নির্জ্জন গৃহে এক বৎসরও থাকিতে পারি, কিন্তু কেহ আমাদিগকে বাধ্য করিলে, আমাদের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করিলে, আমরা আর ঐ প্রকারে থাকিতে পারি না; মন যেন সদা সর্ব্বদা ছটফট করিতে থাকে, কিছুতেই যেন আমাদের কষ্ট দূর হয় না। এই জন্যই উক্ত নাবিকের মুখ-মণ্ডল বিষণ্ণ। দিনের পর দিন চলিয়া গেল; মুখে হাসি আর কেহ দেখিল না, স্বাধীনতা সুখ সে অনেক দিন হইতে হারাইয়াছে। এই প্রকারে কতিপয় দিবস অতীত হইল। অবশেষে ইংরাজ এবং ফরাসীদিগের সহিত সন্ধি হওয়াতে ঐ নাবিক মুক্ত হইল। তাহার এক্ষণ আনন্দ, হৃদয়ে ধরে না। ইংলণ্ডে যাইতেছে এমন সময় পথিমধ্যে একজন ব্যাধের সঙ্গে তাহার দেখা হইল। সে কতকগুলি পাখী বিক্রয় করিবার জন্য একটী পিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে; দেখিয়া তাহার মনে ভয়ানক ক্লেশ হইল। দুই দিন পূর্ব্বে নিজের জীবনের দশা একবার ভাবিল। সমস্ত শরীর কাঁপিয়া উঠিল। সে আর ঐ পাখীগুলির এই দুরবস্থা সহ্য করিতে পারিল না; তৎক্ষণাৎ খাঁচা সহ পাখীগুলিকে ক্রয় করিয়া, খাঁচার মুখ খুলিয়া একটী একটী করিয়া পাখীগুলিকে উড়াইয়া দিতে লাগিল। পাখী-বিক্রেতা নাবিকের এই প্রকার অদ্ভুত কার্য্য দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া [illegible] তিরস্কার করিতে লা[illegible]নে কে? স্বাধীনত[illegible] সমস্ত পাখীগুলি[illegible] মুক্ত হইয়া আকা[illegible]কে আশীর্ব্বাদ করিতে[illegible] দেখ)

তাহ[illegible] যদি তুমি কখন [illegible] ছিলাম ততদিন কারাগারে [illegible] স্বাধীনতা হারাইলে যে কি দুঃখ হয় তাহা অনুভব করিতে পারিতে; এবং আমি এই সুন্দর পাখীগুলিকে যে ছাড়িয়া দিতেছি, ইহা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইতে না। এই

ARTIST PRESS.

[illegible] স্বাধী[illegible]। [illegible] তাহার [illegible] স্বাধীনতা হারাইয়াছে সে বুঝিতে পারে। যাঁহারা স্বাধীনতা প্রাণের সহিত ভাল বাসেন তাঁহারা সকলেই অপরকে স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতে দেখিতে ইচ্ছা করেন।”

ব্যাধ এই কথাগুলি শুনিয়া চমকাইয়া উঠিল। বিদ্যুতের ন্যায় এই কথা গুলি তাহার অন্তরে প্রবেশ করিল। “এক দরিদ্র ব্যক্তি নিজের পয়সা দিয়া পক্ষীর স্বাধীনতা দান করে” এই কেবল ভাবিতে লাগিল। এবং এই এক কথা শুনিয়া তাহার জীবনের গতি বদলাইয়া গেল।

আমাদের ভাই ভগিনীদিগের মধ্যে কেহ কেহ হয়তঃ পশুপক্ষী কীট পতঙ্গদিগকে ধরিয়া অনর্থক নানা প্রকার কষ্ট দেন এবং তাহাদের যাতনা দেখিয়া দুঃখিত হওয়া দূরে থাকুক, বরং ক্ষণিক আনন্দ উপভোগ করেন। তাঁহাদের এইটী স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, স্বাধীনতা হারাইলে পশু পক্ষীরাও ঠিক আমাদের মত কষ্ট পায়।

ছেলে-খেলা।

ছোট ছোট ছেলেগুলি দেখিতে সুন্দর।
আলো করে থাকে যেন গৃহস্থের ঘর ॥
ফুটন্ত ফুলের মত ফুলের বাগানে।
হাসিছে খেলিছে সদা প্রসন্ন বয়ানে ॥
সুকুমার তনুখানি কেমন নির্ম্মল।
চাঁদমুখে চক্ষু দুটী করে ঢল ঢল ॥
তরল চপল অতি জীবনের গতি।
কিন্তু খেলিবার কালে বড় স্থির মতি ॥
ডাকিলে না দেয় সাড়া খেলায় পাগল।
খেলা ছাড়ি থাকিতে না পারে এক পল ॥
দিনমানে তিল মাত্র নাহি অবসর।
নিরলসে নানা খেলা খেলে নিরন্তর ॥
কি কাজ করিব বলি ভাবে না কখন।
করে নিত্য নব নব খেলার সৃজন ॥
কভু ঘোড়া হয়ে পিঠে চড়ায় অপরে।
কখন আপনি চাপে অন্যের উপরে ॥
কখন পুকুর খোঁড়ে বাঁধে পথ ঘাট।
কখন ঠাকুর গড়ি পড়ে পূজা পাঠ ॥
ছেলের কল্যাণে প্রতি গৃহস্থের ঘরে।
বার মাসে তের পর্ব্ব দেখে সব নরে ॥
কিন্তু ভাই কর খেলা তাহে ক্ষতি নাই।
মাঝে মাঝে কিছু কিছু পড়া শুনা চাই ॥
তোমাদের সঙ্গে চাহে খেলিবারে কবি।
পড়িয়া সখার পদ্য, দেখি তার ছবি ॥ *
এ বড় মজার খেলা নূতন প্রকার।
আমোদের সঙ্গে হয় জ্ঞানের সঞ্চার ॥
তার সঙ্গে নীতি শিক্ষা আপনা আপনি।
মাই খেয়ে বাড়ে যথা খোকা যাদুমণি ॥

মাইকেল ফ্যারাডে।

অধ্যবসায় থাকিলে মানুষ কত বড় হইতে পারে, চেষ্টা ও যত্নদ্বারা, সহায়হীন দরিদ্র সন্তান, নিজ অবস্থার কতদূর উন্নতি করিতে পারে, ফ্যারাডের জীবনচরিত পাঠ করিলে [illegible] বেশ বুঝা যায়। অতি সা[illegible]ও, অধ্যবসায়ের গুণে [illegible] গিয়াছেন। বিজ্ঞা[illegible]ন ছিলেন। তিনি [illegible] লেখা পড়া শিখেন [illegible] ছিল না; কেবল [illegible]ন শাস্ত্রে অদ্বিতীয় হ[illegible]লেন।

১৭৯১ খৃষ্টাব্দে ২২শে সেপ্টেম্বর এই মহাত্মার জন্ম হয়। লণ্ডন নগরের কোন একটী পল্লিতে

* গত সংখ্যার সচিত্র পদ্য দেখ।

এক [illegible]
করিয়া [illegible]
কর্ম্মকারের কাজ [illegible]
[illegible]তেন। এই [illegible] জন্ম হয় তখন কে ভাবিয়াছিল যে, এক সময়ে তিনি ইংলণ্ডের সর্ব্ব প্রধান ব্যক্তি হইবেন? ফ্যারাডের পিতা মাতা নিতান্ত দরিদ্র ছিলেন, জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য সামান্য কর্ম্মকারের কার্য্য করিতে হইত, সহায় সম্পত্তি কিছুই ছিল না; কিন্তু এক বিষয়ে তাঁহারা ধনী ছিলেন। ফ্যারাডের পিতা মাতা অতিশয় ধার্ম্মিক ছিলেন; এবং পৈতৃক সম্পত্তির ন্যায় ফ্যারাডে এই ধর্ম্মভাব পিতা মাতার নিকট হইতে পাইয়াছিলেন। অর্থাভাবে তাঁহারা সন্তানকে বিদ্যা শিক্ষা দিতে পারেন নাই, কিন্তু ধার্ম্মিক পিতা মাতা বাল্যকাল হইতেই সন্তানকে উত্তমরূপ ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়াছিলেন। ফ্যারাডে ক্রমে বড় হইলেন। পিতার সামান্য উপার্জ্জনে ব্যয় কুলায় না দেখিয়া

এগারো বৎসরের বালক ফ্যারাডে এক পুস্তক বিক্রেতার দোকানে কার্য্য আরম্ভ করিলেন। প্রত্যহ সংবাদ পত্র বিলি করা তাঁহার সেই সময়ে প্রধান কাজ ছিল। শুনা যায় ফ্যারাডে তখন একটুও লেখা পড়া জানিতেন না, এমন কি অক্ষর পরিচয় পর্য্যন্ত হয় নাই। সংবাদ পত্র বিলি করিবার জন্য বাহির হইয়া রাস্তায় চলিতে চলিতে তিনি ঐ সংবাদ পত্রের সাহায্যে অক্ষর চিনিলেন, এবং অধ্যবসায়ের গুণে অল্প সময়ের মধ্যেই পড়িতে শিখিলেন। লেখা পড়া শিক্ষা করিবার জন্য তাঁহার এইরূপ যত্ন ও আগ্রহ ছিল, কিন্তু তাই বলিয়া তিনি নিজ কার্য্যে অবহেলা করিতেন না। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও কার্য্য দক্ষতা গুণে অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি প্রভুর প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন। ঐ পুস্তক বিক্রেতার দোকানে যে কেবল পুস্তক বিক্রয় হইত তাহা নহে, পুস্তক বাঁধান কার্য্যও হইত। ফ্যারাডে এখন এই কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। বলিতে গেলে এই দপ্তরীর কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াই ফ্যারাডের উন্নতির পথ খুলিয়া গেল। তাঁহার যে সমস্ত পুস্তক বাঁধিতে হইত, তাহার মধ্যে কয়েকখানি বিজ্ঞানের পুস্তক ছিল; বিজ্ঞান শিখিবার জন্য স্বভাবতই তাঁহার অত্যন্ত আগ্রহ ছিল। বিজ্ঞানের পুস্তক দেখিয়া ফ্যারাডের আর আহ্লাদের সীমা রহিল না। অবসর সময়ে, এবং কখন কখন কাজ করিতে করিতেও একাগ্র হইয়া এই সমস্ত পুস্তক পাঠ করিতে লাগিলেন। এমনি করিয়াই লোকে বড় লোক হয়, এইরূপ যত্ন ও অধ্যবসায়ের গুণেই লোকের উন্নতি হয়। এইরূপে কয়েকখানি বই পড়িয়া ফ্যারাডের জ্ঞান পিপাসা আরও বাড়িয়া উঠিল। তিনি কেবল বই পড়িয়াই ক্ষান্ত হইলেন না, বিজ্ঞান সম্বন্ধে যে সমস্ত বক্তৃতা হইত তাহাতে নিয়ম মত তিনি উপস্থিত হইতে লাগিলেন। একাগ্র চিত্তে সেই সমস্ত বক্তৃতা শুনিতেন, এবং তাহার সারাংশ লিখিয়া আনিতেন। এই সমস্ত এত সুন্দর হইত যে ইংলণ্ডের প্রধান বিজ্ঞানবিৎ সার হাম্‌ফ্রে ডেভি তাহা দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ফ্যারাডে নিতান্ত দরিদ্র ছিলেন, কোন মতে তাঁহাদের দিনপাত হইত। একদিন ফ্যারাডের ইচ্ছা হইল যে তিনি একটী বৈদ্যুতিক যন্ত্র নির্ম্মাণ করিবেন, কিন্তু তাহাতে অনেক টাকার দরকার! ফ্যারাডে সহজে ছাড়িবার লোক ছিলেন না, তিনি কষ্ট করিয়া যাহা কিছু বাঁচাইতে পারিয়াছিলেন, তাহা দ্বারা কয়েকটী সামান্য সামান্য জিনিস কিনিয়া একটী কল তৈয়ার করিলেন। বালকের বুদ্ধি দেখিয়া সকলে অবাক্ হইল। ঐ দিন এক ব্যক্তি কার্য্য উপলক্ষে ঐ দোকানে আসেন, তিনি বালকের এই প্রকার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, এবং বিজ্ঞান শিখিবার জন্য এরূপ আগ্রহ দেখিয়া 'রয়েল ইন্‌ষ্টিটিউসন্' নামক বিলাতের সর্ব্বপ্রধান বিজ্ঞান সভায় বক্তৃতা শুনিবার সুবিধা করিয়া দিলেন। [illegible] ক্রমে পরিষ্কার হইতে [illegible] তাঁহাকে এই বিজ্ঞান [illegible] লাগিলেন। ফ্যারাডে [illegible] দপ্তরীর কার্য্যে নিযুক্ত [illegible] তাঁহার মনে এক চিন্তা [illegible]। পুস্তক বাঁধা আর তাঁ[illegible] ফ্যারাডের ন্যায় তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি সামান্য দপ্তরীর কার্য্য করিয়া সন্তুষ্ট থাকিবেন ইহা কখনও সম্ভব নহে। ফ্যারাডে কোন পথে যাইবেন চিন্তা করিতে লাগিলেন। বিজ্ঞান শাস্ত্রের আলোচনা তাঁহার

জীবনের প্রধান কার্য্য, তিনি তাহা বুঝিতে পারিলেন। ফ্যারাডে তখন অন্য সমস্ত কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য জীবন সমর্পণ করিবেন ইহা স্থির করিলেন। কিন্তু তাঁহার পথেও বিঘ্ন অনেক। ফ্যারাডে দরিদ্র দপ্তরী, কোন মতে দিন কাটিয়া যাইতেছে, এ অবস্থায় এই সামান্য সম্বলটুকু পর্য্যন্ত ছাড়িয়া দিয়া যদি তিনি বিজ্ঞান আলোচনায় নিযুক্ত হন, তাহা হইলে সংসার চলিবে কি প্রকারে? আর তিনি সহায় সম্বল শূন্য; কেইবা তাঁহাকে সেরূপ সুযোগ করিয়া দিবে? কিন্তু সাধু যাহার ইচ্ছা ঈশ্বর তাহার সহায়। ফ্যারাডে অনেক চিন্তার পর এক উপায় স্থির করিলেন। তিনি যে সমস্ত বিজ্ঞানের বক্তৃতা শুনিতেন, তাহার সারাংশ লিখিয়া রাখিতেন, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এইগুলি সমস্ত একত্র করিয়া তিনি পুস্তকাকারে লিখিলেন। বিজ্ঞানের পরীক্ষার জন্য অনেকগুলি আবশ্যকীয় চিত্র ও ইহাতে তিনি নিজে চিত্রিত করিলেন। তার পর সার হাম্‌ফ্রে ডেভির নিকট ঐ পুস্তকখানি এবং তাহার সহিত একখানি পত্র পাঠাইয়া [illegible] পত্রখানিতে [illegible] লিখিলেন। [illegible] ইচ্ছা [illegible] সেই [illegible] লেন। [illegible] হই- [illegible] সম্বন্ধে গভীর জ্ঞানের পরিচয় পাইলেন; এবং তাঁহার পত্রখানিতে তাঁহার ঐকান্তিক ইচ্ছাও বুঝিতে পারিলেন। ফ্যারাডের উন্নতির পথ আরো প্রশস্ত হইল;—তিনি ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে রয়েল ইন্‌ষ্টিটিউশনে, উইলিয়ম পেইনের স্থানে, ডেভির সহকারী নিযুক্ত হইলেন। বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় যন্ত্র সকল পরিষ্কার রাখা এবং তাহার তত্ত্বাবধান করা ফ্যারাডের প্রধান কার্য্য ছিল। এবং ইহাতে তাঁহার নিজ উন্নতির অনেক সুবিধা হইয়াছিল। অবসর পাইলেই এই সমস্ত যন্ত্রাদির সাহায্যে তিনি নানা প্রকার বিজ্ঞানের পরীক্ষায় নিযুক্ত হইতেন, এবং নূতন নূতন পরীক্ষার দ্বারা নিত্য জ্ঞানের বৃদ্ধি করিতেন। এই যুবকের তীক্ষ্ণবুদ্ধি এবং বিজ্ঞান সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইতে লাগিলেন। সকলেই বুঝিলেন, এ যুবক সামান্য নহে, একদিন ইংলণ্ডে বিজ্ঞান সম্বন্ধে ইনি অদ্বিতীয় হইবেন। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে ডেভি বিজ্ঞান আলোচনার জন্য ইউরোপ ভ্রমণে বহির্গত হন, ফ্যারাডেও তাঁহার সঙ্গে গমন করেন। এবং ইউরোপের প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণের নিকট পরিচিত হন। সকলেই তাঁহার গভীর জ্ঞান, তীক্ষ্ণবুদ্ধির পরিচয় পাইয়া, তাঁহাকে মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করেন। ১৮২১ খৃষ্টাব্দে তিনি উন্নতির চরম-সীমা প্রাপ্ত হন। ত্রিশ বৎসর বয়সের সময়ে তিনি রয়েল ইন্‌ষ্টিটিউশনের সর্ব্ব প্রধান পদলাভ করেন; এবং সেই বৎসরেই কোন ধর্ম্মপ্রচারকের কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। এই সময় হইতে ফ্যারাডে নিয়মিত রূপে বিজ্ঞান সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে থাকেন; গণ্য, মান্য, ধনী, বিদ্বান, সকলেই তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার জন্য আগ্রহের সহিত উপস্থিত হইতেন। তাঁহার প্রধান গুণ এই ছিল যে, অতি গুরুতর বিজ্ঞানের বিষয়গুলি অতি সহজে বুঝাইয়া দিতে পারিতেন, এমন কি বালকেরা পর্য্যন্ত অনেক সময় তাঁহার বক্তৃতা বুঝিতে পারিত।

এক দিন বক্তৃতা-গৃহ হইতে বক্তৃতা করিয়া

আসিবার সময়ে তাঁহার হস্ত হইতে একটী জিনিস মেজেতে পড়িয়া যায়। সমস্ত ঘর তখন অন্ধকার। জিনিসটী পড়িবা মাত্রই ফ্যারাডে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহাতে তাঁহার একটী শিষ্য বলিল "আজ অন্ধকারে অনুসন্ধান করিবার আবশ্যক কি? কল্য উহা পাওয়া যাইবে।" ফ্যারাডে হাস্য করিয়া বলিলেন "আমি যাহা করিবার জন্য প্রতিজ্ঞা করি তাহা কখনই অসম্পূর্ণ রাখি না; অদ্য ইহা না করিলে আমার জীবনে যাহা কোন দিন ঘটে নাই তাহাই হইবে।" বহু কষ্টের পর জিনিসটী প্রাপ্ত হইয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন।

এইরূপ যাঁহার প্রত্যেক সামান্য কাজের জন্যও অদম্য অধ্যবসায় তিনি যে অদ্বিতীয় হইবেন তাহাতে আর কি কোন সন্দেহ আছে?

কিন্তু ফ্যারাডে কেবল বিজ্ঞানের বক্তৃতায় যে নিযুক্ত ছিলেন তাহা নহে। পিতা মাতার নিকট হইতে বাল্যকালে যে শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন, তাহা তিনি ভুলেন নাই। তিনি নিয়মিতরূপে ধর্ম্ম প্রচার করিতেন। যাঁহারা মনে করেন বিজ্ঞান শিখিলে নাস্তিক হইয়া যায়, তাঁহারা ফ্যারাডের জীবনচরিত পাঠ করুন। দেখিবেন গভীর বিজ্ঞানের সঙ্গে কেমন ধর্ম্মভাব একত্রে রহিয়াছে। মানুষের যে যে গুণ থাকা আবশ্যক ফ্যারাডের তাহা সমস্তই ছিল। তাঁহার হৃদয় অত্যন্ত উদার ছিল, তিনি অত্যন্ত সরল ছিলেন, সকল সময়েই তাঁহার মন প্রফুল্ল। ক্ষণকাল তাঁহার নিকটে থাকিলে যেমন জ্ঞানের বৃদ্ধি হইত, তেমনি অনেক বিষয়ে শিক্ষা লাভও হইত। তিনি যাহা তাঁহার জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য বুঝিয়াছিলেন, তাহাতেই চিরজীবন নিযুক্ত ছিলেন। একদিকে বিজ্ঞানের আলোচনা, অন্যদিকে ধর্ম্ম প্রচার; জীবনে একদিনও তিনি ইহা ভুলেন নাই। বৃদ্ধ বয়সে তিনি গবর্ণমেণ্ট হইতে পেন্সন্ পান, এবং তাঁহাকে উপাধি গ্রহণ করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করা হয়। কিন্তু ফ্যারাডে জানিতেন যে, এ পৃথিবীর মান, সম্ভ্রম, উপাধি এ সমস্ত কিছুই নহে; এই জন্য তিনি উপাধি গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন। বাস্তবিক যে ব্যক্তি বড়, উপাধিতে তাঁহাকে আর বড় করিতে পারে না। কেবলমাত্র মাইকেল ফ্যারাডে বলিলে সমস্ত পৃথিবীর লোক যাঁহাকে চিনিতে পারে, তাঁহার আর উপাধির আবশ্যক কি?

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে ২৫ আগষ্ট ৭৬ ছিয়াত্তর বৎসর বয়সের সময়ে ফ্যারাডের মৃত্যু হয়। এই মহাত্মার মৃত্যুতে ইংলণ্ড এক প্রধান রত্ন হারাইয়াছে।

পুরস্কার প্রাপ্ত রচনা।*

(পিতা মাতার প্রতি কিরূপ [illegible])

[illegible] মুহূর্ত্তে পদা- [illegible] হইতে আমাদের [illegible] নাই। সেই দিন [illegible] কোন একটা সামান্য বিপদ হয় তাহা হইলেই তাঁহারা একেবারে

* এ বৎসর যাঁহারা রচনায় পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহাদের নাম সেপ্টেম্বর মাসের সখায় প্রকাশিত হইয়াছে। স্থানাভাবে সমুদায় রচনাগুলি প্রকাশ করিতে পারিলাম না। কেবলমাত্র একটী রচনা প্রকাশিত হইল। স-সং।

ভাবিয়া আকুল হন। শৈশবকাল হইতে যদি তাঁহাদের যত্নে প্রতিপালিত না হইতাম তাহা হইলে আজ আর আমরা সংসারে দাঁড়াইবারও একটা স্থান পাইতাম না। "আমরা এ সংসার অরণ্যের নূতন পথিক, আমরা ইহার কণ্টক বৃক্ষকে গোলাপ বৃক্ষ বলিয়া ধরিতে যাই, চোরা বালিকে শক্ত মাটি ভাবিয়া তাহারই উপর পা দিয়া দাঁড়াইতে যাই, বিপদকে আমরা সম্পদ মনে করি। যদি আমাদের পিতা মাতারা আমাদের প্রতি পদে পদে সতর্ক করিয়া না দিতেন, তাহা হইলে আজ আমাদের কি দশা হইত? যদি বাল্যকাল হইতে পিতা মাতারা আমাদের সৎশিক্ষা না দেন, সদুপদেশ না দেন, তাহা হইলে বড় হইয়া কি আমরা কখন সুখ-ভোগ করিতে পারি? যে ব্যক্তি ক্রোধ হিংসা বা অন্য কোন রিপুর পরবশ সে যদি বাল্যকাল হইতে পিতা মাতার নিকট রিপু দমন করিতে শিক্ষা না করে, তাহা হইলে সে কোন কালেই শান্তি লাভ করিতে পারে না। * * * * মাতার ন্যায় আমাদিগকে কে অত ভালবাসিতে পারে? [illegible] হৃদয়ে অত স্নেহ? খেলিতে খেলিতে ডুবিয়া [illegible] তাঁহার [illegible] ? [illegible] ?

মাতার যে স্নেহ যে ভালবাসা তাহা অখণ্ড, অতুলনীয়, স্বর্গীয়। ইহা দেবের দুর্লভ। বন্ধুর প্রেমে স্বার্থপরতা আছে, * * * * * কেবল পিতা মাতার প্রেমের ন্যায় নিরভিমান নিঃস্বার্থ প্রেম আর কোথাও নাই।

পিতাই বা আমাদের জন্য কত না কষ্ট স্বীকার করেন? দিন নাই, রাত্রি নাই তিনি আমাদের মঙ্গলের জন্য কতই না পরিশ্রম করিতেছেন। কষ্টকে কষ্ট জ্ঞান না করিয়া বিপদকে তুচ্ছ করিয়া আমাদের সুখ স্বচ্ছন্দের জন্য আপনার জীবন যেন উৎসর্গ করিয়া রাখিয়াছেন। আমাদের মুখে একটী হাসি ফুটাইবার জন্য আমাদের ভবিষ্যৎ জীবনের একটী কাঁটা সরাইবার জন্য তিনি যে কতদূর সহ্য করেন তাহা, আমাদের বুঝিবারও ক্ষমতা নাই। পিতা মাতা বিপদ দেখিয়া পিছু-পা হন না, সন্তানকে অযোগ্য বা অকৃতজ্ঞ দেখিয়াও তাঁহাদের ভালবাসা হ্রাস পায় না। ইঁহারা সন্তানের সুখের নিমিত্ত সকল কষ্টই সহ্য করিতে পারেন, সকল স্বার্থই ত্যাগ করিতে পারেন। সন্তানের গৌরবে তাঁহারা নিজে গৌরবান্বিত হয়েন, এবং সন্তান সম্পদ ভোগ করিলে, তাঁহাদের মনে হয় যেন তাঁহারা নিজেই সুখ ভোগ করিতেছেন। যদি তাহার নামে কোন বিশেষ অপবাদ হয় তথাপিও তাঁহারা তাহাকে সেই পূর্ব্বের ন্যায়ই ভাল বাসেন। সমস্ত জগৎ যদি তাহাকে পরিত্যাগ করে তাঁহারাই তাহার সমস্ত জগৎ হইয়া তাহাকে ক্রোড়ে গ্রহণ করেন।

আমরা পিতা মাতার ভালবাসা হইতে ঈশ্বরের স্নেহ ধারণা করি ও তাঁহাকে ভালবাসিতে শিখি। * * * * * পিতা মাতার ঋণ আজীবন ধরিয়া শুধিলেও শোধ হয় না। কিন্তু তাই বলিয়া এ ঋণ পরিশোধ করিতে কি আমরা চেষ্টা করিব না?

ছেলেবেলায় কিছু আমাদের ঋণ পরিশোধ করিবার সময় নহে, তখন আমাদের ঋণ করিবার কাল। আমাদের ছেলেবেলার কর্ত্তব্য পিতা

মাতার কথা শুনা। তাঁহারা আমাদের অপেক্ষা অনেক বুঝেন; তাঁহারা যাহা করেন সকলই আমাদের ভালর জন্য। আমি অনেক সময় দেখিয়াছি যে আমার হয়ত কোন একটা কার্য্য করিবার ইচ্ছা হইয়াছে, কিন্তু পিতামাতারা অনুমতি দিলেন না। তখন সহজেই ক্ষুণ্ণ হই। কিন্তু কিছু দিন পরে বুঝিতে পারি যে সেই কার্য্য করিলে আমার অমঙ্গল হইত। এইরূপ পিতামাতারা যখন তিরস্কার করেন আমরা অনেক সময় রাগ করি, কিন্তু আমাদের একবার ভাবিয়া দেখা উচিত যে তাঁহারা যে তিরস্কার করেন সে আমাদেরই ভালর জন্য। আমরা একটা মন্দ কাজ করিয়াছি, ভবিষ্যতে তাহা যাহাতে আর না করি সেই বিষয়ে সতর্ক করিয়া দিবার জন্যই তাঁহারা আমাদের ভৎর্সনা করেন। তাই বলি বাল্যকালে আমরা অজ্ঞান, সেই জন্য পিতামাতাকে পথপ্রদর্শক করিয়া তাঁহাদের কথা শুনিয়া চলা উচিত, তাঁহাদের আদেশানুযায়ী কার্য্য করা উচিত, তাঁহাদিগকে ভক্তি মিশ্রিত ভয় করা উচিত। তাহার পর আমরা যখন বড় হইব, সাংসারিক কার্য্যের ভার যখন আমাদের হস্তে ন্যস্ত হইবে যখন পিতামাতারা বৃদ্ধ হইবেন, তখন তাঁহাদের সহিত আমাদের আর এক সম্পর্ক হইবে, তখন আমরা তাঁহাদের পিতা মাতা হইব, তাঁহারা আমাদের সন্তান হইবেন। পূর্ব্বে তাঁহারাই আমাদিগকে যেরূপ যত্নে লালন পালন করিতেন, এ সময় আমরা যদি সেইরূপ যত্নের সহিত তাঁহাদের সুখ স্বচ্ছন্দতার দিকে দৃষ্টি রাখিতে পারি, আমরা যদি তাঁহাদের সহায় সম্বল হইয়া ধর্ম্মপথে মন রাখিয়া আপনাদের ব্যবহারে তাঁহাদের সুখী করিতে পারি, তাঁহাদের সুখের জন্য আপনাদের স্বার্থ ত্যাগ করিতে পারি তবেই আমাদের জীবন সফল হয়, জীবন পবিত্র হয়। আমাদের ঋণ পরিশোধ করা আমাদের সাধ্য নহে; কিন্তু ইহাতে আমাদের কর্ত্তব্য সাধন করা হয়।

শ্রীসরলা দেবী,
বয়স ১২ বৎসর ১১ মাস।

দুই ভাই।

(শেষাংশ।)

এইরূপে দুটী ভাই দ্রব্যগুলি দিয়া চলিয়া গেলে গোপালের মন যে কি[illegible] হইল, [illegible] পাঠক পাঠিকাগণ [illegible] তেছ। সে ভাব [illegible] এক খানি করিয়া [illegible] সকল পুস্তকই [illegible] অবস্থায় পড়িয়া [illegible] হইল বটে, কিন্তু [illegible] এ আনন্দ আর [illegible] রাগ হওয়া অবধি [illegible] কষ্ট তাহা নিজে দেখিতেছে [illegible] মনের দুঃখে মৃতপ্রায় হইয়া পড়িতেছেন, এ সকল দেখিয়া শুনিয়া তাহার মনে অনেক দিন অবধি ইচ্ছা হইয়াছে যে, লেখাপড়া শিখিয়া মানুষ হইবে এবং শীঘ্র শীঘ্র

কিছু অর্থ উপার্জ্জন করিয়া পিতা মাতার কষ্ট দূর করিবে। এই ইচ্ছা হওয়ায় ভদ্রলোকদের নিকট স্বয়ং যাইয়া ভিক্ষা করিয়া স্কুলের বেতন দিত, এবং পাড়ার একটী ছেলের বাড়ীতে গিয়া তাহার বৈ দেখিয়া পড়িয়া আসিত। তাহার পড়াশুনার আগ্রহ দেখিয়া সকলেই তাহাকে ভালবাসিতেন এবং সাহায্য করিতেন। এক্ষণে বৈগুলি পাইয়া বাড়ী বসিয়া পড়া হইবে ও সেই সঙ্গে সঙ্গে পড়িতে পড়িতে যদি আবশ্যক হয় পিতার সেবাও করিতে পারিবে, এই আশা মনে হইল ও আনন্দে তাহার মন একেবারে পূর্ণ হইল। সে বৈ, শ্লেট, কাগজ, কলম, জামা ও অন্য সমস্ত দ্রব্যগুলি লইয়া বাড়ীর ভিতর মাকে বাবাকে দেখাইতে লাগিল। দুটী ভাইএর দয়া ও সৎইচ্ছার বিষয় শুনিয়া তাঁহারা আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, এবং কৃতজ্ঞতার অশ্রুজল তাঁহাদের চক্ষে দেখা দিল। হৃদয়ের সহিত অগণ্য ধন্যবাদ ও আশীর্ব্বাদ করিয়া দ্রব্যাদি তুলিয়া রাখিলেন।

এদিকে সন্ধ্যার মধ্যেই অমৃত ও সুরেন বাড়ী ফিরিয়া আসিয়াছিল। এখন রাত্রি প্রায় আটটা বাজে, পিতা আহারে বসিয়াছেন তাহারাও তাঁহার [illegible] সম্মুখে বসিয়া নানা প্রকার গল্প [illegible] তাহাদের কথা শুনেন। এরূপ করাতে তাঁহারা বড়ই সুখে থাকেন। যথার্থই পরিবারটী যেন স্বর্গের দেবতাদের মত।

দাসী আসিয়া সংবাদ দিল "ও পাড়ার গোপালের মা আসিয়াছেন।" অমনি অমৃতের জননী ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া গেলেন। আর এদিকে—? অমনি ভাই দুটীর মুখে কেমন এক আশ্চর্য্য লজ্জা ও আনন্দের চিহ্ন প্রকাশ পাইল, তাহারাই বুঝিল আর কেহই দেখিতে পাইল না। আবার সেই রকম বুক ধড়াশ্ ধড়াশ্ করিতে লাগিল। "কিরূপ হইবে কে জানে?" তাহারা খাওয়া প্রায় বন্ধ করিয়া নীচের দিকে চাহিয়া রহিল, আর আঙ্গুল দিয়া মিছামিছি কি যেন করিতে লাগিল। অল্প ক্ষণের মধ্যেই মার সঙ্গে গোপালের মা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আসিয়াই অমৃত ও সুরেন দুজনকে কত যে আশীর্ব্বাদ করিলেন, তাহা আর কি বলিব? পিতা বাড়ী ছিলেন না, এ সমস্ত বিষয় কিছুই জানিতে পারেন নাই; জিজ্ঞাসা করিলেন "কি হইয়াছে?" গোপালের মা তখন তাঁহার দুঃখের অবস্থা সমস্ত বর্ণনা করিয়া তার পর বলিলেন "আহা! আপনাদের ধন্য দয়া! দীন হীন দুঃখীর প্রতি যে আপনারা মুখ তুলিয়া চাইয়া দেখেন এর তুল্য মহৎ কার্য্য আর কি আছে? আহা! গোপাল আমার "বৈ বৈ" করিয়া সারা হইতেছিল, বৈগুলি পাইয়া যে তার কি আহ্লাদ হইয়াছে তা আর বলিতে পারি না। সে সেগুলি একবার বুকে রাখিতেছে, একবার চুম খাইতেছে, আর এখনও পড়িতেছে। আমরা আপনাদের দয়াতে যে কি পর্য্যন্ত বাধিত হইয়াছি তা আর কি বলিয়া জানাইব? আনন্দে আমাদের হৃদয় পূরে গিয়েছে। আহার করিতে বসিতেছিলাম, কিন্তু এ আনন্দ ও এ কৃতজ্ঞতা আপনাদের না জানাইয়া আহার করা অনুচিত মনে করিয়া তাই মনের কথা বলিতে আসিয়াছি। ছেলে দুটী দীর্ঘজীবী হউক, আপনারাও মনের সুখে থাকুন আর এমনি ক'রে দীন দুঃখীর উপকার করুন।"

বালক দুটী লজ্জায় মাথা হেঁট করিয়া রহিল। জননী বুঝিতে পারিলেন, আর তাই একটু একটু হাসি তাঁহার মুখে শোভা পাইতেছিল। পিতা কিছুই ত বুঝেন নাই, কাজেই অবাক্ হইয়া একবার স্ত্রীর দিকে একবার পুত্রদের দিকে চাহিতে লাগিলেন। শেষে স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি হইয়াছে? আমি ত কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। তুমি গোপালের জন্য বৈ পাঠাইয়া দিয়াছিলে কি?" তিনি বলিলেন—"না, আমি জানিওনা যে গোপালের বৈ আছে কিনা, আর কি কি বৈ পড়ে তাও জানি না।—"

অমনি ব্যস্তভাবে গোপালের মা বলিয়া উঠিলেন—"সে কি? তবে ছেলেরা সে সব নূতন বৈ, কাগজ, শ্লেট, জামাছুটো—সব শুদ্ধ প্রায় ৫ পাঁচ টাকার জিনিস, কোথা পেলে? তাইত? আমরা মনে করেছিলাম যে আপনারা বুঝি ওদের হাতে দিয়ে সেগুলি দয়া করে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন? ওমা! আমার যে ভয় হচ্ছে! কেন বাবা তবে তোমরা মা বাপ্‌কে না ব'লে এমন কাজ কর্লে?"

মা বলিলেন—"চিন্তা কি? আপনি অমন করেন কেন? ওরা বেশ কাজই করেছে। আমি বড় সুখী হলেম। ওদের যে এরূপ বুদ্ধি হয়েছে, এর চেয়ে আর আমার সৌভাগ্য কি হতে পারে?" এখনও অমৃতের পিতা কিছু বুঝিলেন না। আবার জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন তিনি আদ্যোপান্ত সমস্ত কথা খুলিয়া বলিলেন যে—"আমি আজ প্রাতে দীন দুঃখীকে দয়া করা উচিত এই উপদেশ পূর্ণ একখানি বৈ ছেলেদের পড়িতে দিয়াছিলাম। সেখানি পড়িয়া উহাদের কেমন উপকার হইল তাই পরীক্ষা করিবার জন্য, ওরা দুপুর বেলা যেমন বাগানে যাবে অমনি পথের উপর পাঁচ টাকার একখানা নোট রাখিয়া এলাম। নোট পাইয়া যদি না বলিত, তাহা হইলে ভয়ানক দুঃখিত হইতাম আর খুব রাগ করিয়া বকিতাম। তা দেখি যে পাইয়াই নোটখানি আমার কাছে আনিল ও যার নোট হারাইয়াছিল তাহাকে দিতে বলিল। বড় খুসী হলেম ও একটু সন্ধান ক'রে কারও নয় প্রমাণ হলে বলিলাম, 'ইহা দ্বারা তোমরা যা ইচ্ছা করিতে পার এ তোমাদেরই।' এখন আরও আনন্দিত হলেম যে নোটের অতি উত্তম ব্যবহারই হইয়াছে।"

আহ্লাদে অমৃতের পিতা একেবারে গলিয়া গেলেন, তাঁহার বুক ফুলিয়া উঠিতে লাগিল। চক্ষে জল আসিল। তিনি কাঁপিতে কাঁপিতে নিকটে অমৃত বসিয়াছিল, তাহাকে কোলে বসাইয়া জড়াইয়া ধরিলেন। অমৃত খুব কাঁদিতেছিল, বাবার কোল হইতে নামিয়া আরও কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"আমায় না বাবা! আমায় না! আমি বড় হ'লে কি হয়? সুরেন আমার বড় ভাই। সুরেনকে কোলে করুন। আমি বড় নীচ, আ[illegible] নীচ। আমি এ টাকার দ্বারা নিজে[illegible] জিনিস কিনিবার পরা[illegible] নীচ। আমি এ [illegible]নই এই ভাল [illegible] করুন, সে আমার দাদা। আমি [illegible]

পুত্রের এই সরল সত্যপ্রিয়তা ও সাধুভাব দেখিয়া তিনি অমৃতকে আরও আদরের সহিত বুকে চাপিয়া ধরিলেন ও আনন্দাশ্রুতে তাহার মুখ ভাসাইয়া দিলেন। সুরেনকে তাহার মা কোলে লইয়া বার বার মুখে চুম্বন করিতে লাগি-

লেন ও বলিতে লাগিলেন "ধন্য আমাদের জীবন যে এমন পুত্র পাইয়াছি। দশ বছরের ছেলে তুমি বাবা, তোমায় এর মধ্যে এমন বুদ্ধি হইয়াছে?"—

সুরেন মার মুখ দুই হাতে চাপিয়া ধরিল। নিজের সুখ্যাতি সে এত শুনিবে কিরূপে? যে লজ্জায় গোপালদের বাড়ীতে গেল না, গোপালের সহিত দেখা হইলেও যে জিনিসগুলি দিয়াই সুখ্যাতি পাইবার ভয়ে ও লজ্জায় হন্ হন্ করিয়া চলিয়া আসিল, সে কি কখন মার মুখে এত প্রশংসা শুনিতে পারে?

গোপালের মা দেখিয়া শুনিয়া একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া বসিয়া রহিলেন। মনে হইল এ পৃথিবীতে বুঝি আর তিনি নাই, স্বর্গে দেবতাদের সঙ্গে বসিয়া আছেন! প্রশংসা শুনিতে সুরেনের অনিচ্ছা দেখিয়া বলিলেন "কেন বাবা! তুমি ভাল কাজ করিয়াছ, তার প্রশংসা নেবে না কেন?" বালক বিনীতভাবে বলিল—"সে কি মা! আমি কি ভাল কাজ করিয়াছি? গোড়া থেকে শেষ পর্য্যন্ত মার কাজ! সকালবেলা বসিয়া বৃথা সময় নষ্ট করিতেছিলাম, মাই ত সেই হিত [illegible] নহিলে ত এ [illegible] বুদ্ধি [illegible] বুদ্ধি [illegible] দের [illegible] মুখে ধরে দিলেন, নহিলে [illegible] সমস্তই তাঁর কাজ! সমস্তই মার কাজ [illegible] মা আর কারও নাই, কারও হয় না। আমাদের যেমন মা এমন আর হয় না।" এই বলে মার গলা জড়াইয়া বুকের ভিতর মাথা দিয়া রহিল।

উটপক্ষী।

আজকাল উপরে যে পক্ষিটীর ছবি দেখিতেছ উহাকে সকলেই "অচ্ট্রিচ্" বলিয়া ডাকেন। ইহার ইংরাজী নাম 'ostrich'; এবং এই নাম দ্বারাই এই পক্ষিটী সকলের নিকট পরিচিত। ইহার বাঙ্গলা নাম উটপক্ষী। প্রাচীনকালে অ্যারিষ্টটল, প্লিণী প্রভৃতি বিজ্ঞ পণ্ডিতেরা ইহাকে (camel bird) উট পক্ষী কহিতেন।

উট জন্তুর সহিত বিশেষ সাদৃশ্য আছে বলিয়াই ইহাকে উট-পক্ষী কহে। যেস্থানে উট পাওয়া যায়, সেই স্থানে উট-পক্ষীও দেখিতে পাওয়া যায়। উটের ন্যায় ইহার বুকের হাড় অতি কঠিন ও শক্ত এবং শয়ন করিবার সময় উটের ন্যায় বুকে ভর করিয়া শয়ন করে। উটের ন্যায় ইহার শরীরের মধ্যভাগ অতিশয় বৃহৎ। উভয়ের অবয়ব, চলন ও ভাবভঙ্গী প্রায় একই রকম। উভয়ে গলা টান্ করিয়া মস্তক উচু রাখে। উটেরা চলিবার সময়ে চারি পা প্রায় একত্র করিয়া চলে; এবং উট-পক্ষীরা চলিবার সময়ে ১০।১২ হাত অন্তর পা ফেলে। উটেরা চারি পায়ে যত টুকু যায়গা অধিকার করে; উট পক্ষীরা দুই পা দ্বারাই প্রায় ততটুকু স্থান অধিকার করে। এজন্য ইহাদিগকে দূর হইতে উটের দল বলিয়া সময়ে সময়ে মানুষের ভ্রম হয়। প্রভেদের মধ্যে এই যে উট-পক্ষীর দুই পা এবং

কলিকাতা

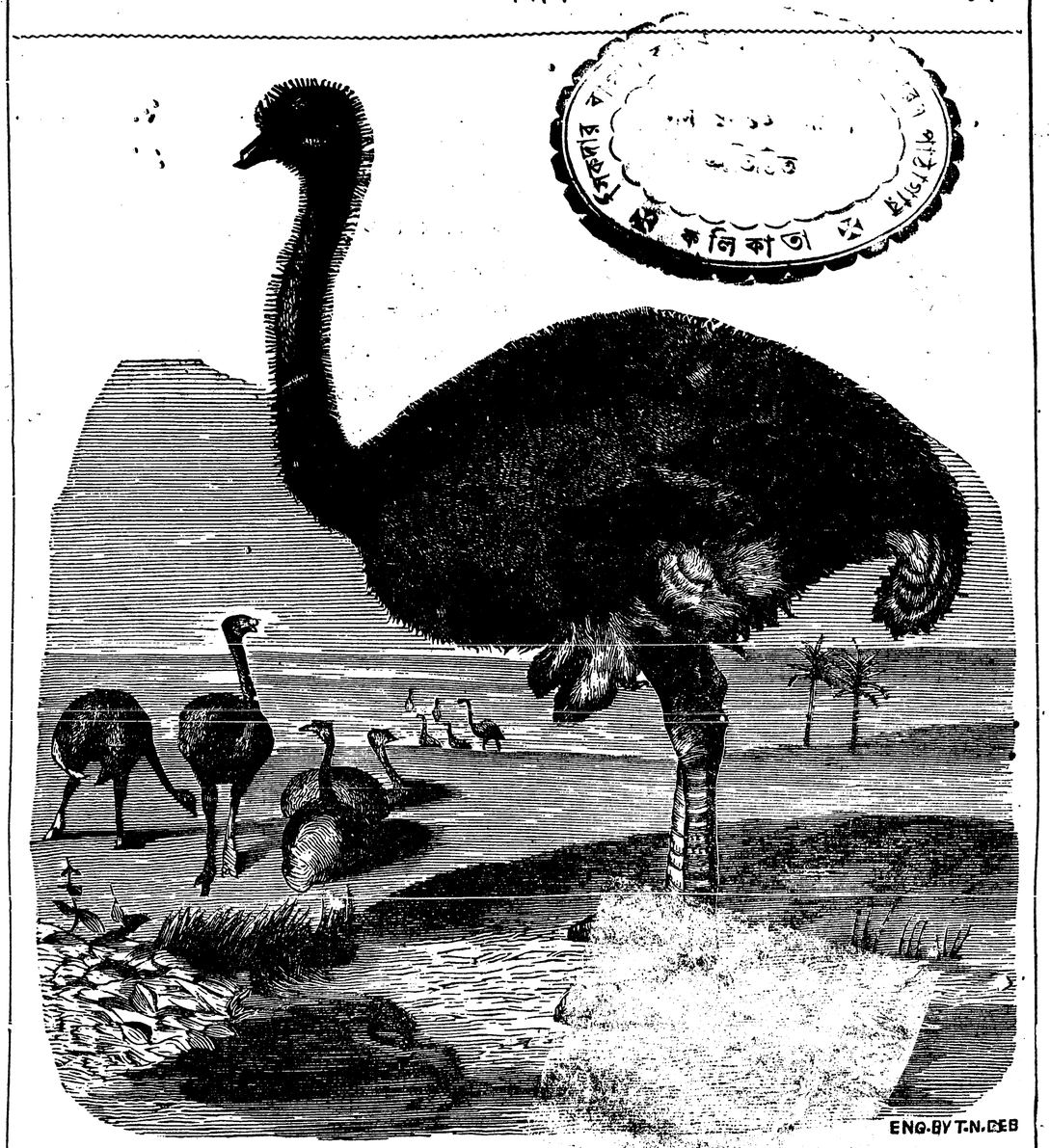

শরীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুই পাখায় ঢাকা, আর উটের চারি পা এবং শরীর ছোট ছোট রোমে আবৃত।

প্রাচীনকালে উট-পক্ষী পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্রই পাওয়া যাইত। শুনা যায় যে পুরাকালের রাজারা উট-পক্ষীর ডিম্ব প্রজার নিকট হইতে উপঢৌকন [illegible] কেবল আফ্রিকা দেশেই উট-পক্ষীর সংখ্যা বেশী দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা দল বাঁধিয়া থাকিতে ভালবাসে। একদলের সংখ্যা চারি কিম্বা পাঁচটীর বেশী নহে। ইহারা অতি দ্রুত চলিতে পারে, এমন কি এক

ঘণ্টায় ২৬ মাইল চলিতে পারে। অতি কষ্টভোগ কালে গাভী যে প্রকার চীৎকার করে, ইহাদের স্বাভাবিক ডাক সেই রকম। কোন কোন উট-পক্ষীর শব্দ সিংহের গর্জ্জনের ন্যায় শুনা গিয়াছে।

উট-পক্ষীরা যাহা পায় তাহাই ভক্ষণ করে, এমন কি একটি পাখী একবার তামা ভক্ষণ করিয়া মরিয়া যায়। মত্ত অবস্থায় ইহারা পাথর, বালি, হাড় এবং ধাতুজ দ্রব্য সকল ভক্ষণ করে। কিন্তু বীজ, জাম প্রভৃতি ছোট ছোট ফল, গাছের পাতা এবং ফড়িং ইহাদের স্বাভাবিক খাদ্য।

একটি পুরুষ পক্ষীর ২।৩টি স্ত্রী থাকে। তাহারা সকলেই একস্থানে স্তূপাকার করিয়া ডিম্ পাড়ে। ডিম পাড়িবার জন্য কোন প্রকার বাসা নির্ম্মাণ করে না; একটু বালি খুঁড়িয়া গর্ত্ত করে এবং এই গর্ত্তের মধ্যেই ডিম রাখিয়া তা দেয়। স্ত্রী, পুরুষ উভয়ে এক এক করিয়া ক্রমান্বয়ে ছয় সপ্তাহ পর্য্যন্ত ডিমে তা দেয়। যদি ডিম ফুটিতে দেরী হয়, তবে পুরুষ পক্ষী রাগান্বিত হইয়া, বুকের চাপে ডিম ভাঙ্গে এবং তাহা হইতে ছানা বাহির করে। এই প্রকারে ছানাগুলি জন্মিবার সময় বিশেষ কষ্ট পায়।

ইহাদের পাখা দ্বারা ইউরোপের এবং আমেরিকার ভদ্র মহিলারা নানা প্রকার বেশভূষা করেন। বড় বড় যুদ্ধে যে সকল বীরপুরুষ জয়ী হইয়া দেশে প্রত্যাগমন করেন, তাঁহারা সম্মানের চিহ্নস্বরূপ উট-পক্ষীর পাখা মুকুটে ধারণ করেন। এই পাখার এত আদর এবং এত কাট্তি যে প্রতি বৎসরে প্রায় ৬০ লক্ষ টাকার মূল্যের পালক আফ্রিকা হইতে ইংলণ্ডে রপ্তানি হয়। এই সমুদয় কারণে উট-পক্ষী শিকার করিবার জন্য নানাপ্রকার কৌশল ব্যবহৃত হয়। লিবিয়া দেশে সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যরূপে উট-পক্ষী শিকার করা হয়। একজন লোক ধনুর্ব্বাণ সঙ্গে লইয়া একটি মৃত উট-পক্ষীর চর্ম্মে সমস্ত শরীর আবৃত করে। গলার চামড়ার মধ্যে এক হাত দিয়া ঠিক উটপক্ষী যেমন ঘাড় উচু করিয়া যায় ইহারাও সেইরূপ যায়। ঠিক উট-পক্ষীর ন্যায় চলিয়া বেড়ায়; কখন ঘাড় নিচু করে, কখন বা গলা টান্ করিয়া মুখ উচু করে, আবার কখন বা ছট্ ফট্ করিয়া পাখা নাড়ে। এই প্রকার বেড়াইতে বেড়াইতে উট-পক্ষীর দলে মিশে। উট-পক্ষীরা প্রতারণা বুঝিতে পারে না। শিকারী যখন কোন পাখীর অতি নিকটে উপস্থিত হয় তখন তাহার প্রতি তীর নিক্ষেপ করে। পাখী চীৎকার করিতে করিতে পড়িয়া যায়; শিকারী কিন্তু আবার উট-পক্ষীর ন্যায় ঘুরিয়া বেড়ায়। এই প্রকার একে একে সমুদায় পাখী বধ করে।

মরক্কো দেশে শিকারীরা ঘোড়ায় চড়িয়া শিকার করে। শিকারীরা এক দল উট-পক্ষীর পিছু পিছু ঘোড়া চালায়। এবং আর এক দল উটপক্ষীরা যে দিক দিয়া যাইবে সেই পথে লুকাইয়া থাকে। উটপক্ষীরা বৃত্তাকারে দৌড়ায় শিকারীরা ইহা জানিয়াই পূর্ব্বোক্ত ভাবে দুই দল দুই স্থানে থাকে। শেষোক্ত দলের নিকট উট-পক্ষীরা উপস্থিত হইলেই শিকারীরা তীরের দ্বারা এই পক্ষীদিগকে বিনাশ করে। কোন কোন স্থানে উট-পক্ষীরা যেখানে জল খাইতে যায় সেই স্থানে শিকারীরা লুকাইয়া থাকে; যেই পক্ষীরা জল খাইতে আসে আর অমনি শিকারীরা তীর দিয়া এই নিরপরাধী পক্ষীদিগকে বধ করে। আবার কোন কোন স্থানে শিকারীরা উট-পক্ষীরা যেখানে ডিম পাড়ে সেই স্থানে গিয়া ডিমগুলি সরাইয়া নিজেরা বালীর নীচে

লুকাইয়া থাকে। কেবল মাত্র চক্ষু দুইটী বাহিরে রাখে। যেমন পক্ষীগুলি ডিমে তা দিতে আসে আর অমনি তাহাদিগকে বধ করে। এইরূপ নানাবিধ উপায়ে ইহাদিগের বংশ ধ্বংস করা হইতেছে।

কোন কোন জাতি এই পক্ষীর ডিম খায়। মাংস পর্য্যন্তও বাদ যায় না। পূর্ব্বকালে রোম-নগরে এই পক্ষীর মাংসের বড় আদর ছিল। শুনা গিয়াছে এক রাজা একদিন এক মহোৎসবের জন্য ৬০০ এই নির্দ্দোষী পক্ষীর প্রাণবধ করাইয়াছিলেন।

সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য এই যে আফ্রিকায় এক্ষণে কলে উট-পক্ষীর ডিমে তা দেওয়া হয়। কলে যে সমুদায় ছানা হয় তাহারা বেশ সবল এবং সুস্থ হয়, তাহাদিগকে অতি যত্নে পালন করিতে হয়। মাতার নিকট থাকিলে তাহারা যে ভাবে বাস করে, তাহাদিগকে ঠিক সেই ভাবে রাখা হয়।

পূর্ব্বে উট-পক্ষীর পৃষ্ঠে মানুষ বেড়াইত। রোমের মহিলারা গৃহ-পালিত উট-পক্ষীর পৃষ্ঠে চড়িয়া হাওয়া খাইয়া বেড়াইতেন। এখনও কোন কোন স্থানে ইহার উপর মানুষ চড়িয়া বেড়ায়। ইহা দ্বারা কোন কোন স্থানে গাড়ীও টানা হয়।

উট-পক্ষী প্রায়ই ধবল রঙ্গের দেখিতে পাওয়া যায়। দুই তিন প্রকারের উটপক্ষী দেখিতে পাওয়া যায়। এক এক জাতি এক এক প্রকার রঙ্গের হয়।

নীতি কথা।

১। একখণ্ড লৌহ ফেলিয়া রাখিলে মরিচা ধরিয়া তাহা নষ্ট হইয়া থাকে; কিন্তু ব্যবহার করিলে তাহার উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি হয়। দেখ, ব্যবহৃত চাবিগুলি কেমন পরিষ্কার। সেইরূপ পরিশ্রম অপেক্ষা আলস্য মনুষ্যের শরীরকে অধিক বিকৃত ও অকর্ম্মণ্য করে।

২। পরিশ্রম সৌভাগ্যের দ্বার-স্বরূপ। দরিদ্রতা আলস্যের চির-সহচর।

৩। বর্ত্তমান কালে যে কাজ করা যাইতে পারে ভবিষ্যতে করিব বলিয়া তাহা ফেলিয়া রাখিও না। কেননা বর্ত্তমান তোমার আয়ত্ত্বাধীন, কিন্তু ভবিষ্যতের উপর কি কখন নির্ভর করিতে পার? "করিবার যাহা, আশু কর তাহা, বিলম্ব উচিত নয়।"

৪। ঘষিতে ঘষিতে প্রস্তরও ক্ষয় হয়। কোন কার্য্য একবারে সম্পন্ন করিতে না পারিলে ভগ্নোৎসাহ হইও না; পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিলে নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হইবে।

৫। ইচ্ছা থাকিলে উপায়ের অভাব হয় না। ইচ্ছা হইতে প্রতিজ্ঞা জন্মে এবং প্রতিজ্ঞা দৃঢ় হইলে কার্য্য-সিদ্ধি নিশ্চিত।

৬। একটী সংস্কৃত শ্লোকে কথিত আছে, হস্তী দেখিলে সহস্র হস্ত দূরে, ঘোটক দেখিলে শতহস্ত দূরে, এবং শৃঙ্গবিশিষ্ট জীবদিগ হইতে দশ হস্ত দূরে সরিয়া দাঁড়াইবে; কিন্তু দুর্জ্জনদিগের সহিত দেখা হইলে সেস্থান পরিত্যাগ করাই শ্রেয়। কুসংসর্গ যে উন্নতির ভয়ানক প্রতিবন্ধক তাহা কে অস্বীকার করিবে?

৭। তুমি কিরূপ লোকের সহিত বাস করিয়া থাক জানিতে পারিলে তোমার স্বভাব কিরূপ আমি বলিতে পারি। সংসর্গ দোষে কত সাধু ব্যক্তির স্বভাব বিকৃত হইয়াছে কে গণনা করিবে?

৮। ছাত্রদিগের অধ্যয়নই তপস্যা, পূর্ব্বকালে মুনি ঋষিরা যেরূপ একাগ্র চিত্তে সর্ব্ব প্রকার বিলাসের ভাব দূর করিয়া ধর্ম্ম সাধন করিতেন, অধ্যয়নকালে ছাত্রদিগের সেইরূপ একাগ্র ও সুখস্পৃহাশূন্য হওয়া আবশ্যক। কবি বলেন

"কাঁটা হেরি ক্ষান্ত কেন কমল তুলিতে,
দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহীতে?"

৯। শারীরিক সুস্থতার জন্য যেরূপ যত্ন করিয়া থাক, মানসিক সুস্থতার প্রতিও সেইরূপ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। ক্রোধ, হিংসা, প্রভৃতি মনের ব্যাধি-স্বরূপ। এতদ্দ্বারা বিকৃত হইলে, মনের ধারণাশক্তি হ্রাস হয় এবং বিদ্যোপার্জ্জনের পক্ষে ভয়ানক প্রতিবন্ধক জন্মায়।

১০। শুধু বিদ্যালাভ করিলে প্রকৃত মনুষ্যত্ব জন্মে না। স্বভাব বিশুদ্ধ হওয়া চাই। দুর্জ্জন বিদ্যালঙ্কৃত হইলেও ঘৃণার পাত্র। মণিবিশিষ্ট সর্প কি ভয়ানক নহে?

সততা।

আমাদের দেশের অন্ধদের জীবন ভিক্ষার উপরই নির্ভর করে; কিন্তু বিলাতে অন্ধ ব্যক্তিদের অবস্থা অন্যরূপ, তাহারা লেখা পড়া শিখিয়া বা অন্য কোন প্রকার কাজ কর্ম্ম করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। একটী অন্ধ বালিকার সততা সম্বন্ধে একটী গল্প বলি।

বিলাতে সময়ে সময়ে ভয়ানক কুয়াশা হয় এবং এইজন্য দিন রাত্রির মত হয়। দিনে বাতি না জ্বালাইলে কিছুই দেখা যায় না। যে সময়ে দিনের বেলায় শ্রমজীবীদের বাতি জ্বালাইয়া কাজ কর্ম্ম করিতে হয় সেই সময়ে কোন কোন জিনিসের দর চড়িয়া যায়। বাতি জ্বালাইতে যে অতিরিক্ত খরচ হয় তাহা পোষাইবার জন্যই চড়া দরে জিনিস বিক্রী করিতে হয়। একবার এইরূপ কুয়াশার সময়ে একটী অন্ধ বালিকা ঝুড়ি বুনাইয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। অন্ধের দিন রাত্রি সবই সমান। কুয়াশার জন্য তাহার বাতি ক্রয় করিতে হয় নাই এবং কাজে কাজেই অতিরিক্ত খরচও কিছুই হয় নাই।

কুয়াশার জন্য তখন বিলাতে ঝুড়ীর দর চড়িয়া গিয়াছে। চড়া দরে ঝুড়ী বিক্রী করিয়া যে অতিরিক্ত লাভ হইয়াছিল তাহা এই অন্ধ বালিকাটী এক ধর্ম্ম প্রচারকের নিকট লইয়া উপস্থিত হইল। বলিল "এ অতিরিক্ত লাভ আমার প্রাপ্য নহে; কারণ কুয়াশার জন্য আমার বাতি জ্বালাইতে হয় নাই। এ অতিরিক্ত লাভ পরের কল্যাণ সাধনার্থ ব্যয়িত হওয়া উচিত।" এই রূপ যাহার সততা তিনিই ধন্য।

গরিব হইয়াও যদি সাধু হওয়া যায় তাহা হইলে লোকের নিকট গণ্য মাণ্য হওয়া যায়। সকলেরই সৎ হইবার জন্য সর্ব্বপ্রথম চেষ্টা করা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। সকলের জীবনে দুইটী উদ্দেশ্য থাকা উচিত; প্রথম উদ্দেশ্য লেখা পড়া শিখিয়া জ্ঞান বৃদ্ধি করা, দ্বিতীয় উদ্দেশ্য সৎ পথে থাকিয়া সাধুভাবে জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য চেষ্টা করা।

সেপ্টেম্বর মাসের ধাঁধার উত্তর।

১। টেলিগ্রাফ্।

২। ১ম পুত্র ৯টী; ২য় পুত্র ৬টী এবং ৩য় পুত্র ২টী ঘোড়া পাইবে।

সখা।
তৃতীয় ভাগ। ১২শ সংখ্যা।
ডিসেম্বর, ১৮৮৫।

শিশুর হাসি।

(১)

হাসরে আবার ছেলে হাস একবার,
হাসি মুখখানি তোর বড় ভালবাসি;
ফেলিয়া ঘরের কাজ তাই বার বার,
দেখিবারে আসি তোর আহ্লাদের হাসি।

(২)

অমল বদনে দুটী কমল নয়ন
আনন্দে যখন আহা করে ঢল ঢল;
নিরখি সে শোভা হয় পুলকিত মন,
আহ্লাদে ফুটিয়া উঠে হৃদয় কমল।

(৩)

মধুর অধরে মিষ্ট আধ আধ স্বরে
কি বল তখন, কিছু বুঝিতে না পারি;
কিন্তু সেই সুধা রব হৃদয় ভিতরে
ঢালি দেয় শত ধারে যেন শান্তি বারি।

(৪)

ধরিয়া তোমায় বক্ষে পরম যতনে
জাগিয়া পোহাই নিশা রোগের সময়;
অনাহারে থাকি কভু অম্লান বদনে,
তোমা লাগি মার প্রাণে সব দুঃখ সয়।

(৫)

কিম্বা তোর হাসি মাখা চাঁদ মুখখানি
না হেরিলে ভস্মে প্রাণ করে রে ক্রন্দন;
না শুনিলে একদিন ও মুখের বাণী,
অন্ধকার জ্ঞান হয় সকল ভুবন।

(৬)

হাসি হাসি কর খেলা শুইয়া শুইয়া,
কও কথা মৃদু মৃদু পাখীর মতন;
আদরে ও মুখ খানি চুম্বন করিয়া
স্নেহ ভরে বার বার দিই আলিঙ্গন।

(৭)

কোথাকার হাসি এই, কি ভাবের ভাষা
না জানি ভিতরে তোর আছে কোন জন!
যত দেখি শুনি তত বাড়ে যে পিপাসা,
এ নয় অন্যের খেলা খেলে নিরঞ্জন।

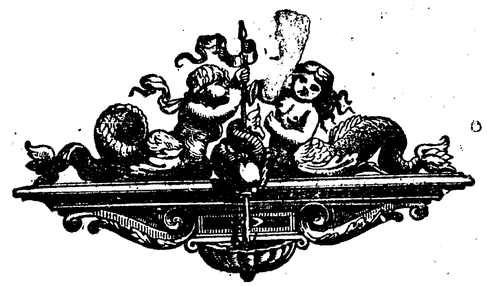

ফুল।

যখন রাত্রি ভোর হয়, পাখীগুলি বাগানে কেমন সুন্দর গান গাহিতে থাকে; এই সময়ে আমার ঘুম ভাঙ্গে ভাঙ্গে অথচ ভাঙ্গে না, কিন্তু বেশ বুঝিতে পারি যে সরোদিদি আর পিসীমা বিছানা ছাড়িয়া চলিয়া যান। একটু পরে আমিও উঠি; সরোদিদিকে খুঁজিতে খুঁজিতে দেখি যে, সে আর পিসীমা ফুলের বাগানে সাজি ভরিয়া ফুল তুলিতেছে। আমি সরোদিদির আঁচল ধরিয়া পিছু পিছু যাই আর নিচুতে যে সকল ফুল ফুটে, তার দু একটা দৌড়িয়া তুলি।

কিন্তু প্রত্যহ দেখি যে পিসীমা ফুলগুলি একখানি পরিষ্কার তামার বাসনে রাখেন; এবং ঐ গুলি দিয়া গম্ভীর ভাবে শিবপূজা করেন। আর সরোদিদি ফুলগুলি দিয়া [illegible] মালা গাঁথে; একছড়া গলায় পরে আর একছড়া নিজে খোঁপায় পরে।

আমি অনেক দিন ভাবিয়াছি একই ফুল দুই [illegible] কেন? আমি ভাবিয়া কিছু স্থির করিতে না পারিয়া একদিন পিসীমাকে জিজ্ঞাসা করিলাম "তুমি ফুলগুলি দিয়া [illegible] কর কেন? [illegible] থাকাতেও [illegible] শোভা হয়; আর না হয় আমাদের দিও আমরা দুই ভাই বোন মালা গাঁথিয়া গলায় পরিব।"

পিসীমা প্রথমে হাসিয়া বলিলেন "বাছা বড় হও, বুঝিবে ফুল কি জিনিস।" এই বলিয়া একটী গোলাপফুল হাতে ধরিলেন এবং তাহার দিকে চাহিয়া চাহিয়া যখন তাঁহার চক্ষু হইতে জল পড়িতে লাগিল তখন "ভগবান্, তুমিই ধন্য" বলিয়া সেই তামার বাসনে অতি ধীরে ফুলটী রাখিলেন। আমি ভাবিলাম একি! ফুল দেখিয়া পিসীমা কান্দিলেন কেন?

যাহাহউক আমি তখনই সরোদিদির নিকট যাইলাম; যাইয়া দেখি সে কি একখানা বই পড়িতেছে আর ফুলের মালা হাতে ধরিয়া এক দৃষ্টে দেখিতেছে। আমি অবাক্ হইলাম, ভাবিলাম ফুল কি এমনই পদার্থ যে পিসীমা দেখিতে দেখিতে কান্দিয়া ফেলিলেন আবার সরোদিদিও ফুল দেখিয়া এমনি অন্যমনস্ক হইয়াছে যে আমি ঘরে ঢুকিয়াছি তাহা টেরও পেলে না! করি কি, সরোদিদি বলিয়া ডাকিলাম। ডাকিবা মাত্র সে এমন ভাবে আমার দিকে চাহিল যেন সে ভয়ানক স্বপ্ন দেখিতেছিল। আমি ঐ ফুলের কথা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আর পিসীমাকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহাও বলিলাম। সরোদিদি যে বই খানা পড়িতেছিল তাহার পাতা খুঁজিয়া এই কথা কয়টি পড়িল।

"কিন্তরে কুসুম! আর্য্যসুতগণে
দিয়াছে তোমারে দেবতা চরণে,
ঠিক ব্যবহার, সেই রে তোমার
সেই রে সদ্গতি ভাবি মনে মনে;
এমন পবিত্র এমন কোমল
দেবপদ ভিন্ন কোথা যাবে বল?
তোমার মহিমা মানব জানেনা
তব গুণগ্রাহী সুধু দেবগণে।"

আর বলিল "দেখ বিজয় আমি স্কুলে এই বইখানি পড়ি। আজ এই কয়টি কথা যখন পড়িলাম, তখন ভাবিলাম হায়! আমাদের চক্ষু নাই। প্রত্যহ ফুল বাগানে ঘুরিয়া বেড়াই, কত ফুল তুলি, মালা গাঁথি, গলায় পরি, তবু ফুলের জন্ম কেন তাহা বুঝিলাম না।" এই বলিয়া সে চুপ করিয়া রহিল আর ফুলের মালা এক দৃষ্টে দেখিতে লাগিল।

আমি সরোদিদির ঐ কথা কয়টি মুখস্থ করিয়া রাখিয়াছি। যখনই ফুল বাগানে যাই তখনই ঐ কথা কয়টির অর্থ বুঝিবার জন্য চেষ্টা করি। অনেক দিবস চিন্তা করিয়া এখন বেশ বুঝিয়াছি যে পিসীমার কান্দিবার কারণ আছে। আমি যত জিনিস দেখিয়াছি, তাহার মধ্যে ফুলই সর্ব্বাপেক্ষ সুন্দর। ফুল কাহারও আদর চায় না। সে আপনমনে ফুটে আবার আপনি শুকাইয়া যায়। ফুল দেখিলে চোখের তৃপ্তি হয়, তাহার সঙ্গে সঙ্গে মনেরও তৃপ্তি হয়। ফুলের জন্ম মালার জন্য নহে, সরোদিদির খোপার জন্যও নহে। ফুল কোথায় না আছে? সকল দেশে সকল সময় ফুল দেখিতে পাওয়া যায়। এমন সুন্দর জিনিস যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি যে সর্ব্বত্র ইহা ছড়াইয়া রাখিয়াছেন, তাহার অবশ্য কোন বিশেষ কারণ আছে। সে কারণটি যখনি ভাবি তখনই পিসীমার চোখের জল আর সরোদিদির সেই কেমন এক ভাব মনে পড়ে আর ভাবি যিনি সরোদিদির বইতে এমন সুন্দর কথা কয়টি লিখিয়াছেন তিনি আমাদের পূজনীয়, তিনি আমাদের শিক্ষা-কর্ত্তা। আমি যখনই ফুলের নিকট যাই তখনই যেন সে আমাকে হাসিয়া হাসিয়া বলে "বিজয়, দেখ আমি কেমন সুন্দর, আমাকে যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি কত সুন্দর তাহা সহজেই বুঝিতে পার। আবার দেখ তাঁহার কেমন দয়া, তিনি তোমাদের তৃপ্তির জন্য এমন সুন্দর জিনিসকে পৃথিবীর সর্ব্বত্র রাখিয়াছেন। অতএব তাঁহাকে কখন ভুল'না।"

"মা তো তবে মরিয়া যায়?"

প্রতিভার বয়স ১০ বৎসর। সে স্কুলের মধ্যে একটী ভাল মেয়ে, পড়া শুনায় তার মত আর একটীও নাই বলিলে হয়। দেখিতে বড়ই সুন্দর—যে তাহাকে এক দিন স্কুল থেকে আস্‌তে দেখে সেই অবাক্ হয়ে খানিক ক্ষণ চেয়ে থাকে। এমন শান্ত মূর্ত্তি, এমন হাসি হাসি মুখখানি, এমন সুগোল চক্ষু দুটী, ক্লাশের অন্য মেয়েদের আর কাহারও নাই। সকল মেয়েদের সঙ্গে কেমন ভালবাসা! চমৎকার! দেখিতেও যেমন স্বর্গের দেব্‌তাদের মেয়ের মত, গুণেও তেমনি। গ্রামের মধ্যে প্রতিভার নাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে, এমন রত্ন আর কোথা নাই! আহা! ধন্য তার মা, যাঁর ভাগ্যে এমন মেয়ে পরমেশ্বর দিয়াছেন। তাহারই মুখ চেয়ে বিধবা পতির শোক ভুলিয়া আছেন।

কাহারও সুখ্যাতি করা বড় সুখের কাজ। কিন্তু নিতান্ত দুর্ভাগ্য সে যে কাহারও দোষের কথা প্রকাশ করে। সত্যের জন্য কিন্তু আমরা

আজ এক দিকে যেমন প্রতিভার গুণ গুলির প্রশংসা করিলাম, যদি তেমনি আবার তাহার যে একটি ভয়ানক দোষ ছিল সেটী না বলি তা হলেত ঠিক উচিত হয় না। তাই বলিতে হইল। অল্প বয়সে পিতা মরিয়া যাওয়ায় প্রতিভা মার বড়ই আদরের সামগ্রী হইয়াছিল। এজন্য মা তাহাকে একেবারে [illegible] প্রাণের অপেক্ষাও অধিক [illegible]। ভোরে উঠিয়া আগে খাবার [illegible] উঠাইতেন। মুখ হাত [illegible] ভাল কাপড় পরাইয়া বাড়ীর পাশের বাগানটিতে বসিয়া তাহাকে আপনি খাবার খাওয়াইয়া দিতেন। তার পর পণ্ডিত মহাশয় পড়াইতে আসিলে তাহাকে পড়িতে পাঠাইয়া দিয়া ভাত খাওয়ানের আয়োজন করিতেন। পড়া হইলে আপনি খাওয়াইয়া ধুয়াইয়া স্কুলে পাঠাইয়া দিতেন ও যতক্ষণ দেখা যাইত বাড়ীর ছাত হইতে সেই দিকে চাহিয়া থাকিতেন। তারপর [illegible] ও আপনি আহার করিয়া ছুটী হইবার সময়ে আবার ছাতে বসিয়া কখন প্রতিভার গাড়ী বাড়ী আসিবে সেই অপেক্ষা করিতেন। মা কোথায় না ছেলে মেয়েকে ভাল বাসে?—কিন্তু প্রতিভার মা তাকে যে কি চক্ষে দেখেছেন সে বলা যায় না, সে আর কেহ বুঝিতেই পারে না। এত আদরের বলিয়া প্রতিভাকে কেহ কখন কোন রূপে তিরস্কার করিতে পাইত না। পড়া শুনা উত্তম হইত বলিয়া বিদ্যালয়েও কখন শাস্তি পাইতে হইত না। এজন্য সে কিছু বেশী একগুঁয়ে হইয়া পড়িয়াছিল। যা ধরিত তা চাই ই চাই, না হলে কাহারও নিস্তার নাই। বুঝাইলেও বুঝিবে না, বলিলেও শুনিবে না,—ভয়ানক আব্দার! এজন্য মাকে বড়ই কষ্ট পাইতে হইত। মধ্যে মধ্যে রাগে এমনি অজ্ঞান হইয়া যাইত যে মাকে মারিয়া আঁচড়াইয়া কামড়াইয়া রক্তপাতই করিয়া দিত। মুঠা করিয়া মাথার চুল ছিঁড়িয়া দিত। তবুও মা কিছু বলিতেন না। যা চাহিত, দিতেন আর নির্জ্জনে কাঁদিতেন। তাঁহাকে শাসন করিতে বলিলে বলিতেন "জ্ঞান হইলেই ভাল হইয়া যাইবে। যদি বাঁচিয়া থাকে, তবে চির দিন ওরূপ বুদ্ধি থাকিবে না।" কি আশ্চর্য্য! যে মেয়ে অন্য সময়ে এমন মধুময় কথা বলে, এমন চমৎকার পড়া করে, সমবয়স্কা বালিকাদের সঙ্গে এমন ভালবাসা যার,—সেই আবার বাড়ীতে এমন! এদিকে মা না হলে যার এক দণ্ড চলে না, মার হাতে না হলে যার খাওয়াই হয় না, মা ভাত মেখে দিবেন, মাছ বাছিয়া দিবেন, কোলে করিয়া ঘুম পাড়াইবেন,—এ না হইলে যার এক দিন চলে না, সেই সোণার পুতুলই আবার রাগ হলে যেন আর একজন! যেন ঘাড়ে কি ভূত চাপে! আশ্চর্য্য!

উপরে যে দোষের কথা বলা হইল, তাহাই যথেষ্ট। এক কলসী দুধে এক ফোঁটা দৈ পড়িলেই সব দুধ নষ্ট হইয়া যায়। আমাদের পাঠক পাঠিকাগণ সকলেই প্রতিভার প্রতি বিরক্ত ও তাহার চরিত্রের জন্য খুব দুঃখিত হইতেছেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু বেচারা কি করিবে? অনেক দিনের অভ্যাস যায় না; আর যাবার জন্য মাও কোন বিশেষ চেষ্টা করেন না। তার মনে হইত মাকে ঐ রকম করিয়াই ব্যবহার করা উচিত। অন্যায় প্রেম! আশ্চর্য্য কু-বুদ্ধি!!

সে দিন এক ঘটনা হইয়া গিয়াছে। না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। স্কুলের ছুটীর পর বিমলাদের বাড়ীতে যাবার কথা আছে। মাকেও বলিয়া আসিয়াছে। স্কুলের ছুটী হইলে বিমলা প্রতিভার গলাটী জড়াইয়া মনের আনন্দে

আপনাদের বাড়ীর দিকে চলিয়াছে। পথে যে মেয়ের সঙ্গেই দেখা হয় সেই আসিয়া প্রতিভার সোণার হাত ধরিয়া এক গাল হাসিয়া বলে "কি ভাই! আজ যে আমাদের পাড়ায়?" প্রতিভাও মধুর হাসি হাসিয়া উত্তর করে—"আজ ভাই! বিমলার মা যেতে বলেছেন, তাই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাব।"

বিমলাদের বাড়ী বড় দূরে নয়। সন্ধ্যার অনেক পূর্ব্বে সেখানে পৌঁছিল। বিমলার মা প্রতিভাকে দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইলেন। কতক্ষণ কোলে করিয়া ঘন ঘন মুখে চুম্বন করিতে লাগিলেন ও পড়ার কথা ও মার কথা সব জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। প্রতিভাও স্বাভাবিক নম্র মধুর ভাবে সমস্ত কথার উত্তর দিল। তার পর তিনি দুজনকে গা হাত পা ও মুখ ধোয়াইয়া এবং মুছাইয়া দিয়া খাবার দিলেন। খাওয়া হইলে সন্ধ্যার পূর্ব্বে দুজনকে সঙ্গে লইয়া তাহাদের বাড়ীর নিকট বেড়াইতে গেলেন। বাগানের এক পার্শ্বে একটী ভাঙ্গা কুঁড়ে ঘর। সেই ঘর হইতে কে যেন কান্নার মত স্বরে গান করিতেছে। প্রতিভা জিজ্ঞাসা করিল "ওখানে কে, খুড়ীমা?" খুড়ীমা বলিলেন "ও একটা পাগল মেয়ে।" তখন প্রতিভার তাহাকে দেখিতে বড় ইচ্ছা হইল। তিন জনেই আস্তে আস্তে কুটীরের দ্বারে উপস্থিত হইলেন। দেখিতে পাইয়াই পাগলী বলিয়া উঠিল "কে ও? মা আস্‌ছে? এস এস। আমার মা এস। একি? এক—দুই—তিন? তিন মা? এক হারিয়ে তিন পেলাম? হাঁগা? তোমরা কি আমার মা গা? সত্যি করে বল, তিন জন কি মা? তিন জনই?—কৈ, না, না। আমার মা তোমাদের মত নয়। তাঁর চেহারা কি ও রকম? আমি সন্ধ্যাবেলা চিন্‌তে পারি নি। আমার মা স্বর্গের মা।

আহা! মা গো! মা!
ওগো আমার মা!

কোথায় তুমি মা ?
আমি যাব মা ! ”—

বিমলা ও তাহার মা জান্‌তেন, তাঁদের কাছে পুরাতন কথা ; সুতরাং তাঁরা কেবল চেয়ে রই-লেন আর শুনলেন। প্রতিভা আর কখন এ রকম দেখে নাই, শুনেও নাই। সে অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল, তাহার গায়ে কাঁটা দিল, সে কাঁদিতে লাগিল।

পাগলী তার পর [illegible]রের মেজেতে শুইয়া পড়িল। “এই খানে, মা আমার শুয়ে থাকতেন! [illegible]! এ যে আমার রাজ অট্টালিকা। ঠাকুরুণ গো, তোমরা কি এমন বাড়ীতে কখন থাকতে পাও? হিম। তা আর হয় না। তোমাদের কি আমার মত মা আছে? এমন বিছেনা? হা! হা!

আমার মা কোথা আছেন
আমার মা সেথা আছেন
আমার মা স্বর্গে গেছেন
আমায় ডেকে নে যাবেন।”

ক্রমে সন্ধ্যা হয়ে এল। পাগলীর অবস্থা দেখে প্রতিভার প্রাণ গলিয়া গেল। তাহার চক্ষু দুটীর জলে গাল ভাসিয়া গেল। গাল বহিয়া গড়াইয়া [illegible] জল বুকে পড়িতে লাগিল। সে দিকে [illegible] নাই। কেবলই পাগলীর শুষ্ক আলুথালু ধূলা মাখা চুল, [illegible] ছাইএর মত ক্ষীণ [illegible] পরিধানের ছেঁড়া নেকড়া খানি,— এই সব দেখিতে বালিকা নিমগ্ন। খুড়ীমা ডাকি-লেন। চক্ষু মুছিয়া প্রতিভা চুপ্‌টী করিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। পথে যাইতে যাইতে পাগলীর কথা সব বলিতে লাগিলেন। কেমন সে মায়ের বড় আদরের মেয়ে ছিল, কেমন তাহার মা তাহাকে ভাল বাসিত, তার পর জ্বর হইয়া মা মরিয়া গেল, আর সে অবধি মেয়েটী পাগল হইয়া গিয়াছে। পাড়ার লোক দয়া করিয়া কিছু কিছু খাবার দিয়া যায়। তাই ইচ্ছা হইলে একটু খায়। আর দিন রাত পড়িয়া কাঁদে আর “মা মা” করে।

একটীও কথা না কহিয়া প্রতিভা সমস্ত শুনিল। “মা তো তবে মরিয়া যায়?” তাহার মনে হইল। রাত্রে বাড়ী আসিল। মা কোলে করিলেন, কোলের ভিতর মাথা লুকাইল, প্রায় অর্দ্ধেক রাত অবধি ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া খুব কাঁদিল। মা কত কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, কত বুঝাইলেন; কোন ফল হইল না। কাঁদিয়া কাঁদিয়া অবসন্ন হইয়া ঘুমাইয়া পড়িল। তার পর দিন থেকে প্রতিভা ২।১ দিন অবধি মার মুখ পানে তাকা-ইতে পারিত না, স্কুলে যাইত না, কেবলই কাঁদিত। শেষে সমস্ত কথা বলিয়া ফেলিল। আর কখন মার মনে কষ্ট দেয় নাই। পাগলীকে দেখিয়া পাগলীর অবস্থা হইতে কেমন শিক্ষা পাইল। এখন প্রতিভা সোণার প্রতিমা, সকল প্রকারেই স্বর্গের দেবী।

প্রকৃত বন্ধু।

ন এক ধনী সওদাগরের একটী মাত্র পুত্র ছিল; তাহাকে তিনি প্রাণের সহিত ভাল বাসিতেন এবং ছেলেবেলা হইতেই তাহার শিক্ষার জন্য বিশেষ যত্ন লইতেন।

পিতার আন্তরিক ভালবাসা এবং যত্ন সত্ত্বেও পুত্রের পড়া শুনার দিকে মন আকৃষ্ট হইল না; সৎপথে থাকিয়া জ্ঞান উপার্জ্জনের দিকে মতি হইল না। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নানা প্রকারের বদ লোক বন্ধু বলিয়া পরিচিত হইতে লাগিল। পিতা এই সমুদয় দেখিয়া শুনিয়া মনে বড়ই কষ্ট পাইলেন এবং এক দিন পুত্রকে ডাকিয়া বলিলেন:—“এই সংসারে প্রকৃত বন্ধু বড়ই দুর্লভ; প্রকৃত বন্ধুর অভাবে সুখী হওয়া যায় না। এই যে এত টাকা কড়ি দেখিতেছ, যদি তুমি মিতব্যয়ী না হও তাহা হইলে উহা সমস্তই উড়িয়া যাইবে; এবং টাকা কড়ির দ্বারা যত সুখ পাইতেছ সমুদয়ই ফুরাইবে। কিন্তু তুমি যদি প্রকৃত বন্ধু পাও তাহা হইলে চিরকালই তাহার সঙ্গে সুখে থাকিবে। টাকা কড়ি, ধন সম্পত্তি সমস্তই ব্যবহার দোষে তোমা হইতে বিচ্ছেদ হইতে পারে, কিন্তু তোমার প্রকৃত বন্ধু চিরকালই তোমার বন্ধু থাকিবেন; সম্পদে, বিপদে সকল সময়েই তোমার দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ হইয়া কার্য্য করিবেন। অতএব তুমি সংসারে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে এক জন প্রকৃত বন্ধু খুঁজিয়া লও। গৃহে বসিয়া এ কার্য্যে কৃতকার্য্য হইতে পারিবে না; এই জন্য তোমাকে বলি যে পৃথিবীর সর্ব্বত্রই ভ্রমণ করিয়া নানা দেশীয় লোক জনের সহিত আলাপ পরি-চয় কর। যত তোমার বহুবিধ লোকের সহিত আলাপ পরিচয় হইবে ততই তোমার জ্ঞান অধিক হইবে এবং তুমি অনায়াসেই অনেক লোকের মধ্যে একজন প্রকৃত বন্ধু খুঁজিয়া লইতে পারিবে। আমার ইচ্ছা যে তুমি আমার এই উপদেশ শুন এবং এখনই কার্য্যে প্রবৃত্ত হও।”

পুত্র পিতাকে প্রণাম করিয়া গৃহ হইতে বাহির হইল; এবং কয়েক ঘণ্টা পরেই ফিরিয়া আসিল। পুত্রকে এত শীঘ্রই ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া পিতা বলিলেন “তুমি যে এত শীঘ্র ফিরিয়া আসিবে আমি তাহা কখন স্বপ্নেও ভাবি নাই।” পুত্র নম্রভাবে উত্তর করিল “আপনি আমাকে একটী প্রকৃত বন্ধু খুঁজিয়া লইবার আদেশ করিয়াছেন, কিন্তু আমি যখন এত অল্প সময়ের মধ্যেই ৫০ পঞ্চাশ জন বন্ধু পাইয়াছি তখন দেশ দেশান্তরে আর যাইবার দরকার কি?”

পিতা কিছু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন “যাহাদিগকে তুমি বন্ধু বলিয়া মনে করিতেছ তাহারা কখনই প্রকৃত বন্ধু নহে; মাতালেরা বোতলে যতক্ষণ মদ থাকে ততক্ষণ বোতলের কত প্রশংসা করে এবং যেই মদ নিঃশেষিত হয় আর অমনি বোতলটী মাটিতে ফেলিয়া দেয়। ইহা তুমি বোধ হয় নিজেই দেখিয়াছ। যতক্ষণ তোমার টাকা কড়ি থাকিবে ততক্ষণ অনেকেই তোমার প্রকৃত বন্ধু বলিয়া পরিচয় দিবে। যাহাদিগকে তুমি প্রকৃত বন্ধু বলিতেছ তাহা-দিগকে কি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছ?” পুত্র

পিতার এই কথাগুলি শুনিয়া কিছু দুঃখিত হইয়া বলিল "আপনি কেন সন্দেহ করিতেছেন? আমি যাঁহাদিগকে বন্ধু বলিতেছি তাঁহারা আমার সম্পদের সময়ে যেমন ব্যবহার করিবেন বিপদের সময়েও ঠিক সেইরূপ আচরণ করিবেন, আপনি ইহা স্থির নিশ্চয় জানিবেন।"

পিতা বলিলেন:—"আমার ৬০ বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছে; আজ বাদে কাল মরিতে হইবে; প্রকৃত বন্ধু পাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু মনের মত প্রকৃত বন্ধু মিলিল না। তুমি এত অল্প বয়সেই কেমন করিয়া বলিতেছ যে পঞ্চাশ জন বন্ধু পাইয়াছ তাহা বুঝি না। প্রকৃত বন্ধুকে কিরূপ করিয়া পরীক্ষা করিতে হয় তাহার একটী উপায় আমি বলিতেছি।" এইবলিয়া তিনি একটী ভেড়া মারিয়া তাহার অধিকাংশ রক্ত তাঁহার পুত্রের কাপড় চাদরের উপর ছিটাইয়া দিলেন। মৃত ভেড়াটী একটী বড় থলেয় পুরিয়া পুত্রের স্কন্ধে চাপাইয়া দিলেন; এবং এইরূপ অবস্থায় বন্ধুদের বাটীতে গিয়া কি কি করিতে হইবে তাহাও বলিয়া দিলেন। পুত্র এইরূপ অবস্থায় রাত্রি দুই প্রহরের সময়ে তাহার সর্ব্বপ্রধান বন্ধুর বাটীতে গিয়া উপস্থিত। বাটীর দরজায় গিয়া বন্ধুর নাম ধরিয়া ডাকামাত্র বন্ধু শশব্যস্তে আসিয়া হাজির। বন্ধুকে দেখিয়া বলিলেন "আমাদের পরিবারের সহিত অমুকের সহিত যে শত্রুতা আছে তাহা তুমি জান, এই মাত্র আমি তাহার সহিত কোন বিষয় লইয়া ঝগড়া করি; ঝগড়ার পর হাতাহাতী হয় এবং তাহার পর শেষে কি দাঁড়াইল অবস্থা দেখিয়াই বুঝিতেছ। পুলিসের লোক জানে যে উক্ত ব্যক্তির সহিত আমাদের শত্রুতা আছে, আমাদের আসিয়াই গ্রেপ্তার করিবে। আমি উক্ত ব্যক্তির শরীরটা থলেয় করিয়া আনিয়াছি। এই মৃত শরীরটা তোমার বাটীতে পুঁতিয়া রাখ।"

বন্ধু সমুদয় দেখিয়া শুনিয়া অবাক্ হইলেন। অনেক ভাবিয়া—চিন্তা করিয়া বলিলেন, "আমার বাড়ী বড়ই সঙ্কীর্ণ; আমরাই স্বচ্ছন্দে থাকিবার স্থান পাই না, তাহার পর কেমন করিয়া মৃত শরীরটার স্থান দিই? বিশেষতঃ তোমাতে এবং আমাতে যে বন্ধুত্ব আছে তাহা সকলেই জানে; পুলিসে তোমার বাড়ী মৃত দেহ না পাইলেই আমার বাড়ী অনুসন্ধান করিতে আসিবে। তাহা হইলেইত চক্ষুস্থির! তোমার প্রাণ দণ্ডের সহিত আমারও শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। এমত অবস্থায় আমি তোমার এই মাত্র উপকার করিতে পারি যে তুমি যে এ কু-কাজ করিয়াছ ইহা আমি আর কাহাকেও বলিব না।"

ধনীর সন্তান অনেক অনুনয় বিনয় পূর্ব্বক সাহায্য প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু কোনই ফল হইল না দেখিয়া অন্য একজন বন্ধুর বাটীতে যাইয়া হাজির হইলেন। সেখানেও এইরূপ উত্তর। এইরূপে পঞ্চাশ বাড়ীতে ঘুরিলেন কেহই সাহায্য করিলেন না; কোন স্থানেই সাহায্য না পাইয়া বাটী আসিয়া পিতার নিকট সমুদয় খুলিয়া বলিল "যাঁহাদিগকে ভাবিয়াছিলাম যে সুখে দুঃখে সমভাবে কাজ করিবেন আজ দেখিলাম তাঁহাদের মধ্যে কেহই আমাকে এই কল্পিত বিপদের সময়ে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইলেন না।" পিতা তৎপরে বলিলেন "যাহাদিগকে দুঃখে সাহায্য করিতে দেখিবে না তাহাদিগকে বন্ধু বলিও না। যেমন সোণা ভাল কি মন্দ আগুনের দ্বারা পরীক্ষা করা যায় সেইরূপ বন্ধু ভাল কি মন্দ বিপদে না পড়িলে বুঝা যায় না। যে সুখের সময়ে ও দুঃসময়ে বন্ধুর কাজ করিবে সেই বন্ধু; অতএব এখনি যাহাদিগকে বন্ধু বলিয়া জানিয়াছ তাহাদিগকে ত্যাগ কর, প্রকৃত বন্ধু অনুসন্ধানে প্রবৃত্তি হও। পরীক্ষা না করিয়া কাহাকেও বন্ধু বলিয়া ভাবিও না।" *

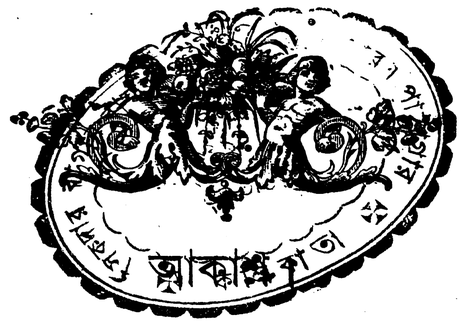

বড় ভালবাসি আমি দেখিতে তোমায়,
হে আকাশ! তব রূপে নয়ন জুড়ায়!
যখন যে দিকে আমি করি বিলোকন,
নূতন নূতন রূপে ভুলাও নয়ন!
প্রভাত সময়ে যবে তরুণ-তপন,
মনোহর বেশে আসি দেন দরশন,
নব-রবি রাঙ্গা-ছবি হৃদয়ে লইয়া
মুখ ভরা হাসি টুকু অধরে টিপিয়া;
কি সুন্দর ভাব খানি দেখাও তোমার,
অবাক হইয়া আমি দেখি বার বার!

আবার যখন আহা সেই সে তপন,
ঘুমে ঢুলু ঢুলু আঁখি শিশুর মতন,
খেলা ধূলা করি সারা দিবসের শেষে,
ধীরে ধীরে আসি আহা আলু থালু বেশে
ঢুলিয়া পড়েন তব কোলের ভিতরে,
আদরেতে লও তুমি হৃদয়েতে ধ'রে!
তখন তোমার সেই অপরূপ বেশ,
দেখিয়া নয়নে মোর না পড়ে নিমেষ!

ঘোরতর অন্ধকারে ঘিরি সমুদয়,
যখন রজনী আসি হয় হে উদয়,
সুনীল সুন্দর বক্ষ করিয়া বিস্তার,
থরে থরে পর কিবা তারকার হার!
ঝক-মক করে তারা হীরকের প্রায়,
দেখিয়া সেরূপ আহা নয়ন জুড়ায়!
অবাক্ হইয়া আমি প্রফুল্ল-অন্তরে,
এক দৃষ্টে সেই রূপ দেখি প্রাণ-ভ'রে!

আবার যখন তব হৃদয়ে বসিয়া,
হাসে পূর্ণ-শশী খানি সুধা-বরষিয়া,
শোভার সাগর যেন উথলিয়া উঠে,
সুন্দর সুনীল কান্তি আরো যেন ফোটে!
তখন তোমার সেই মুখ-ভরা হাসি,
আমিত দেখিতে ভাই বড় ভালবাসি!
ভুলে যাই আপনারে—ভুলি এ ভুবন,
কেবল তোমার রূপ করি দরশন!

ক্ষণ-কাল মেঘ-জাল আসিয়া যখন,
তোমার হৃদয়ে বসি করেন গর্জ্জন,
ঝলকে ঝলকে ছোটে বিদ্যুৎ-কিরণ,
ঝম্ ঝম্ রবে বৃষ্টি হয় বরিষণ;
তখন তোমার সেই গম্ভীর মূরতি,
নিরখিয়া হয় মন পুলকিত অতি!
সে শোভার কাছে যেন কিছু নহে আর;—
নয়ন ভরিয়া আমি দেখি বার বার!

কে তোমারে এত রূপ করিয়া প্রদান,
শোভার-ভাণ্ডার করি করিল নির্ম্মাণ?
অনন্ত তাঁহার কীর্ত্তি, আশ্চর্য্য কৌশল!
তুমিই আকাশ তার পরিচয় স্থল!
অনন্ত শরীরে তব, সুস্পষ্ট-ভাষায়,
তাঁহার মহিমা কথা লেখা গায় গায়!

* ইতালী দেশস্থ কোন একটী গল্প অবলম্বনে লিখিত।

পুরুষ প্রধান তিনি সকলের সার ;
বার বার নমস্কার চরণে তাঁহার !

আহা ! কি দুঃখ !

আহা ! ভালুক! তোমার কি দুঃখ! তোমার দুঃখ দেখে যে আমার বড়ই কষ্ট হ'চ্ছে। মনের দুঃখে চুপটী করিয়া বসে আছ; তোমার সে চতুরতা, সে বীরত্ব কোথায় ? যে বীরত্বে এক সময়ে তুমি মানুষকে প্রাণ-ভয়ে ব্যাকুল করিতে, গাছে উঠিলেও তাহার নিস্তার থাকিত না, তুমি পিছনে পিছনে গিয়ে তাহাকে ছিঁড়িয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিতে, সেই বীরত্ব এখন কোথা গেল ? যে আওয়াজে একদিন তুমি গগন ফাটাইতে, বন কাঁপাইতে, সেই ভয়ানক গোঙান চীৎকার এখন কোথায় গেল? যে নখে এক সময়ে গাছ ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া শত খণ্ড করিয়া ফেলিতে সেই নখ তোমার এখন কে এমন ভোঁতা করিয়া দিল ? আহা ! চক্ষু দুটী বুজিয়া কি ভাবিতেছ ? সেই প্রাচীন কালের সুখের কথা, স্বাধীন অবস্থায় মনের সুখে বনে বেড়াইতে, তখনকার সুখের কথা কি মনে পড়িতেছে ? তাই দুটী চক্ষু বন্ধ করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া ভাবিতেছ ? আহা ! চিন্তায় এমনি মগ্ন হইয়াছ যে একটা হতভাগা বানর তোমার পিঠে চড়িয়া ঘাড়ের চুল ধরিয়া টানিতেছে, তাও টের পাইতেছ না ? উপুড় হইয়া বসিয়া আছ, যেন গায়ে জোর নাই, মনে তেজ নাই, বুকে সাহস নাই, প্রাণে কিছু উৎসাহ নাই, যেন 'জন্তটী' হইয়া বসিয়াছ। নিষ্ঠুর লোক, তোমার দুঃখে কষ্ট পায় না, আবার তোমাকে মারিয়া পয়সা উপার্জ্জন করে। ছিঃ! তোমার অসহায় অবস্থা দেখেও মানুষেরা আহ্লাদ পায়, পয়সা দেয়, দুঃখ হয় না।

নির্দ্দোষী ভাল মানুষ তুমি। মানুষের পাড়া হইতে যে কত দূরে থাক তার ঠিক নাই ; পাছে তোমার দ্বারা কোন অনিষ্ট হয় এই ভয়ে মানুষের বাড়ীর ত্রিসীমায় যাও না। নিজের দেশে বনের মধ্যে এটা ওটা খেয়ে নির্জ্জনে প্রাণ ধারণ কর। হিংস্র-স্বভাব দুষ্ট মানুষ তাও সহিতে পারে না। কত ফিকির করিয়া তোমায় ধরিয়া আনে, জ্বালাতন করে, পিঁজরায় বদ্ধ করিয়া রাখে, কত যন্ত্রণা দেয় ! শেষে তুমি নিরুপায় হইয়া আশা ভরসা ত্যাগ করিয়া মানুষের দাসত্ব স্বীকার কর। আহা ! কি করিবে বল ? পেটে ত খেতে হবে। দুরন্ত মানুষ কথা না শুনিলে খেতে দেবে না, তাই মরে মরেও তার কথা শুনে নেচে নেচে বেড়াও। দেখ ভালুক ! তোমার অবস্থা দেখে কার না দুঃখ হয় ? যার হয় না সে ভাল লোক কখনই নয়। তোমার এই প্রকার দুরবস্থা দেখিলে যার কষ্ট হয় না সে কখনই ভদ্রলোক নয়। বাঘ, কি গোখরো বা কেউটে সাপ, কি ডাকাত এদের সাজা হলে তত দুঃখ হয়না ; কেননা এরা অপরাধী, মানুষের হানি করে। তুমি কিন্তু সহজে কারও হানি কর না ; মানুষ আজ কাল তোমায় জ্বালাতন করে, তোমার

আত্মীয় স্বজনদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে আসে। তাই বাগে পেলে তুমি তাহাকে মারিতে ছাড়না, তবুও বাঘের মত তুমি মানুষের বাড়ী চড়াও করিতে জান না। মানুষ তোমার দেশে গিয়ে তোমার অনিষ্ট করিবে, আর তুমি কিছু বলিবে না ? একি কখন হয় ? এত ভাল মানুষ কেও আর নাই। কিন্তু তবু দুরন্ত লোক এত তোমার মত শান্ত পশুকে মিছামিছি ক্লেশ

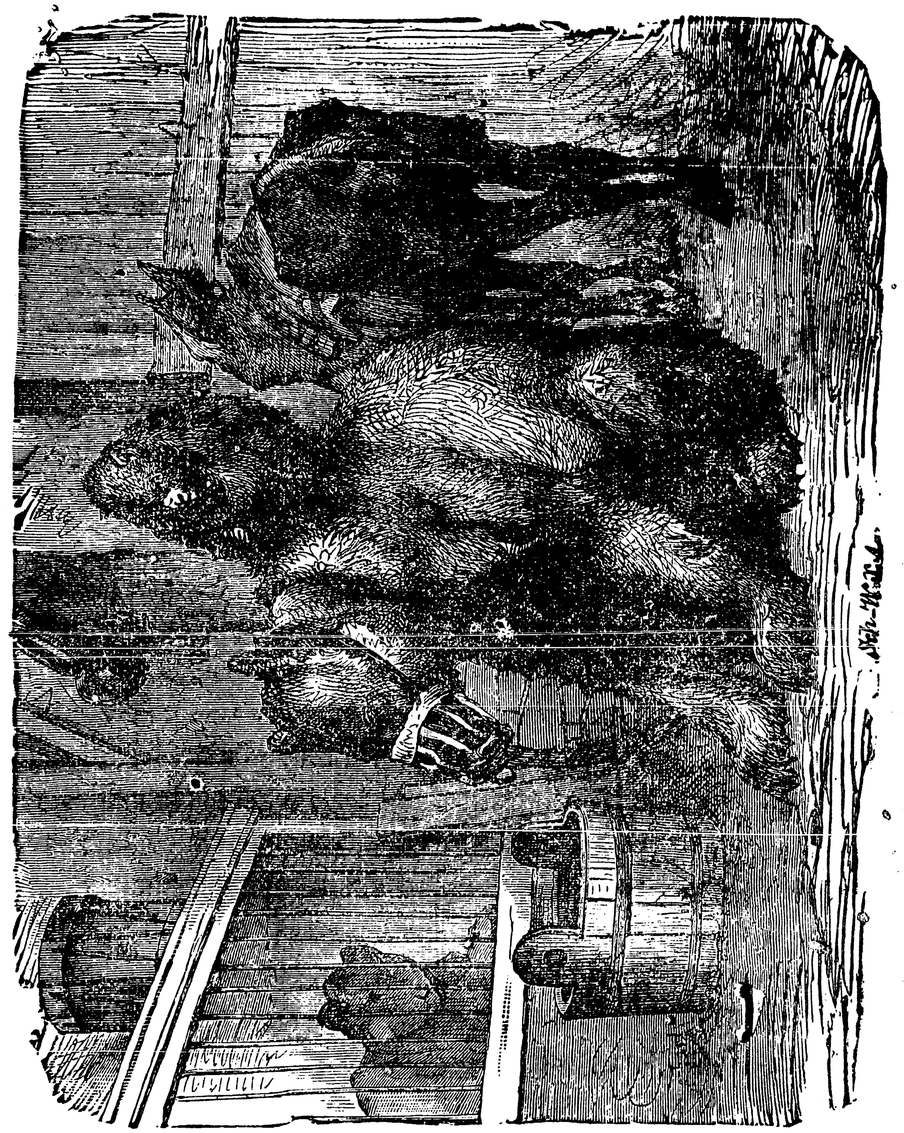

দেয়। পেটের জন্য, সামান্য দুটা পয়সার লোভে বন থেকে তোমায় ধরে এনে আহা! কি যন্ত্রণাই না দেয়?

তুমি যখন নাচ, ভালুক! সকলে হাসে; বলে ভালুকটা কেমন নাচিতে শিখিয়াছে। আমি কিন্তু হাসি না। তোমার মনে হয় না যে তুমি নাচিতেছ; মনে হয় যে যন্ত্রণায় দুঃখে তুমি ছট্‌ ফট্‌ করিতেছ। যখন তোমার নাকের দড়ি ধরিয়া তোমায় নানা রকম নাচায়, সেই হেঁচকা টানে তোমার নাকে যে কি লাগে তা লোকেরা বুঝিতে পারে না। আমি তা বুঝি, তাই তোমার দুঃখের "আঁ আঁ" শব্দে আমার বড় কষ্ট হয়। তোমার মুখ দিয়া জল গড়াইতে থাকে; চক্ষু, নাক সব স্থান দিয়ে দুঃখের জল বাহির হয়, সেটা কেউ দেখে না। লোকে বলে ভালুক নাচে। আহা! যার এত যাতনা, তার কি নাচ আসে? আমাকে যদি কেহ আমার বাড়ী থেকে ধরে নিয়ে ঐ রকম যাতনা করে, বলে "নাচো নাচো নাচো" তাহলে কি আমি নাচি? খুব মারে যখন তখন কাঁদি আর উঠিয়া ঐ রকম করে লাফাই; কিন্তু মনে মনে এ যন্ত্রণা হইতে উদ্ধার পাইবার উপায় চিন্তা করি। ভালুক! আমার মনে হয় তুমি ঠিক ঐ রকম কর। কাঁদাতে কাঁদিতে "আঁ আঁ আঁ" করে যেই দেখ মারে লাফাও আর মনে মনে তোমার চালককে গালাগালি দাও। কোন ক্ষমতা নাই নহিলে বুঝি তাহাকে টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিতে, সন্দেহ নাই।

কিন্তু ভালুক! তোমার নাচে কিন্তু অনেকের উপকার হয়। সেই যে সেদিন তুমি সেই বাবুদের বাড়ীর উঠানে লাঠি কাঁধে করিয়া থপ্‌ থপ্‌ করিয়া নাচিতেছিলে,—ঘাড়টী বাঁকাইয়া, ঘুমুরের তালে তালে এবং ও ভুঁড়িটী নাড়িয়া নাড়িয়া সেই যে নাচিতেছিলে, আর মাঝে মাঝে "আঁ আঁ" করিয়া নাকীস্বরে শব্দ করিতেছিলে—সে দিন বড়ই উপকার হইয়াছিল। সেই বাবুটীর আকার ও তোমারই মতন, প্রকাণ্ড ভুঁড়ি, আর আপাদ মস্তক তোমারই মতন লোম গায়। মদ খেয়ে বাবু মশাই প্রায়ই তোমার মতন নৃত্য গীত করেন, আর পাশে থেকে তাঁহার সঙ্গীরা তাল দেয়। সেদিন কিন্তু তোমার নাচটা দেখে অবধি তাঁর ঘৃণা হয়ে গেছে। একজন সঙ্গী বলিয়াছিল "ভালুকটা আমাদের বাবুর মতন ঠিক নাচে।" সেই মনের ঘৃণায় তখনি তিনি তাদের দূর করে দিলেন, নাকে কানে খত লিখে দিলেন যে আর কখন মদ খাবেন না। এখন তিনি বেশ ভাল হয়েছেন। তাই বলেছিলাম তোমার দ্বারা অনেকের উপকার হয়। আমাদের হতভাগা দেশে তোমার মতন অনেক বাবুতেই নৃত্য করেন, তাঁদের যদি একজনকে ভাল করিতে পার তাহলে তোমার দুঃখভোগ অনেক সফল হয়।

ঘণ্টার মধ্যে দু চারিবার তোমার জর হয়; কেন ভালুক? এদেশের জলবায়ু কি তোমার সহ্য হয় না? তোমাকেও কি ম্যালেরিয়া ধরেছে? তা যাই হউক, কিন্তু আমার মনে হয় যে ওটা কেবল তোমার যন্ত্রণায় হয়। পেটের দায়ে নাচ, খেলা কর, চালকের কথা শুন, কিন্তু যেই মনে পড়ে যেঁকি ছিলে আর কি হয়েছ, অমনি যাতনার জ্বালায় অস্থির হও আর ধূলায় লুটাইয়া রোদন কর; তাই ক্ষোভে, রাগে, দুঃখে তোমার সর্ব্ব শরীর কাঁপিতে থাকে। তোমার এত দিনের পরাধীনতাতেও পুরাণ স্বাধীনতার সুখ ভুলাইতে পারে নাই, যখনই মনে হয় তখনই তোমাকে একেবারে পাগল করিয়া ফেলে। আর কত লোক যে চিরদিন পরের অধীন হইয়া অতি নীচ দাসত্ব

করিতেছে অথচ এক দিনের জন্যও তাদের মনে একটু ধিক্কার হয় না, ঘৃণাবোধ হয় না, লজ্জা হয় না, ক্ষোভ রাগ তোমার মত কিছুই হয় না। ভালুক, তুমি এই বিষয়ে কত মানুষের চেয়েও শ্রেষ্ঠ।

তোমার পিঠের উপরের ও বানরটা কি নির্ব্বোধ! ওটাও তোমার মত স্বাধীনতা হারাইয়া দাস হইয়া রহিয়াছে, অথচ সে দিকে লক্ষ্য নাই, দিব্য খেলা আমোদ করিয়া বেড়াইতেছে, তোমার এ যন্ত্রণা দেখিয়াও শিখিতেছে না, গাধাটার মত নীচ ও অধম হইয়া প্রভুর মানিয়া রহিয়াছে। আবার উল্টে তোমার পিঠের উপর চড়িয়া ঘাড়ের চুল গুলো ছিঁড়িতেছে। আহা! বানর ত বানর! কোন বোধ নাই। দাস হইয়া আবার আমোদ! ছি! আর ওরই বা দোষ কি দিব? মানুষদের মধ্যেই কত লোক অমনতর আছে! চাকর, গোলাম হইয়া আছে অথচ প্রভুর খোসামোদ করিবার জন্য কত খেলাই খেলে। আবার অন্য পরাধীন লোকদের মনে কত কষ্ট দিয়া বাহাদুরী করে। দূর হোক, আর দুঃখ করিতে পারি না। ভালুক! আমি আর তোমার কষ্ট দেখিতে পারি না। ঢোল বাজাইয়া ও বাঁশীর শব্দ করিয়া তোমায় যখন নাচাইতে আসিবে আমি তখন সেখানে থাকিব না। তোমার কষ্ট যদি দূর করিতে পারিতাম তাহলেও একটা উপকার করিতে পারিতাম; তাযখন পারিব না, তখন কেবল দুঃখ দেখে আর "আহা! কি দুঃখ!!" বলে লাভ কি? পরমেশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা যে, কেহ যেন কখন কাহারও কাছে ওরূপ নীচ দাসত্ব না করে।

বালিকাদিগের বিশেষ পৃষ্ঠা।

একটী সহজ কথা।

এক সময়ে আমাদের দেশে মেয়েরা লেখা পড়া শিখিত না। তখন তাহারা কেবল বাড়ীর কাজ করিত, ও সকলেরই সেবাতে জীবন কাটাইত। লেখা পড়া শেখায় যে কি সুখ, কি অপূর্ব্ব আনন্দ, কি পবিত্রতা, তাহা কিছুই জানিত না। অজ্ঞান অন্ধকারের মধ্যে থাকিয়া সময় কাটাইত। তখনকার একটী মেয়ে আর এখনকার একটী মেয়ে পাশাপাশি দাঁড় করাইলে সহজেই চিনা যায়। একজন শান্ত, নম্র, ধীর বটে, কিন্তু মুখে যেন বোকামী নির্ব্বুদ্ধিতা মাখান, হাবা গোবা ভাল মানুষটী, কিছু জানে না, যেন ননীর পুতুলটী; তাকে চারুপাঠের ভাল ভাল কথা বল, হাঁ করিয়া শুনিবে আর অবাক্ হইয়া থাকিবে। আর একজন চালাক, চতুর, স্বাধীন-প্রকৃতি, বুদ্ধি ও প্রফুল্লতা যেন এক সঙ্গে বাস করিতেছে; চক্ষু বাহিরের জিনিস দেখিতেছে, কিন্তু মন যেন অন্য কোথায় কোন গভীর বিষয়ের চিন্তা করিতেছে। কত প্রভেদ! এজন্য পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দেওয়া অবশ্য উচিত; আর যাঁহাদের যত্নে ও চেষ্টায় আমাদের দেশে বালিকাদিগের শিক্ষাপদ্ধতি প্রচলিত হইয়াছে, তাঁহাদিগকেও নমস্কার করিতে ইচ্ছা হয়।

কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে আর একটী কথাও মনে পড়ে—আর অমনি ভয় হয়! মনে হয় যে লেখা পড়া যাহারা শিখিতেছে তাহাদের

মধ্যে অনেক মেয়েরা প্রায়ই একটু স্বার্থপরতা ও ঔদাস্যভাব পাইতেছে। অবশ্য সকলে নয়, কেহ কেহ, হয়ত অনেকেই হইতেছে। আমরা এমন অনেক মেয়ে দেখিয়াছি যাহারা পড়ার জন্য বাড়ীর কাজ কর্ম্মে ঔদাস্য বা তাচ্ছীল্য দেখায়; তাহারা কিছু স্বার্থপর হইয়া পড়িতেছে। নিজেদের ভাল খাওয়া, ভাল পোষাক, ভাল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা এ সকলের দিকে তাদের বেশী নজর; কিন্তু বাড়ীর সকলকে কিসে সুখী করিব, নিজের অসুবিধা হলেও অন্য সকলকে কিসে ভাল খাওয়াব, ভাল রাখিব, সে দিকে তাহাদের তত আর দৃষ্টি দেখা যায় না। এটী কিন্তু বড়ই আক্ষেপের কথা। করুণা পড়িতেছেন আর তাঁর ছোট বোন্‌টী ক্ষুধায় আকুল হইয়া কাঁদিতেছে; মা রান্নাঘরে ব্যস্ত, কাজেই উঠিতে পারিতেছেন না। সে সময়েও যে করুণা উঠিয়া ভগিনীটীকে খাওয়াইয়া তার পর গিয়া পড়িবেন, এ আর তাঁর ঘটিতেছে না। নিষ্ঠুরভাবে ভগিনীর কান্না দেখিতেছেন আর মাথা-মুণ্ডু পড়িতেছেন। কাজেই বাপ বাড়ী আসিয়া সমুদয় শুনিয়া রাগ করিলেন। আরও শুনিলেন যে, তাঁর বড় স্বার্থপরতা বাড়িয়াছে—নম্রতা নাই, বিনয় নাই, শান্তভাব নাই, পরিবের মত চাল চলন নাই, বড় মানুষের মেয়েদের সঙ্গে বেড়াইয়া তাঁদের মত পোষাকাদির দিকে নজর পড়িতেছে—এ সব কথা শুনিয়া তাঁর বাপ কাজেই সব বৈ কাড়িয়া লইয়া তাঁহার স্কুলে যাওয়া বন্ধ করিয়া দিলেন।

একি কম দুঃখের কথা? কিন্তু এ রকম ঘটনা আমরা প্রায়ই দেখিতে পাই। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া আমাদের অভিভাবকেরা (একেইত তাঁরা স্ত্রীশিক্ষার শত্রু) মেয়েদের লেখা পড়া শিক্ষার বিপক্ষে অনেক নিন্দা করেন। আজ তাই আমরা প্রিয় পাঠিকাগণকে সাবধান করিয়া দিতেছি যেন কোন ক্রমেই তাঁহাদের কেহই উক্তরূপ দোষে না পড়েন। যে বিদ্যার লক্ষ্য উন্নতি, বিনয়, নম্রতা, কোমলতা, পরোপকার প্রভৃতি ধর্ম্ম-কর্ম্মে মতি, স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া, নিজের সুখ একেবারে ছাড়িয়া দিয়া পরকে সুখী করিবার জন্য মনকে প্রস্তুত করা; সেই বিদ্যাশিক্ষা করিয়া যদি তাহার বিপরীত ফলই লাভ করিতে হয়, তবে যে সে বিদ্যাশিক্ষা করা অপেক্ষা না করাও ভাল! এটী অতি সহজ কথা। কিন্তু মানুষ সহজ কথা আবার যত সহজে ভুলিয়া যায়, এমন আর অন্য কথা নয়। এজন্য আমরা আজ ভাল করিয়া এ কথাটী সকলকে মনে করিয়া দিতেছি, যেন সকলে প্রত্যেকের জীবনের ও চরিত্রের প্রতি দৃষ্টি রাখেন;—স্ত্রীজাতির স্বাভাবিক নম্রতা, বিনয়, হৃদয়ের কোমলতা ও পরের ভাল করিবার ইচ্ছা প্রভৃতি সদ্‌গুণ সকল নষ্ট হওয়া দূরে থাকুক বরং লেখা পড়ার গুণে আরও বাড়িতেছে কি না? লোকের দেখিয়া শুনিয়া চক্ষু কর্ণ জুড়াইতেছে কি না? লোকে বলিতেছে কিনা "আহা! মেয়েটী যেন স্বর্গের! লেখা পড়ার উপর আমি বড় চটা ছিলাম, এই মেয়েটীকে দেখে কিন্তু আমার ভ্রম ঘুচিয়াছে"—ইহা প্রত্যেকেরই দেখা উচিত। ভরসা করি, কথাটী মনে রাখিয়া আমাদের প্রিয় পাঠিকাগণ চলিতে পারিবেন। আমরা ক্রমে এ বিষয়ে তাঁহাদিগকে আরও ভাল ভাল পরামর্শ দিব মনে করিয়াছি।

সত্যের বল।

(বালকের রচনা।)

প্রায়ই এরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, অনেকে জানিয়া শুনিয়া মিথ্যা কথা বলেন। এবং ছোট ছোট পাঠক পাঠিকা দিগের মধ্যেও বোধ হয় অনেকে এরূপ করেন। কেন করেন যদি জিজ্ঞাসা করা যায় তাহা হইলে হয়ত এই উত্তর পাওয়া যাইতে পারে যে, মারখাবার ভয়ে বা কাহারও কাছথেকে বকুনী খাবার ভয়ে মিথ্যা-কথা বলেন। সত্য কথার ক্ষমতা কত, এতে মানুষকে কেমন দেবতার মত করে এবং একটা সত্য কথা বলিলে পরে কত আনন্দ পাওয়া যায়, এবং দোষ করিয়া যদি তাহা প্রকাশ করা যায় তাহা হইলে কেমন সেই দোষটা একেবারে চলিয়া যায়, আর মানুষ কেমন ভাল হইয়া যায় এই বিষয়ে একটী গল্প বলিতেছি।

প্রায় সাড়ে তিন শত বৎসর হইল দিল্লী নগরে একজন মুসলমান চোর বাস করিত; সে এমন পাকা চোর ছিল যে তোমরা শুনিলে আশ্চর্য্য জ্ঞান করিবে এবং হয়ত সহজে বিশ্বাসও করিবে না। সে বড় বড় আমীর, ওমারও, মহা মহা বাদ্‌সাহের বাটীতেঢুকে টাকা কড়ি, ভাল ভাল জিনিস পত্র সব চুরি করিত। মহা মহা বাদ্‌সার বলিবার মানে এই যে তখন মুসলমানেরা ভারতবর্ষের রাজা ছিলেন সেই জন্য তাহারাই খুব টাকাওয়ালা লোক ছিলেন। যাহা হউক তাকে কেহই ধরিতে পারেনা। সকলে ভারি ব্যতিব্যস্ত হইলেন। কার বাড়ীতে কখন কি করে তার ঠিক নাই; সকলেই শশব্যস্ত।

একবার সে মন্ত্রীর বাড়ীতে চুরি করিতে গিয়াছে। ঘরে ঢুকিবামাত্র লোক জনের সাড়া শব্দ পেয়ে যেমন তাড়া তাড়ি পাঁচীল ডিঙ্গিয়ে পালাবে অমনি পড়েগিয়ে তার মাথায় ভয়ানক আঘাত পাইল।

সেই জন্য সে ভয়ানক পীড়িত হইল; সে তখন যে কত কাতোরোক্তি করিত তাহা আর বলা যায় না। অনেক সময়ে দুঃখের সহিত বলিত যে, "যদি আমি এরূপ না করিতাম তাহা হইলে আর আমার এমন দুর্দ্দশা হইত না।" মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল "যদি এ যাত্রা রক্ষা পাই তাহা হইলে আর কখন এরূপ কাজ করিব না।" যাহা হ'ক সে সে যাত্রায় কোন মতে রক্ষা পাইল। এবং আগেকার মত বলবান হইয়া উঠিল এবং প্রতিজ্ঞা ভুলিয়া গিয়া পূর্ব্বের ন্যায় চুরি করিতে লাগিল।

একদিন সে একটা লোককে খুন করে। খুন করিবার সময় তাহার কাতরোক্তি ও চিৎকার শুনিয়া তাহার মনে কেমন যেন ভয়ানক কষ্ট বোধ হইতে লাগিল; এবং কিছুতেই সেই যন্ত্রণা আর সহ্য করিতে না পারিয়া এক দরবেশের (ধার্ম্মিক লোক) নিকট যাইয়া সব কথা খুলিয়া বলিল এবং তার পা জড়াইয়া ধরিয়া ছেলেমানুষের মত কাঁদিতে লাগিল। ইহাতে সেই দরবেশের অত্যন্ত দয়া হইল। তিনি তাহাকে সর্ব্বদা সত্য কথা কহিতে ও ত্রিসন্ধ্যা নামাজ পড়িতে বলিলেন এবং তাহাতেই সে ভাল হইতে পারিবে এইরূপও বলিলেন।

সে ঐ কথা শুনিয়া তদনুসারে কাজ করিতে আরম্ভ করিল। খুব সকালে, দুপরবেলা,

ও সন্ধ্যার সময় নামাজ পড়িতে আরম্ভ করিল। এক দিনও তার নামাজ কামাই যাইত না; এবং সর্ব্বদা সত্য কথা বলিত।

এক দিন সে এক জনের বাটীতে চুরি করিতে গিয়াছে এর মধ্যে রাত্রি ভোর হইয়া গেল। তখন কি করে, তার নামাজ না পড়িলেই নয়? 'যা হবার তা হবে'এইরূপ ভাবিয়া সে নামাজ পড়িতে লাগিল; তার চীৎকারে গৃহকর্ত্তা আসিয়া দেখেন যে একজন অপরিচিত লোক ঘরের ভিতর চীৎকার করিতেছে; তখনি ত তাকে চোঁর বলিয়া রাজার কাছে ধরে নিয়ে যাওয়া হইল; রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন "কেন তুমি উহাদের বাটীর ভিতরে ঢুকিয়াছিলে?"সে দরবেশের কথা মনে করিয়া নির্ব্বিঘ্নে বলিল 'চুরি কর্ত্তে'। রাজা একথা বিশ্বাস করিলেন না; ভাবিলেন যে, চুরি ক'রে কি কেউ কখন স্বীকার করে? আর বিশেষ চোরের যখন প্রাণ দণ্ড হয় তাহা জানিয়া শুনিয়া এ লোকটা যখন স্বীকার করিতেছে তখন অবশ্য আর কিছু বিশেষ কারণ আছে। তখন রাজা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি ঠিক করিয়া বল নইলে তোমাকে শূলে দেওয়া হইবে।" চোর তথাপি স্থির হইয়া বলিল "চুরি কর্ত্তে গিয়াছিলাম ইহার মধ্যে সকাল হওয়াতে ধরা পড়িয়াছি।" রাজা তথাপি বিশ্বাস করিলেন না—ভাবিলেন বুঝি কোন দরবেশ তাহাকে ছলনা করিতেছেন। এই মনে করিয়া রাজা সেই চোরের পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন"প্রভু আপনি কে? কৃপা করিয়া এই অভাগাকে বলুন।" তখন সেই কঠিন হৃদয় চোর নিজের পা ছাড়াইয়া বালকের ন্যায় ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে আত্ম-বৃত্তান্ত বিবৃত করিল ও পাগলের ন্যায় বলিয়া উঠিল "উঃ আমি কি মহাপাপী; সত্যের মর্ম্ম বুঝিতাম না; ঈশ্বরকে মনে করিতাম না; সত্য যে কি ধন তাহা চিনিতাম না, সত্য গ্রহণ করিতাম না। আমি একটী সত্য কথা বলিয়া সম্রাট দ্বারা পূজিত হইলাম ও দরবেশ আখ্যা প্রাপ্ত হইলাম" এই বলিয়া রাজাকে বলিল "মহারাজ আমাকে শূলে দেন,আমার আর বাঁচিয়া পৃথিবীর পাপ বৃদ্ধি করা কোন মতেই উচিত নহে; আমাকে শূলে দেন।"

রাজা তাহাকে ক্ষমা করিলেন। তৎপরে সে এক জন বাস্তবিক দরবেশ হইয়া রাজবাটীতে বাস করিতে লাগিল আর তাহার দৃষ্টান্ত দ্বারা যত চোর সাধু হইল; এবং মিথ্যাবাদী ধার্ম্মিক হইয়া গেল।

আগামী বৎসরের পুরস্কারের বিজ্ঞাপন।

আগামী বৎসরে 'সখা'র গ্রাহক গ্রাহিকাদিগকে ১০০৲ মূল্যের পুরস্কার প্রদত্ত হইবে। সর্ব্বোচ্চ পুরস্কারের মূল্য ১০৲ দশ টাকা; এবং সর্ব্ব নিম্ন পুরস্কারের মূল্য ২৲দুই টাকা মাত্র।

যাঁহারা রচনা ও চিত্র বিষয়ে পরীক্ষা দিয়া কৃতকার্য্য হইবেন তাঁহারাই পুরস্কার প্রাপ্ত হইবেন। পরীক্ষার বিষয় ও সময় 'সখা'য় যথা সময়ে প্রকাশিত হইবে।

'সখা'র গ্রাহক ভিন্ন অন্য কেহ পরীক্ষা দিতে পারিবেন না। যাঁহারা পুরাতন গ্রাহক আছেন, তাঁহারা অগ্রিম মূল্য না পাঠাইয়া দিলে পরীক্ষা দিতে পারিবেন না।

শ্রীঅন্নদাচরণ সেন
কার্য্যাধ্যক্ষ।

২নং বেনেটোলা লেন, সখা যন্ত্রে, শ্রীললিতমোহন দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।